হাকিকাত কিতাবেভি প্রকাশনা ১

ইমান এবং ইসলাম

ইতিকাদ নামা কিতাবের অনুবাদ

লেখক

মাওলানা দিয়া উদ্দিন খালিদ আল বাঘদাদী

আল্লাহ তালার রহমত প্রাপ্ত বিখ্যাত আলেম, যিনি সকল ক্ষেত্রে কামেল ,ধর্মীয় ব্যাপারে যার অসাধারন জ্ঞান ,যার ন্যায় বিচার ক্ষমতা রয়েছে এবং যিনি সত্য পরায়ন।

হাকিকাত কিতাবেভি

হুসেইন ইলিম ইশিকি

টীকা

ইতিকাদ নামা কিতাবের লেখক মাওলানা দিয়া আদ্দিন খালিদ আল বাগদাদ আল উসমান, (১১৯২ হিজরি, ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের দক্ষিনে শাহরাজুর শহরে জন্ম এবং ১২৪২ হিজরি ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন দামেস্কের কুদ্দিস সিররুহ তে), কে আল উসমান বলা হয় কারন তিনি তৃতীয় খালিফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর। যখন তিনি তার ছোট ভাই হযরত মাওলানা মাহমুদ সাহিবকে বিখ্যাত আলেম আন নাওয়াই এর **আল আহাদিথ আল আরবাঈণ** কিতাবটির দ্বিতীয় হাদিস বিখ্যাত **হাদিস আলজিব্রিল** শিক্ষা দিচ্ছিলেন,হযরত সাহিব তার বড় ভাইকে এটির ব্যাখ্যা লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। মাওলানা খালিদ তার ভাইয়ের পুলকিত হৃদয়ে শান্তি প্রদানের জন্য অনুরোধ গ্রহণ করেন এবং হাদিসটির ব্যাখ্যায় **ইতকাদ নামা** নামে ফার্সি কিতাব লিখেন। এটির টার্কিশ সংস্করণ **হেরকেসে লাযিম অলান ইমান**, ফ্রেঞ্চ **ফইত এত ইসলাম** , জার্মান **গ্লাউবে উন্দ ইসলাম** ১৯৬৯ সালে, এবং পরবর্তীতে অন্যান্য ভাষা যেমন তামিল, ইয়রুবা, হাওসা, মালায়ালাম, দ্যনিশ ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। আল্লাহ তালা নিষ্পাপ তরুণদেরকে, এই কিতাব পড়া এবং সঠিক ভাবে ইতিকাদ বোঝার তৌফিক দান করুন যা আহলে সুন্নার আলেমরা নীত করেছেন।

প্রকাশকের কথা:

যদি কেউ ইচ্ছে পোষণ করেন কিতাবটির সঠিক ভাবে অন্য ভাষায় অনুবাদ করবেন কিংবা প্রকাশ করবেন আমাদের অনূমতির কোনই প্রয়োজন নেই। যারা এই মহৎ কাজে আমাদের সাহায্য করেছেন তাদের জন্য আল্লাহ তালার কাছে রহমত প্রার্থনা করছি, আমাদের শুভকামনা এবং ধন্যবাদ তাদের জন্য। যাই হউক অনুমূতি এই সাপেক্ষে দেয়া হচ্ছে যে, প্রকাশনা অবশ্যই উন্নতমানের হতে হবে, লেখার নকশা এবং ধারা বিন্যাস সঠিক এবং পরিপূর্ণভাবে হতে হবে কোন ভুল ছাড়াই।

মন্তব্য: মিশনারিরা খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচার করছে, ইহুদিরা তাদের ইহুদি রাব্বিস এর ধারনা ছড়ানোর জন্য কাজ করছে। ইস্তানবুলের হাকিকাত কিতাবেভি মানুষের কাছে ইসলাম পৌঁছানোর কাজ করছে। আর ভন্ডরা ইসলামের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। একজন বিজ্ঞ, জ্ঞানী এবং সচেতন মানুষ বুঝতে পারবেন কোনটি সঠিক পথ এবং তা মানবতার কাছে পৌঁছানোর জন্য সাহায্য করবেন। এটির চেয়ে ভালো এবং মূল্যবান কোন উপায় নেই মানবতার সাহায্য করার জন্য।

‘**সুবহানাল্লাহি ওয়া বি-হামিদিহ সুবহানাল্লাহিল-ল আজিম**’। এই ‘কালিমা-ই

তানিজিহ’ ফজর ও মাগিরেবর সময় একশবার করে পাঠ করেল গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়। **মাকতুবাত কিতাবের** তুরকিশ সংস্করনে ৩০৭ এবং ৩১৮ নম্বর পৃষ্ঠায় এই দোয়ার কথা বলা হয়েছে (এটি লিখেছেন বিখ্যাত ওলী এবং আলেম ইমাম রাব্বানি কুদ্দিসা সিররুহ)।

ইয়া রহমান, ইয়া রাহিম, ইয়া আফুয়া ইয়া কারিম।

হাকিকাত কিতাবেভির (ফাতিহ ইস্তানবুলের কিতাবের দোকান) মূল লক্ষ ,আমাদের বিশ্বাস এবং ইসলাম শিক্ষা দেয়া, এবং আমাদের দেশকে পুরো পৃথিবীর মানুষের কাছে ভালোভাবে উপস্থাপন করা। আল্লাহ তালা আমাদের সাহায্যকারীদের রহমত করুন। আমীন।

প্রিয় পাঠক আসসালামু আলাইকুম

আমরা এই কিতাবের সমস্ত লেখা সংগ্রহ করেছি ইসলামি আলেমদের কিতাব থেকে। আমরা আমাদের নিজে থেকে কোন কিছুর সংযোগ করিনি। আমারা এই কাজটি শুধুমাত্র মানবতার সেবার জন্য করেছি এবং যিনি মানুষের সুখের জন্য কাজ করেন এবং মানুষের অধিকার রক্ষা করেন তার কাছে স্বীকৃতির জন্য। আপনি যখন এসব বিখ্যাত লেখকের লেখা মনোযোগ সহকারে এবং গুরুত্বের সাথে পড়েন, আপনি অনেক বাস্তব এবং ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ করবেন, ইনশাল্লাহ। আমরা আমাদের ভালবাসা এবং সালাম জানাচ্ছি আপনাকে। আল্লাহ তালা আপনাকে সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু দান করুন। আমীন।

আল্লাহহুম্মা সাল্লিয়ালা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়ালা আলিহি মুহাম্মাদ ওয়া বারিক আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়ালা আলী মুহাম্মাদ। আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতও ওয়া কিনা আজাবান্নার বি রাহ মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। আমীন। .

হাকিকাত কিতাবেভি

প্রাককথন

বিসমিল্লাহ’এর দ্বারা আরম্ভ করলাম কিতাব,
ঐ আল্লাহ্’র নামে, যা সর্বোত্তম আশ্রয়স্থল।
যার নিয়ামতের হয় না কোন হিসাব,
এমন রব, যিনি করুণাময় ও ক্ষমাশীল।

মহান আল্লাহ্ তা’আলা দুনিয়ার সমস্ত মানুষকেই করুণা করেন। বান্দার যা যা চাহিদা তা সৃষ্টি করে তাদের প্রত্যেকের নিকট প্রেরণ করেন। দুনিয়াতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে, শান্তিতে বসবাসের জন্য এবং আখিরাতে চিরসৌভাগ্য অর্জনের জন্য বান্দার কি করা আবশ্যক তাও স্পষ্টভাবে অবহিত করেন। নাফসের, অসৎসঙ্গের, ভ্রান্ত কিতাব ও বিদেশী মিডিয়ার দ্বারা প্রতারিত বা প্ররোচিত হয়ে সৌভাগ্যের পথ থেকে আলাদা হয়ে যারা কুফর ও দালালাতের পথে পতিত হওয়ার পর, এরজন্য অনুশোচিত ও লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদেরকে তিনি হিদায়েত নসীব করেন, সঠিক পথের দিশা দেন। তাদেরকে চিরন্তন বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। তবে সীমা লঙ্ঘনকারী ও জালিমদেরকে তিনি এই নিয়ামত ইহসান করেন না। তারা নিজ ইচ্ছায় যে অবিশ্বাসের গর্তে পতিত হয়েছে আল্লাহ্ তা’আলা তাদেরকে সেখানেই পরিত্যাগ করেন। আখিরাতে যে সকল মুমিনের কৃত পাপের জন্য জাহান্নামে যাওয়া আবশ্যক হবে তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি অনুগ্রহ করে ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সমস্ত জীবের সৃষ্টিকারী, সকল অস্তিত্ববানকে সর্বক্ষন তাদের অস্তিত্বে অধিষ্ঠিতকারী ও সমস্ত কিছুকে ডর-ভয় থেকে রক্ষাকারী একমাত্র তিনিই। এমন আল্লাহ্’র সম্মানিত নামে আশ্রয় নিয়ে, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে এই কিতাব রচনা করতে আরম্ভ করছি।

আল্লাহ্ তা’আলার প্রতি সমস্ত প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। তাঁর প্রিয় পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করছি। ঐ সম্মানিত পয়গম্বরের পবিত্র আহলে বাইতের সদস্যদের এবং তাঁর আদিল ও সাদিক আসহাবে কিরামের প্রত্যেকের জন্য খায়ের দোয়া করছি।

যাবতীয় নিয়ামত আল্লাহ্ তা’আলা সৃষ্টি করে আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন, ইহা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে ঘোষণা করাকে ‘হামদ’ বলা হয়। আর

সমস্ত নিয়ামতকে ইসলামিয়্যাতের অনুমোদিত পন্থায় ব্যবহার বা ভোগ করাকে ‘শুকর্’ বলা হয়।

ইসলাম দ্বীনের বিশ্বাসের বিষয়সমূহ এবং আদেশ ও নিষেধ সমূহকে অবগত করার জন্য হাজার হাজার মূল্যবান কিতাব রচিত হয়েছে। এগুলি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়েছে। একইসাথে স্বল্প ও ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, ভণ্ড আলেম, জাহিল দ্বীনদার কিংবা বৃটিশ গোয়েন্দাদের দ্বারা প্রতারিত আলেমরা সর্বদাই ইসলামের উপকারী, বরকতময় ও আলোকিত আহকামসমূহকে অর্থাৎ আদেশ ও নিষেধসমূহকে আক্রমণ করে আসছে। তারা ইসলামের উপর কালিমা লেপন করতে, শরীয়তকে পরিবর্তনে ও মুসলমানদেরকে প্রতারিত করতে সর্বদাই স্বচেষ্ট হয়েছে।

বর্তমানে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, ইসলামের আলেমগণ দুনিয়ার সর্বত্র, ইসলামের সঠিক আকীদাকে প্রচারে ও প্রসারে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। ইসলামী ই’তিক্বাদের উপর আগত আক্রমণকে প্রতিহত করতে সর্বদা স্বচেষ্ট আছেন। তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ইসলামিয়্যাতকে আসহাবে কিরামদের থেকে শুনেশুনে শিখে কিতাবে লিপিবদ্ধকারী সঠিক পথের আলেমদেরকে **আহলি সুন্নাত আলেম** বলা হয়। আহলে সুন্নাত আলেমদের রচিত কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেনি কিংবা বুঝতে পারেনি এমন কিছু সংখ্যক ব্যক্তি, কুরআন করীম ও হাদিস শরীফ থেকে মনগড়া ব্যাখ্যা করে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিচ্ছে। এধরণের বক্তব্য মুসলমানদের দৃঢ় ঈমানের সামনে বিলীন হতে বাধ্য। এর দ্বারা মূলত বক্তার দ্বীনী ইলমের দৈন্যতা প্রকাশ পায়।

নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে অথবা জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতে দেখা যায় এমন ব্যক্তিকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হয়। এরপর ঐ ব্যক্তির কোন কথায় বা আচরণে, আহলে সুন্নাত আলেমদের দ্বারা অবহিত করা ঈমানের জ্ঞানের সাথে বিরোধপূর্ণ কিছু প্রকাশ পেলে, তাকে ঐ কথা বা আচরণের কুফর কিংবা দালালাত হওয়ার বিষয়টি বুঝানো উচিত। ঐ আচরণ ত্যাগ করে তওবা করার জন্য আহবান করা উচিত। এরপরও নিজের সীমিত আকল ও ভ্রান্ত চিন্তাধারার দ্বারা নিজের কথা বা আচরণের পক্ষে অবস্থান নিয়ে তা থেকে সরে না আসলে বুঝতে হবে যে, সে পথভ্রষ্ট অথবা

মুরতাদ হয়েছে কিংবা ইংরেজ কাফেরদের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে। এমতাবস্থায় সে যতই নামাজ পড়ুক, হজ্জ করুক, ইবাদত করুক নিজেকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কুফরের সবব্ হিসেবে বিবেচিত কথা, কর্ম বা বিশ্বাস থেকে নিজেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত, তা থেকে তওবা না করা পর্যন্ত মুসলমান হিসেবে বিবেচিত হবে না। এজন্য প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিত, কুফরের সবব্ হয় এমন বিষয়গুলিকে ভালভাবে রপ্ত করা। এবং তা মেনে নিজেকে মুরতাদ হওয়া থেকে রক্ষা করা। একইসাথে কাফিরদের এবং মুসলমানরূপী পথভ্রষ্টদের ও ইংরেজ গোয়েন্দাদের সঠিকভাবে চিনে তাদের ক্ষতি থেকে নিজেরদেরকে বাঁচিয়ে রাখা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, পবিত্র কুরআন করীম ও হাদিস শরীফ থেকে মনগড়া অর্থ ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দেয়া হবে এবং এর দ্বারা বাহাত্তর ধরণের ভ্রষ্ট মুসলমান ফিরকার উৎপত্তি হবে। **বুখারী** ও **মুসলিম** শরীফ থেকে নেয়ে এই হাদিস শরীফের, '**বারিকা**' ও '**হাদিকা**' নামক কিতাবদ্বয়ে এরূপ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। নিজেদেরকে ইসলামের বড়মাপের আলেম বা দ্বীনী বিষয়ের প্রফেসর হিসেবে জাহির করা ঐসব ভ্রান্ত ফিকরার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের কিতাব, প্রবন্ধ, বক্তব্য বা কনফারেন্সের দ্বারা প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। দ্বীন ইমানকে ধ্বংসকারী এই ধরনের বাতিল ফিরকার ফাঁদে পা না দেয়ার জন্য খুবই সতর্ক হওয়া উচিত। এই জাহিল মুসলমানরা ছাড়াও কম্যুনিস্ট ও মাসনরা একদিক থেকে, খৃস্টান মিশনারি ও ইংরেজদের নিকট নিজেদেরকে বিকিয়ে দেয়া ওহহাবীদের সাথে যায়নবাদী ইয়াহুদীরা অন্যদিক থেকে নিত্য নতুন উপায়ে মুসলমান প্রজন্মকে প্রতারিত করতে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মনগড়া লিখনী, নাটক-সিনেমা, টিভি-রেডিওর অনুষ্ঠান ইত্যাদির দ্বারা ইসলাম ও ঈমানকে বিলুপ্ত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এরজন্য বিপুল পরিমাণে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। ইসলামের প্রকৃত আলেমগণ রাহিমাহুমুল্লাহু তা'আলা এদের প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয় জবাব আগে থেকেই লিখে গেছেন ও মুসলমানদেরকে সতর্ক করে গেছেন।

বিখ্যাত আলেম মাওলানা খালিদ-ই বাগদাদী উসমানী কুদ্দিসা সির্ রুহু'এর **ইতিক্বাদনামা** নামক কিতাবটি এই কারণে নির্বাচন করেছি। এই কিতাবটি মরহুম ফয়জুল্লাহ এফেন্দী কর্তৃক তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয়েছে ও '**ফারাইদুল ফাওয়াইদ**' নামে ১৩১২ হিজরীতে মিসরে ছাপা হয়েছে। ঐ অনুবাদকে চলতি ভাষায় রূপান্তর করে 'ঈমান ও ইসলাম' নামে ১৯৬৬ সালে 'হাক্বীকাত কিতাবএভি'র (প্রকাশনার) দ্বারা প্রকাশ করেছি। নিজের ব্যাখ্যাকে মূল কিতাব থেকে আলাদা করার জন্য [] বন্ধনীর ব্যবহার করেছি। এই কিতাবটি প্রকাশ করা আমার নসীব হওয়ায়, আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করছি। ফারসী ভাষার মূল কিতাবটি ইস্তানবুল ইউনিভার্সিটির গ্রন্থাগারে 'ইবনুল আমীন মাহমুদ কামাল বেগ' নামক অংশে '**ইতিক্বাদনামা**' নামে F.2639 নম্বরে মওজুদ আছে। তুর্কী ভাষার অনুবাদ **হাক্বীকাত কিতাবএভি**, '**ঈমান ও ইসলাম**' নামে প্রকাশ করেছে।

'**দুররুল মুখতার**' কিতাবের লেখক আলাউদ্দীন-ই হাস্‌কাফি রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা, কাফিরের নিকাহ অধ্যায়ের শেষে বলেছেন যে, "বিবাহিত মুসলিম বালিকা বালিগা হওয়ার সময় ঈমানের শর্তসমূহ না জেনে থাকলে, নিকাহ ফাসিদ হয়। [অর্থাৎ, মুরতাদ হয়ে যায়।] এজন্য তাকে আল্লাহ্ তা'আলার সিফাতসমূহ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া উচিত। আর তার উচিত এগুলি শিখে, বিশ্বাস করে মুখে স্বীকার করা"। ইবনে আবিদীন রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা এই বিষয়ের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, "কন্যা ছোট অবস্থায় তার মা-বাবার অনুসারী হিসেবে মুসলমান থাকে। কিন্তু বালিগা হওয়ার সময় আর মা-বাবার অনুসারী হিসেবে বিবেচিত হয় না। ইসলামিয়্যাত না জেনে বালিগা হলে মুরতাদ হয়ে যায়। ঈমানের মৌলিক ছয়টি বিষয় শিখে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত এবং ইসলামের আনুগত্য বাধ্যতামূলক তা মেনে না নেয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র '**কালিমা-ই তাওহীদ**' তথা '**লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর্ রাসূলুল্লাহ**' বললেও মুসলমানিত্ব বজায় থাকে না। '**আমানতু বিল্লাহি**...'তে উল্লেখ করা ছয়টি বিষয়কে শিখে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ও নিষেধসমূহকে মেনে নেয়া আবশ্যক"। ইবনে আবিদীন (রঃ) এর এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, কোন কাফির শুধুমাত্র কালিমা-ই তাওহীদ বললে এবং এর অর্থ বুঝে বিশ্বাস করলে ঐ মুহূর্তেই মুসলমান হয়ে যায়। এরপর প্রত্যেক মুসলমানের মত তার উপরও সামর্থ্য

অনুযায়ী, **‘আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরী ওয়া বিল কাদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তা’আলা ওয়াল বা’সু বা’দাল মাউতি হাককুন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু’** বলে ঈমানের এই ছয়টি মৌলিক বিষয়কে অর্থসহ ভাল করে বুঝে মুখস্ত করা এবং নিজের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে ইসলামের যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। কোন মুসলমান শিশুও যদি এই ছয়টি বিষয় ও ইসলামের আহকামসমূহ না শিখে ও স্বীকার না করে আর ঐ অবস্থায় আকেল ও বালেগ হয় তবে সে মুরতাদে পরিণত হয়। ঈমান গ্রহণের সাথে সাথে **ইসলামের আহকামসমূহ** অর্থাৎ **ফরজ**সমূহ, **হারাম**সমূহ, অজু-গোসল ও নামাজ আদায়ের নিয়মসমূহ, সতরের স্থান ইত্যাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে শিখে নেয়া **ফরজ** হয়। যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তার উপরও, সঠিকভাবে শিক্ষা দেয়া বা সঠিক দ্বীনী কিতাবের সন্ধান দেয়া ফরজ হয়। এ বিষয়ে অনুসন্ধান না করলে কাফির হয়ে যাবে। সন্ধান পাওয়ার আগ পর্যন্ত এই বিষয়গুলি না জানা উজর হিসেবে গণ্য হবে। যদি কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ নামাজ আদায় না করে, সে একটি হারাম কাজ করলো এবং এর জন্য তাকে জাহান্নামের আগুনে পুড়তে হবে। **ইমান এবং ইসলাম** কিতাবটি এই ছয়টি উপাদান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছে। প্রত্যেক মুসলিমের এইকিতাবটি পড়া উচিত, তার বাচ্চাদের পড়ানো উচিত এবং প্রতিবেশীদের এটি পড়তে উৎসাহিত করা উচিত। আওরাতের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে **অশেষ রহমত** কিতাবের চতুর্থ অধ্যায়ে।

এই কিতাবে আয়াতে করীমার অর্থ লেখার সময়, (তাফসির আলেমগণ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ) উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা আয়াতে করীমার প্রকৃত অর্থ শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতেন এবং তিনি তা আসহাবে কিরামকে অবহিত করেছেন। প্রকৃত মুফাসসিরগণ, এই হাদিস শরীফগুলিকে মুনাফিক ও ইংরেজ কাফিরদের নিকট বিক্রি হয়ে যাওয়া ভ্রান্ত জিনদিক্ ও মাজহাব বিরোধী দ্বীন আলেমদের দ্বারা জালকৃত হাদিস থেকে আলাদা করে গেছেন। যেসব বিষয়ে হাদিস শরীফ বর্নিত হয়নি সেসব বিষয়ে তাফসীরের কায়দা অনুসরণ করে নিজেরা অর্থ প্রদান করেছেন। আরবী জানে

কিন্তু তাফসীর ইলম জানে না এমন দ্বীন জাহিলদের দেয়া ব্যাখ্যাকে **কুরআন তাফসীর** বলা হয় না। এজন্য হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, "**কুরআন করীমকে নিজের মনগড়া অর্থ প্রদানকারী কাফির হল**"।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে আহলি সুন্নাত আলেমদের দ্বারা প্রদর্শিত সঠিক পথে অবিচল থাকার তৌফিক দিক। মুসলমান নামধারী অথচ ইসলাম বিরোধী, মাজহাব বিরোধী মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা প্রচারণা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুক! আমীন!

হাকীকাত কিতাবএভি'র প্রকাশিত সকল কিতাবসমূহ, বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে দুনিয়ার সর্বত্র প্রচারিত হচ্ছে।

সতর্কতা: মিশনারিরা খৃস্টান ধর্ম, ইয়াহুদীরা তালমুদ, আর হাক্বীকাত কিতাবএভি ইসলাম প্রচারের জন্য চেষ্টা করছে। আর মাসন্‌রা দ্বীন ধ্বংসে লিপ্ত। বিবেকবান, ইলম ও ইনসাফের অধিকারী ব্যক্তিরা এগুলির মাঝে কোনটি হক্ব তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। সে অনুযায়ী সেই জিনিসের প্রচার-প্রসারে সাহায্য করে। এভাবে সে নিজের ও অন্যান্য মানুষদের দুনিয়া ও আখিরাতে চিরন্তন সৌভাগ্য অর্জনের সবব্ হয়।

বর্তমানে পুরো দুনিয়ার মুসলমানগণ তিন ভাগে ভাগ হয়েছেন। এর মাঝে প্রথমটি হল, সম্মানিত সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী প্রকৃত মুসলমান। এদেরকে **আহলি সুন্নাত** বা **সুন্নী** কিংবা '**ফিরকা-ই নাজিয়া', ** জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া দল বলা হয়। দ্বিতীয় ভাগ হল, আসহাবে কিরামের শত্রু। তাদেরকে **শিয়া** বা **ফিরকা-ই দাল্লা** বলা হয়। আর তৃতীয় ভাগ হল সুন্নী ও শিয়াদের দুষমন। এদেরকে **ওহহাবী** বা **নজদী** বলা হয়। কেননা এরা প্রথম আরবের নজদ্ শহরে প্রকাশিত হয়েছিল। এদেরকে '**ফিরকা-ই মালউনা**'ও বলা হয়। কেননা এরা মুসলমানদেরকে কাফির আখ্যা দিয়ে থাকে, যা আমাদের **'সা'আদাত-ই আবাদিয়্যা'** ও **'কিয়ামত ও আখেরাত'** নামের কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মুসলমানদের যারা কাফির বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। মুসলমানদেরকে এভাবে তিন ভাগে খৃস্টান ও ইহুদীরা ভাগ করেছে।

প্রত্যেক মুমিনের উচিৎ নাফসকে পরিশুদ্ধ করার জন্য, অর্থাৎ স্বভাব-প্রকৃতির মাঝে থাকা অজ্ঞতা ও পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সর্বদা বেশি বেশি '**লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ**' বলা। আর ক্বালবের পরিশুদ্ধির জন্য, অর্থাৎ নাফস, শয়তান, অসৎসঙ্গ এবং ক্ষতিকর ও ভ্রান্ত দর্শনের কিতাব থেকে আসা কুফর ও গুনাহের হাত থেকে বাঁচার জন্য '**আস্তাগফিরুল্লাহ**' বলা। যারা ইসলামিয়্যাতের অনুসরণ করল এবং তওবা করল তাদের দোয়া কবুল হবে। যারা নামাজ আদায় করে না, বেপর্দা নারীদের দিকে নজর দেয়, হারাম ভক্ষণ করে তারা ইসলামিয়্যাতের অনুসারী নয়। এদের দোয়া কবুল হয় না।

২০০১ খৃস্টাব্দ   ১৩৮০ হিজরী শামসী   ১৪২২ হিজরী কামেরী

-১-

প্রারম্ভিকা

মাওলানা খালিদ-ই বাগদাদী কাদ্দাসাল্লাহু তায়ালা সিররুহুল-আজিজ, কিতাবের শুরুতেই **ইমাম-ই রব্বানী আহমদ ফারুকী শেরহিন্দী** রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর '**মাকতুবাত**' কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের সতেরতম মাকতুবকে স্থান দিয়ে নিজ কিতাবের সৌন্দর্য ও বরকত বৃদ্ধির কামনা করেছেন। **ইমাম-ই রব্বানী**[1] কুদ্দিসা সিররুহু, এই মাকতুবে ফরমায়েছেন যে:

আমার মাকতুবটি বিসমিল্লাহ্ দ্বারা আরম্ভ করলাম। যিনি আমাদেরকে সকল ধরণের নিয়ামত প্রদান করেছেন এবং এর মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হিসেবে আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে কবুল করে সম্মানিত করেছেন ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত বানিয়ে মর্যাদাবান করেছেন, সেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অসংখ্য হামদ ও শুকরিয়া আদায় করছি।

এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা ও উপলব্ধি করা দরকার যে, প্রত্যেকের প্রতি প্রতিটি নিয়ামত কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলাই প্রেরণ করেন। কেবলমাত্র তিনিই প্রতিটি জিনিসের অস্তিত্ব প্রদান করেন। তিনিই অস্তিত্ববান প্রতিটি জিনিসের অস্তিত্বকে প্রতি মুহূর্তে টিকিয়ে রেখেছেন। বান্দার মাঝে বিদ্যমান যাবতীয় মহৎ ও সুউন্নত গুণাবলী, কেবলমাত্র তাঁরই দয়া ও ইহসানের প্রকাশ। আমাদের হায়াত, আকল, ইলম, ক্ষমতা, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাকশক্তি ইত্যাদির সবই তাঁর কৃপা মাত্র। গুণে শেষ করা অসম্ভব এরূপ বিভিন্ন ধরণের অশেষ নিয়ামতের একমাত্র প্রেরক তিনিই। মানুষকে বিপদ আপদ থেকে, দুর্ভোগ থেকে, কষ্টকর অবস্থা থেকে পরিত্রাণকারী, দোয়া কবুলকারী, দুঃখ ও কষ্ট লাঘবকারীও একমাত্র তিনিই। সকল ধরণের রিজিকের সৃষ্টিকারী ও চাহিদানুযায়ী যোগানদানকারী একমাত্র তিনিই। তাঁর ইহসান তথা অনুগ্রহ

[1] ইমাম রব্বানী, ১০৩৪ হিজরীতে (১৬২৪ খৃস্টাব্দে) ইনতকিাল করছেনে।

এতটাই ব্যাপক যে, গুনাহ করা সত্ত্বেও পাপিষ্ঠকে রিজিক থেকে বঞ্চিত করেন না। কৃত গুনাহসমূহকে এতটাই গোপন রাখেন যে, যারা তাঁর আদেশের অবাধ্য হয় ও নিষেধকে অমান্য করে তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে সমাজে অপদস্ত ও অপমানিত করেন না, সম্ভ্রমের পর্দাকে ছিন্ন করেন না। তাঁর ক্ষমা ও করুণা এতই ব্যাপক যে, কৃত কর্মের কারণে শাস্তি ও আজাব ভোগের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে অবকাশ দেন, এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেন না। তাঁর নিয়ামত ও ইহসান তাঁর দোস্ত ও দুশমন সকলের মাঝেই বণ্টন করেন। কাউকেই মাহরুম করেন না। যাবতীয় নিয়ামতসমূহের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক মূল্যবান হিসেবে সঠিক পথ, সৌভাগ্য ও চিরমুক্তির পথ বাতলে দেন। এই পথ থেকে বিচ্যুত না হওয়ার জন্য ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। জান্নাতের সীমাহীন নিয়ামত, অশেষ ও অসংখ্য স্বাদকে উপভোগের জন্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা অর্জনের জন্য আমাদেরকে তাঁর প্রিয় পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত পথের অনুসরণের জন্য আদেশ দিয়েছেন। এভাবেই মহান আল্লাহ্ তায়ালার প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ দিবালোকের মতই স্পষ্ট। অন্যদের থেকে আসা কল্যাণও মূলত তাঁরই পক্ষ থেকে প্রেরিত। কেননা, অন্যদেরকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারকারী, তাদের মাঝে কল্যাণ সম্পাদনের ইচ্ছার সঞ্চারকারী ও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা প্রদানকারীও একমাত্র তিনিই। একারণেই, যেভাবেই হোক, যেখান থেকেই হোক কিংবা যার থেকেই হোক আমরা যত নিয়ামত পাচ্ছি তার সবই একমাত্র মহান আল্লাহ্ তায়ালার অসীম রহমতের বদৌলতেই পাচ্ছি। অতএব, তিনি ব্যতীত অন্য কারো থেকে মঙ্গল, কল্যাণ ও ইহসান প্রত্যাশা করা আমানত রক্ষাকারীর থেকে অন্যের রাখা আমানত চাওয়ার অনুরূপ। ফকিররের থেকে সদকা প্রত্যাশার অনুরূপ। এই বক্তব্য যে যথার্থ ও সঠিক তা জাহিলরাও আলেমদের মত, বোকারাও বুদ্ধিমানদের মত, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্নদের মত অবগত আছে। কেননা উপরে যা বলা হয়েছে তা দিবালোকের মতই স্পষ্ট, তা বুঝার জন্য চিন্তা করারও কোন প্রয়োজন নাই।

সকল ধরণের নিয়ামত প্রেরণকারী আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি মানুষের যথাসাধ্য শুকরিয়া আদায় করা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মূলত মানবিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। বিবেক কর্তৃক আদিষ্ট এক কর্তব্য ও ঋণ। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অবশ্য পালনীয় এই শুকরিয়া যথাযথভাবে আদায় করা সহজ কোন কাজ নয়। কেননা মানুষ অস্তিত্বহীন ছিল আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ অতি দুর্বল, মুখাপেক্ষী, গুনাহগার ও অপরাধী। অথচ মহান আল্লাহ্ তা'আলা অনাদি, অনন্ত, চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব। যিনি সকল ধরণের দোষত্রুটি থেকে পূতপবিত্র। সকল ধরণের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র অধিকারী। মহান আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মানুষের কোন দিক দিয়েই কোন ধরণের সাদৃশ্য বা তুলনার অবকাশ নাই। এমতাবস্থায় এইরূপ অধম বান্দা ঐরূপ সুসম্মানিত ও সুউচ্চ মার্যাদার অধিকারী মহান আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যথোপযুক্ত এক শুকরিয়া আদায় করতে কিভাবে সক্ষম হতে পারে? কেননা এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা মানুষের নিকট অতি মূল্যবান ও সৌন্দর্যময় মনে হয়। কিন্তু মহান আল্লাহ্র নিকট তা কুৎসিত ও মন্দ বিবেচিত হওয়ায় অপছন্দনীয় হতে পারে। আমরা যা কিছুকে সম্মান ও শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যম হিসেবে ধারণা করি তা মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অপছন্দনীয় হতে পারে, অভদ্রতা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এ কারণেই, মানুষ তার ত্রুটিপূর্ণ আকল ও ক্ষীণদৃষ্টির দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন ও শুকরিয়া আদায়ের উপায়সমূহের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়। শুকরিয়া আদায়ের ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ মহান আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অবহিত না করা পর্যন্ত, আমাদের নিকট প্রশংসা আদায়ের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত জিনিসগুলি, প্রকৃতপক্ষে অবমাননা ও অমর্যাদার মাধ্যমও হতে পারে।

যথার্থই, মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ক্বালবের দ্বারা, জিহ্বার দ্বারা ও শরীরের দ্বারা বিশ্বাস করতে ও পালন করতে বাধ্য যে শুকরিয়ার ঋণ ও ইবাদতসমূহ রয়েছে, মহান আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তা অবহিত করা হয়েছে, তাঁর প্রিয় পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রবর্তন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রদর্শিত ও আদিষ্ট

বান্দার জন্য অবশ্য পালনীয় এই কর্তব্যসমূহকে ‘**ইসলামিয়্যাত**’ বলা হয়। মহান আল্লাহ্ তা‘আলার প্রতি শুকরিয়া আদায়, কেবলমাত্র তাঁর পয়গম্বরের আনীত পথের অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব। তাঁর প্রদর্শিত পথকে অমান্য করে মনগড়া উপায়ে কৃত কোন শুকরিয়া, কোন ইবাদত আল্লাহ্ তা‘আলা কবুল করবেন না, পছন্দ করবেন না। কেননা মানুষের নিকট উত্তম ও কল্যাণকর হিসেবে বিবেচিত এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা ইসলামিয়্যাত অপছন্দ করে এবং এগুলিকে কুৎসিত ও অকল্যাণকর হিসেবে ঘোষণা করে।

অতএব, যারা নিজেদেরকে আকলের অধিকারী দাবী করে তাদের উপর, আল্লাহ্ তা‘আলার শুকরিয়া আদায়ের জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করা আবশ্যক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত এই পথকে ‘**ইসলামিয়্যাত**’ বলা হয়। আর রাসূলের অনুসারীকে **মুসলমান** বলা হয়। আল্লাহ্ তা‘আলার শুকরিয়া আদায় করা অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করাকে **ইবাদত** বলা হয়। ইসলামী জ্ঞান দুই ধরণের: দ্বীনী জ্ঞান, বস্তুবাদী জ্ঞান। দ্বীনের সংস্কারপন্থীরা দ্বীনী জ্ঞানকে **স্কলাষ্টিক** আর **বস্তুবাদী জ্ঞান**কে যুক্তিনির্ভর মনে করে। দ্বীনি জ্ঞান আবার দুই ভাগে বিভক্ত।

১. ক্বালবের দ্বারা ইতিক্বাদ তথা বিশ্বাস করা আবশ্যক এমন জ্ঞান। এই ধরণের ইলমকে ‘**উসুলুদ-দ্বীন**’ অথবা **ঈমানে**র জ্ঞান বলা হয়। সংক্ষেপে **ঈমান** বলতে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক অবহিত করা ছয়টি বিষয়কে বিশ্বাস করা, ইসলামিয়্যাতকে কবুল করা এবং কুফরের আলামত হিসেবে বিবেচিত বিষয়গুলি বলা, করা কিংবা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকাকে বুঝায়। এ কারণে প্রত্যেক মুসলমানেরই, কুফরের আলামত হিসেবে বিবেচিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা রাখা ও তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়ে রাখা আবশ্যক। যার ঈমান আছে তাকেই **মুসলমান** বলা হয়।

২. শরীরের দ্বারা বা ক্বালবের দ্বারা পালন করতে হবে কিংবা বিরত থাকতে হবে এমন ইবাদতের জ্ঞান। পালন করার জন্য আদেশ করা হয়েছে

এমন বিষয়গুলিকে **ফরজ** আর ত্যাগ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে এমন বিষয়কে **হারাম** বলা হয়। এগুলিকে একত্রে '**ফুরু উদ্-দ্বীন**' বা '**আহকামে ইসলামিয়া**' কিংবা '**ইসলামিয়্যাত**'এর ইলম বলা হয়।

[প্রত্যেকের জন্য সর্বপ্রথম পালনীয় বিষয় হল, মুখে '**কালিমা-ই তাওহীদ**' বলা এবং এর অর্থকে বুঝে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা। কালিমা-ই তাওহীদ বলতে, '**লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ**'কে বুঝায়। এর অর্থ হল, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই ও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল। এই কালিমা বিশ্বাস করাকে ঈমান বা ইসলাম গ্রহণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে **মুমিন** বা **মুসলমান** বলা হয়। ঈমানের নিরবিচ্ছিন্ন হওয়া আবশ্যক। একারণে কুফরের সবব হিসেবে বিবেচিত কোন কিছু করা থেকে বিরত থাকা উচিত একইভাবে কুফরের আলামত হিসেবে বিবেচিত কোন কিছু ব্যবহার করাও উচিত নয়।

কুরআন করীম মহান আল্লাহ্ তায়ালার কালাম। মহান আল্লাহ্ তা'আলা, হযরত জিবরাঈল আলাইইস্ সালাম নামক ফেরেশতার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তা প্রেরণ করেছেন। পবিত্র কুরআন করীমের কালিমাগুলি আরবী। তবে এই কালিমাগুলিকে মহান আল্লাহ্ তা'আলাই এভাবে সাজিয়েছেন। কুরআন করীমের আরবী কালিমাগুলি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই এইরূপে আয়াত, কালিমা বা হরফ হিসেবে প্রেরিত হয়েছে। এই হরফ বা কালিমাসমূহ ইলাহী কালামের অর্থকে ধারণ করে। একারণেই এই হরফ বা কালিমাগুলিকেও **কুরআন** বলা হয়। একইসাথে ইলাহী কালামের প্রতি নির্দেশকারী অর্থসমূহও কুরআন হিসেবে বিবেচিত। এই ধরণের ইলাহী কালামের অন্তর্ভুক্ত হওয়া কুরআন মাখলুক তথা সৃষ্টি নয়। মহান আল্লাহ্ তা'আলার অন্যান্য সিফাতসমূহের মতই অনাদি ও অনন্ত। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম প্রতি বছর একবার, ঐ সময় পর্যন্ত অবতীর্ন হওয়া কুরআন করীমকে 'লাওহে মাহফুজ'এর ক্রমধারা অনুযায়ী তিলাওয়াত করতেন, আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর সাথেসাথে একইভাবে তিলাওয়াত করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখিরাতে

তাশরীফের বছরে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম দুইবার এসে একইভাবে সম্পূর্ণ কুরআন করীম তিলাওয়াত করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর আসহাব্ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আলাইহিম আজমাঈনের প্রায় সকলেই সম্পূর্ন কুরআন করীমের হাফিজ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পরে প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হাফিজ সাহাবীদেরকে সম্মিলিত করে ও বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো কুরআন করীমের প্রতিলিপিগুলিকে একত্রিত করে একটি পরিষদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ কুরআন করীমকে লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। এভাবেই '**মুসহাফ**' নামক এই কিতাব প্রকাশিত হল। এই মুসহাফের প্রতিটি হরফকে যে সঠিক ও যথাযথ স্থানে প্রতিস্থপন করা হয়েছে সে ব্যাপারে তৎকালীন তেত্রিশ হাজার সাহাবীর সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসমূহকে **হাদিস শরীফ** বলা হয়। এগুলির মাঝ থেকে যেগুলির মা'না বা অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কিন্তু কালিমাসমূহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে প্রকাশ পেয়েছে সেগুলিকে '**হাদিস-ই কুদসী**' বলা হয়। হাদিস শরীফের বহু কিতাব রয়েছে। এগুলির মাঝে '**বুখারী**' ও '**মুসলিম**' নামক কিতাবদ্বয় বিখ্যাত।

মহান আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের মধ্য থেকে, বিশ্বাস স্থাপন করার বিষয়গুলিকে **ঈমান**, অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহকে **ফরজ** আর অবশ্য পরিত্যায্য বিষয়গুলিকে **হারাম** বলা হয়। ফরজ ও হারামকে একত্রে '**আহকামে ইসলামিয়্যা**' বলা হয়। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলি থেকে কোন একটিকেও যদি কেউ অবিশ্বাস করে তবে সে **কাফিরে** পরিণত হবে।

মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয় দ্বিতীয় বিষয়টি হল, ক্বালবের পরিশুদ্ধি করা। ক্বালব বলতে দুইটি জিনিসকে বুঝায়। বুকের মাঝে অবস্থিত গোশতের পিণ্ডকে সাধারণ অর্থে ক্বালব বলা হয়। হৃৎপিণ্ড নামক এই ক্বালব পশুপাখির মাঝেও বিদ্যমান। দ্বিতীয় প্রকারেরটি হল হৃৎপিণ্ডে বিদ্যমান অদৃশ্য ক্বালব। একে হৃদয়ও বলা হয়। দ্বীনি কিতাবসমূহে বর্নিত ক্বালবের দ্বারা মূলত এই

হৃদয়কেই বুঝানো হয়। ইসলামী ইলম এই ক্বালবেই অবস্থান করে। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের বিষয়টি মূলত এই ক্বালবের সাথেই সম্পৃক্ত। বিশ্বাসী ক্বালব পবিত্র হয় আর অবিশ্বাসী ক্বালব অপবিত্র ও মৃত্যু সাদৃশ হয়। ক্বালবের পরিশুদ্ধির জন্য চেষ্টা করা আমাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দ্বায়িত্ব। ইবাদত করলে বিশেষ করে নামাজ পড়লে ও ইসতিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করলে ক্বালব পরিশুদ্ধ হয়। হারামে লিপ্ত হলে ক্বালব নষ্ট হয়ে যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, "**বেশি বেশি ইসতিগফার কর। যে বেশিবেশি ইসতিগফার করে মহান আল্লাহ্ তায়ালা তাকে অসুখ বিসুখ থেকে, বালা-মুসীবত থেকে হেফাজত করেন, অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে রিজিক প্রদান করেন**"। ইসতিগফার বলতে '**আস্তাগফিরুল্লাহ**' বুঝায়। দোয়া কবুলের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। দোয়া পাঠকারী ব্যক্তির মুসলমান হতে হবে, কৃত গুনাহের জন্য তওবা করতে হবে এবং দোয়ায় যা বলা হচ্ছে তা জেনে, বুঝে ও বিশ্বাস করে পেশ করতে হবে। অপরিশুদ্ধ ক্বালবের দ্বারা কৃত দোয়া কবুল হয় না। নিয়মিত তিন দফা দোয়া পাঠকারী ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির ক্বালব পরিশুদ্ধ হয় ও দোয়ায় শরীক হয়। মুখে করা দোয়ার সাথে যদি ক্বালব শরীক না হয় তবে সেই দোয়ার দ্বারা কোন ফায়দা অর্জিত হয় না।

ইসলাম ধর্মের অবহিত করা দ্বীনী ইলমসমূহ, **আহলি সুন্নাত** আলেমগণের রচিত কিতাবসমূহের মাঝে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আহলি সুন্নাত আলেমগণ কর্তৃক ঈমানী ও ইসলামী ইলমসমূহ সম্পর্কে যা অবহিত করা হয়েছে তার মাঝে, যে সবের মা'না বা অর্থ স্পষ্ট এমন '**নাস্**' তথা আয়াতে করীমা বা হাদিস শরীফ থেকে উদ্ধৃত সেগুলির কোন একটিকে কেউ অবিশ্বাস করলে **কাফিরে** পরিণত হবে। এই অবিশ্বাসের বিষয়টি গোপন করলে তাকে **মুনাফিক** বলা হবে। আর কেউ যদি অবিশ্বাসের বিষয়টি গোপন করার সাথেসাথে নিজেকে মুসলমান হিসেবে জাহির করে তাদের সাথে প্রতারণা করার চেষ্টা করলে তাকে '**জিনদিক**' বলা হয়। কেউ মা'না বা অর্থ স্পষ্ট নয় এমন 'নাস্ 'এর ভুল ব্যাখ্যা করে ভুলভাবে বিশ্বাস করলে কাফির হবে না। তবে আহলি সুন্নাতের সঠিক পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য তাকে জাহান্নামের আযাব ভোগ

করতে হবে। এই ধরণের ব্যক্তি যেহেতু মা'না বা অর্থ স্পষ্ট এমন 'নাস্'এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাই সে চিরকাল জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে না। পাপের শাস্তি ভোগের পরে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। এদেরকে **আহলি বিদায়াত** বা **দালালাত ফিকরা**র অনুসারী বলা হয়। বাহাত্তর ধরণের দালালাত ফিকরা রয়েছে। এই ধরণের ব্যক্তিরা সহ কাফির ও মুরতাদদের কৃত ইবাদতসমূহ এবং জনসেবা, জনকল্যাণ ও খেদমতসমূহের কিছুই কবুল করা হয় না। তাই এর দ্বারা আখিরাতের কোন ফায়দা অর্জিত হবে না। সহীহ ইতিক্বাদের অধিকারী মুসলমানদেরকে **আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত** কিংবা সংক্ষেপে **সুন্নী** বলা হয়। আহলি সুন্নাতের অনুসারীরা ইবাদতের ক্ষেত্রে চারটি মাজহাবে আলাদা হয়েছে। এই চার মাজহাবের অনুসারীদের প্রত্যেকেই একে অপরকে আহলি সুন্নাতের অনুসারী হিসেবে মনে করে ও পরস্পরকে ভালবাসে। এই চার মাজহাব থেকে কোন একটিকে অনুসরণ না করে এর বাইরের কোন মাজহাবের অনুসারীরা আহলি সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। যারা আহলি সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয় তারা হয় কাফির না হয় আহলি বিদায়াত। এ ব্যাপারে ইমাম রব্বানী কুদ্দিসা সিররুহু'এর মাকতুবাতের মধ্যে বিশেষ করে প্রথম খণ্ডের দুইশ ছিয়াশিতম মাকতুবে, '**দুর্ রুল মুখতার**' নামক কিতাবের জন্য রচিত তাহতাবীর হাশিয়ার 'যাবায়িহ' অংশে এবং '**আল-বাসাইর লি মুনকিরিত-তাওয়াসসুলি বি আহলিল-মাকাবির**' নামক কিতাবে প্রমাণসহ বর্ননা রয়েছে। শেষের কিতাব দুইটি আরবী ভাষায় রচিত। শেষের কিতাবটি হিন্দুস্তানে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৯৫ হিজরীতে [১৯৭৫ খৃ:] ও পরবর্তীতে কিতাবটি ইস্তানবুলে হাকীকাত কিতাবএভির পক্ষ থেকে নিয়মিত প্রকাশ হয়ে আসছে।

চার মাজহাবের কোন একটি অনুযায়ী যারা ইবাদত করে, তারা গুনাহের কাজ করলে কিংবা ইবাদতের ক্ষেত্রে ত্রুটি করলে অতঃপর এর জন্য তওবা করলে কৃত গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। যদি এর জন্য তওবা না করে তবে মহান আল্লাহ্ তায়ালা চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন, এর জন্য জাহান্নামের আযাবের মুখোমুখি করবেন না। আবার চাইলে গুনাহের জন্য কিছুটা আযাব

দিয়ে পরবর্তীতে সেখান থেকে মুক্ত করবেন। অর্থাৎ আহলি সুন্নাতের অনুসারীরা কৃত গুনাহের জন্য আযাব ভোগ করলেও এক পর্যায়ে যেয়ে অবশ্যই তা থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। দ্বীনের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি, যা সম্পর্কে জাহিলরাও অবগত এবং যা অতি স্পষ্ট এমন বিষয়ের কোন একটিকে অবিশ্বাস করলে চিরকালের জন্য জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হবে। এরূপ যারা করে তাদেরকে **কাফির** কিংবা **মুরতাদ** বলা হয়।

আহলি কিতাব কিংবা কিতাবহীন এই বিবেচনায় কাফিরদেরকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। মুসলমানের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীতে দ্বীন থেকে বের হয়ে যে কাফির হয় তাকে **মুরতাদ** বলা হয়। হযরত ইবনে আবিদীন রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা, শিরকের কারণে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম তাদের বর্ননা করার সময় বলেছেন যে, "মুরতাদ, মুলহিদ, জিনদিক, মাযুসী, মূর্তিপূজারী, পুরাতন গ্রীক দর্শনের অনুসারী, [ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ], বাতেনী, ইবাহী ও দুরজীদের অন্তর্ভুক্ত সকলেই কিতাবহীন কাফির হিসেবে বিবেচিত"। কম্যুনিস্ট ও মাসনরাও অনুরূপ। খৃস্টান ও ইহুদীদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত **তাওরাত** ও **ইনজিল** নামক কিতাবগুলিকে মানবসন্তান কর্তৃক পরিবর্তন ও ধ্বংস করার পরে যে রূপ ধারণ করেছে তাকে বিশ্বাস করে অনুসরণ করছে তারা আহলি কিতাব কাফির হিসেবে বিবেচিত। এদের মধ্য থেকে যারা কোন সৃষ্টির মাঝে উলুহিয়্যাতের সিফাত বিদ্যমান রয়েছে বলে বিশ্বাস করে তাদেরকে **মুশরিক** বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলার **সিফাত-ই যাতিয়্যা** ও **সিফাত-ই সুবুতিয়্যা**কে একত্রে **উলুহিয়্যাত সিফাত** বলা হয়।

কিতাবহীন কিংবা আহলি কিতাবের অন্তর্ভুক্ত কোন কাফির যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে সে নিজেকে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্ত করতে পারে। ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে সে একজন নিষ্পাপ মুসলমানে পরিণত হয়। তবে, একজন **সুন্নী** মুসলমান হওয়া আবশ্যক। সুন্নী মুসলমান বলতে আহলি সুন্নাত আলেমদের 'রাহিমাহুমুল্লাহু তায়ালা' রচিত কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করে শিখে, তদনুযায়ী নিজের ঈমান, আমল, কথাবার্তা ও জীবন যাপন করাকে বুঝায়। দুনিয়াতেকোন ব্যক্তির মুসলমান নাকি অমুসলমান তা, তার স্পষ্টভাবে বলা কথা

ও কর্মের দ্বারা বুঝা যায়। তবে তা চাপ ও বাধ্যবাধকতা মুক্ত হতে হবে। এই ধরণের লোকের আখিরাতে ঈমানসহ না ঈমানহীন অবস্থায় গমন করেছে তা তার শেষ নিশ্বাসের সময় পরিষ্কার হয়। কবীরা গুনাহ সম্পাদনকারী পুরুষ কিংবা নারী যদি পরিশুদ্ধ ক্বালবের দ্বারা তওবা করে তবে তার গুনাহসমূহ ইনশাল্লাহ ক্ষমা করা হবে। যার তওবা গৃহীত হয় সে নিষ্পাপ শিশুর মত হয়। **তওবা** কি ও কিভাবে তা করতে হয়, এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা '**ঈমান ও ইসলাম**' এবং '**সাআদাত-ই আবাদিয়্যা**' নামক কিতাবের মত অন্যান্য ইলমে হাল কিতাবেও লিপিবদ্ধ রয়েছে।]

-২-

ঈমান ও ইসলাম

এই (**ইতিক্বাদনামা**) কিতাবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের **ঈমান** ও **ইসলাম** সম্পর্কিত একটি হাদিস শরীফের ব্যাখ্যা দেয়া হবে। এই হাদিস শরীফের বরকতে মুসলমানদের ইতিক্বাদ পূর্ণতা পাবে [আরো শক্তিশালী হবে] এবং এর দ্বারা তারা চূড়ান্ত সফলতা ও চিরসৌভাগ্য অর্জন করতে পারবে। আর একারনে তা বহু গুনাহ ও ভুলত্রুটির অধিকারী এই খালেদের 'কুদ্দিসা সিররুহু' মুক্তি অর্জনের একটি সবব হবে, এই প্রত্যাশা করছি।

কোন কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী নন, সীমাহীন দয়া ও দানশীলতার মালিক এবং বান্দাদের প্রতি পরম সহানুভূতিশীল মহান আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে আমার উত্তম ইতিক্বাদ এই যে, কেবলমাত্র তিনিই স্বল্প পুঁজি ও অপরিচ্ছন্ন ক্বালবের অধিকারী এই ফকির খালেদের ভ্রান্ত কথাবার্তাকে ক্ষমা করতে পারেন, ত্রুটিপূর্ণ ইবাদতসমূহ কবুল করতে পারেন, প্রতারক ও মিথ্যাবাদী শয়তানের অনিষ্ট থেকে [ও ইসলামের শত্রুদের ভ্রান্ত ও মিথ্যা কথাবার্তা ও লেখনীর দ্বারা প্রতারিত হওয়ার হাত থেকে] রক্ষা করে প্রশান্তি দিতে পারেন। দয়াবানদের মাঝে শ্রেষ্ঠ দয়াময় ও দানশীলদের মাঝে শ্রেষ্ঠ দানশীলও কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলাই।

ইসলামের আলেমগণ বলেছেন যে, **মুকাল্লিফ** তথা বালেগ ও আকেল প্রত্যেক নারী ও পুরুষ মুসলমানের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য হল [মহান আল্লাহ্ তা'আলাকে যাথাযথভাবে চিনা ও জানা, অর্থাৎ] মহান আল্লাহ্ তা'আলার সিফাত-ই যাতিয়্যা ও সিফাত-ই সুবুতিয়্যাকে সঠিকভাবে জানা ও তদনুযায়ী বিশ্বাস করা আবশ্যক। এটিই প্রত্যেকের জন্য প্রথম ফরজ কর্তব্য। এ ব্যাপারে অজ্ঞতা কোন বাহানা হিসেবে গৃহীত হবে না। না জানাটা গুনাহ হিসেবে

বিবেচিত হবে। আহম্মদের পুত্র খালেদ-ই বাগদাদী 'কুদ্দিসা সিররুহু' এর এই কিতাব রচনা, অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা, ইলম বিক্রি করা কিংবা খ্যাতি অর্জন করার জন্য নয়। বরং একটি স্মৃতি ও খেদমত রেখে যাওয়ার জন্য রচিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা এই অসহায় খালেদকে[2] ও সকল মুসলমানকে নিজের শক্তির দ্বারা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক রূহের বরকতে মদদ করুক! আমীন!

[আল্লাহ্ তা'আলার **সিফাত-ই যাতিয়্যা** ছয়টি। এগুলি হল: **উজুদ, কিদাম, বাকা, ওয়াহদানিয়্যাত, মুখালাফাতুন লিল হাওয়াদিস্** এবং **কিয়াম-উ বি নাফসিহি**। উজুদ মানে নিজ থেকেই অস্তিত্বশীল হওয়া। কিদামের অর্থ হল, তার অস্তিত্বের পূর্ব বলতে কিছু না থাকা অর্থাৎ যার অস্তিত্ব অনাদি। বাকা বলতে চিরন্তন অস্তিত্ব বুঝায়, যার কোন শেষ নাই। ওয়াহদানিয়্যাত বলতে, কোন দিক থেকেই শরীক, সমকক্ষতা কিংবা সাদৃশ্যতা না থাকা বুঝায়। মুখালাফাতুন লিল হাওয়াদিস্ হল, কোন ক্ষেত্রেই কোন সৃষ্টির সাথে কোন দিক থেকেই সামাঞ্জষ্য না থাকা বুঝায়। কিয়াম বি নাফসিহি হল, আত্মনির্ভরশীল অস্তিত্ব অর্থাৎ অস্তিত্বের স্থায়িত্বের জন্য কোন কিছুর মুখাপেক্ষী না হওয়া। এই ছয়টি সিফাতের কোনটিই কোন মাখলুকের মাঝে বিদ্যমান নয়। এই সিফাতগুলির কোন সৃষ্টির সাথে কোনরূপেই নূন্যতম সম্পৃক্ততা বা সংশ্লিষ্টতা নাই। কোনকোন আলেম, ওয়াহদানিয়্যাত ও মুখালাফাতুন লিল হাওয়াদিস্ এই দুইটি সিফাতকে এক মনে করেছেন। তাই তাদের হিসেবে **সিফাত-ই যাতিয়্যা পাঁচটি**।]

আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত যা কিছু আছে তার সবকিছুকে '**মা সিওয়া**' বা **আলম** বলা হয়। কেউকেউ একে '**তাবিয়াত**'ও বলে থাকে। জগতের সবগুলিই অস্তিত্বহীন ছিল। সবগুলিকেই আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। সবগুলি

---

[2] খালদি-ই বাগদাদী, ১২৪২ হজিরীতে (১৮২৬ খৃস্টাব্দে) শাম নগরীতে ইনতকিাল করছেনে।

জগতই মুমকিন ও হাদিস। অর্থাৎ, শূন্য থেকে অস্তিত্ব পেতে পারে, অস্তিত্ব হারিয়ে বিলীন হয়ে যেতে পারে এবং শূন্য থেকে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়েছে বুঝায়। '**যখন কিছুই ছিলনা তখনও আল্লাহ্ তা'আলা ছিলেন**' এই হাদিস শরীফটি এই বিষয়ে আমাদেরকে অবহিত করছে।

জগত যে হাদিস অর্থাৎ পরবর্তীতে সৃষ্টি করা হয়েছে তার আরেকটি দলিল হল, এই জগত প্রতিটি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হচ্ছে, ধ্বংস ও গঠন হচ্ছে। জগতের সবকিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে। কাদিম তথা অনাদি কোন কিছু অপরিবর্তনশীল হয়। কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলার জাতী [স্বীয় সত্ত্বা] ও সিফাতসমূহ কাদিম। এগুলি অপরিবর্তনশীল। [জগতে সর্বদাই ভৌত পরিবর্তনের মাধ্যমে বস্তুর অবস্থার রূপান্তর হচ্ছে আর রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বস্তুর অণুর গঠনের পরিবর্তন হয়। এই প্রক্রিয়ায় এক বা একাধিক পদার্থ পরিবর্তিত হয়ে সম্পূর্ন ভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট নতুন পদার্থে পরিণত হয়। পরবর্তীতে আবিষ্কৃত নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে বস্তু ও অণু পরমাণুও বিলীন হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।] জগতের এরূপ পরিবর্তনশীলতা, একের অপরের থেকে অস্তিত্ব অর্জন অনাদি হতে পারে না। অবশ্যই এর সূচনা আছে। শূন্য থেকে অস্তিত্ব পাওয়া প্রথম বস্তু বা উপাদান থেকে উৎপত্তি হওয়া আবশ্যক।

জগত যে মুমকিন অর্থাৎ শূন্য থেকে অস্তিত্বপ্রাপ্ত হয়েছে তার অপর একটি দলিল হল, জগতের হাদিস হওয়া। অর্থাৎ, সবকিছুরই অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্ব পাওয়া। [উজুদ শব্দের অর্থ অস্তিত্বপ্রাপ্ত হওয়া। তিন ধরণের উজুদ রয়েছে। প্রথমটি হল, **ওয়াজিবুল উজুদ**। অর্থাৎ, অস্তিত্বের বিদ্যমান থাকা আবশ্যক এমন উজুদ। যা সর্বদাই বিদ্যমান। যার কোন শুরু নাই, কোন শেষ নাই। যা অনাদি ও অনন্ত। কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ওয়াজিবুল উজুদ। দ্বিতীয়টি হল, **মুমতানিয়ুল উজুদ**। অর্থাৎ, যার অস্তিত্ব অসম্ভব। কোন অবস্থাতেই যার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সর্বদাই অস্তিত্বহীন। আল্লাহ্‌র

তা’আলার শরিক অনুরূপ। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা’আলার কোন অংশীদার বা তাঁর মত কোন কিছুর অস্তিত্ব অসম্ভব। তৃতীয় প্রকারের অস্তিত্ব হল **মুমকিনুল উজুদ**। অর্থাৎ, যা অস্তিত্বশীলও হতে পারে আবার অস্তিত্বহীনও হতে পারে। সমস্ত সৃষ্টি ও জগতসমূহ অনুরূপ। **উজুদে**র বিপরীত হল **আদম**। আদম অর্থ শূন্যতা। সৃষ্টিজগত তথা সবকিছুই অস্তিত্ব লাভের পূর্বে শূন্য ছিল। অর্থাৎ অস্তিত্বহীন ছিল।]

মওজুদ তথা অস্তিত্বশীল কিছু দুই ধরণের হয়। এর একটি **মুমকিন** আর দ্বিতীয়টি **ওয়াজিব**। যদি মওজুদ শুধুমাত্র মুমকিন হত আর ওয়াজিবুল উজুদ না হত তবে কোন কিছুই অস্তিত্বপ্রাপ্ত হত না। [কেননা, শূন্য থেকে অস্তিত্ব লাভ করা একধরণের পরিবর্তন, একটি ক্রিয়া। পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রানুযায়ী, যে কোন বস্তুতে কোন ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার জন্য, ঐ বস্তুতে বাইরের থেকে কোন শক্তি প্রয়োগ করতে হয় এবং ঐ শক্তির উৎসের অস্তিত্ব ঐ বস্তুর পূর্ব থেকেই বিদ্যমান থাকা আবশ্যক।] একারণে,

মুমকিন মওজুদ, আপনাআপনি অস্তিত্ব পেতে পারে না ও অস্তিত্বে অধিষ্ঠিতও থাকতে পারে না। কোন শক্তি যদি তাকে প্রভাবিত না করত তবে তা সর্বদা অস্তিত্বহীনই থাকত। কখনো অস্তিত্বশীল হত না। যা নিজেকেই অস্তিত্ব দিতে পারে না তা আবশ্যিকভাবেই অন্য কোন মুমকিনকে অস্তিত্ব দিতে পারে না, সৃষ্টি করতে পারে না। ওয়াজিবুল উজুদই কেবল মুমকিনকে সৃষ্টি করতে পারে। জগতের অস্তিত্ব, একে শূন্য থেকে অস্তিত্ব দানকারী এক স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রতি নির্দেশ করে। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে হাদিস ও মুমকিন নয় এমন একমাত্র উজুদ হল ‘ওয়াজিবুল উজুদ’ যিনি সর্বদাই বিদ্যমান ও সমস্ত মুমকিনের অস্তিত্বপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ। তিনি কাদিম অর্থাৎ যার কোন শুরু নাই, সর্বদাই অস্তিত্ববান। ওয়াজিবুল উজুদের অর্থ হল, যার অস্তিত্ব কোনভাবেই পরনির্ভরশীল নয় বরং আত্মনির্ভরশীল। অর্থাৎ আপনাআপনিই সর্বদা অস্তিত্ববান। যার অস্তিত্বের ক্ষেত্রে কারো নূন্যতম অবদান নাই। অস্তিত্বে

অধিষ্ঠিত থাকার জন্যও কোন কিছুর প্রতিই নূন্যতম মুখাপেক্ষী নন। এরূপ না হলে মুমকিন ও হাদিস হতে হবে, সেক্ষেত্রে অন্যের দ্বারা সৃষ্ট হতে হবে। যা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবতা বিবর্জিত। ফারসী ভাষার **খোদা** শব্দের অর্থও আপনাআপনিই অস্তিত্ববান তথা কাদিম অর্থাৎ, যার কোন শুরু নাই সর্বদাই বর্তমান। [এই কিতাবের প্রথম ভাগের, ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৭৪তম পৃষ্ঠায় আরো বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক সেখান থেকে পড়ুন।]

আমরা দেখতে পাই যে, সমগ্র জগতই আশ্চর্যজনক এক শৃঙ্খলা মেনে চলছে। প্রতি বছরই বিজ্ঞান এর নতুন নতুন দিক আবিষ্কার করছে। এই শৃঙ্খলা বা নিয়ম কানুনের যিনি স্রষ্টা তার মাঝে চিরঞ্জীব (**হাই**), পরম জ্ঞানী (**আলিম**), সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী (**কাদির**), ইরাদা পোষণকারী (**মুরীদ**), সর্বশ্রোতা (**সামি'**), সর্বদ্রষ্টা (**বাসীর**), বক্তা (**মুতাকাল্লিম**) ও সৃষ্টিকর্তার (**খালেক**) মত গুণাবলী থাকা আবশ্যক। কেননা, মরণশীল ও অজ্ঞ হওয়া, সীমিত ক্ষমতার অধিকারী হওয়া, অন্ধ, বধির ও বোবা হওয়া ইত্যাদির প্রতিটিই ত্রুটি ও ঘাটতি হিসেবে বিবেচিত। এই কায়নাত ও এই জগতকে এতটা নিখুঁতভাবে যিনি সৃষ্টি করেছেন, এতটা সুশৃঙ্খলভাবে যিনি পরিচালনা করছেন এবং বিলুপ্তি ও ধ্বংসের হাত থেকে যিনি রক্ষা করছেন তাঁর মাঝে এই ধরণের দোষত্রুটি থাকা অসম্ভব।

[অণু পরমাণু থেকে শুরু করে আকাশের নক্ষত্ররাজি পর্যন্ত প্রতিটি জিনিসই বিশেষ হিসাব ও বিশেষ কানুনের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, মহাকাশ বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানে যত সূত্র বা নিয়ম কানুন এখন পর্যন্ত আবিষ্কার করা হয়েছে তাদের মাঝের পারস্পরিক শৃঙ্খলা বিবেককে হতবাক করে দেয়। এমনকি ডারউইন পর্যন্ত এরূপ পর্যবেক্ষন করে বলেছে, চোখের গঠনের মাঝে যে নিখুঁত শৃঙ্খলা ও সূক্ষ্ম কাজ রয়েছে তা নিয়ে যতই গবেষণা করি ততই অবাক হই। বাতাসে আটাত্তর শতাংশ নাইট্রোজেন, একুশ শতাংশ অক্সিজেন ও একভাগ হাইড্রোজেন, কার্বন ডাইওক্সাইড ইত্যাদি গ্যাসের মিশ্রণ রয়েছে। এখন বাতাসে এই অক্সিজেনের পরিমাণ একুশ শতাংশের বেশি

হলে আমাদের ফুসফুসে দহন হত আবার একুশ শতাংশের চেয়ে কম হলে আমাদের রক্তে অবস্থিত খাদ্যকণাকে ভাঙ্গতে অক্ষম হত। এর মানে হল বাতাসে অক্সিজেনের এই পরিমাণের তারতম্য হলে মানুষ ও প্রাণীরা জীবন ধারণ করতে পারত না। আশ্চর্যের ব্যাপার হল বাতাসের এই অনুপাত ভূপৃষ্ঠের সর্বত্রই প্রায় অপরিবর্তনশীল। এটি আমাদের জন্য এক বড় নিয়ামত। এটি মহান আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, ক্ষমতা ও পরম দয়ার প্রতি নির্দেশ করে, তাই নয় কি? অনুরূপভাবে চক্ষু থেকে নক্ষত্র সবকিছুই তাঁর প্রতি নির্দেশ করে। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সকল সূত্র ও নিয়ম কানুন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কার্য প্রণালীর যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁর মাঝে কোন ধরণের ঘাটতি বা ত্রুটি থাকা সম্ভব কি?]

উপরিউক্ত সিফাতগুলি ব্যতীত অন্যান্য মহৎ গুনাবলীসমূহ সৃষ্টির মাঝেও দেখা যায়। এগুলিকে মহান আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টির মাঝে নিহিত করেছেন। এই সিফাতগুলি যদি আপন সত্ত্বায় বিদ্যমান না থাকত তবে মাখলুকের মাঝে কিভাবে তিনি সৃষ্টি করলেন? সৃষ্টির মাঝে বিদ্যমান উত্তম সিফাতসমুহ যদি স্রষ্টার মাঝে না থাকত তবে তো সৃষ্টিই তাঁর উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করত! যা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।

একারণেই আমরা বলি যে, জগতের স্রষ্টার মাঝে, সমস্ত উত্তম ও মহান সিফাতসমূহ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক একইভাবে সকল ধরণের ত্রুটি বিচ্যুতি ও মন্দ সিফাত থেকেও তাঁর মুক্ত থাকা জরুরী। কেননা ত্রুটিপূর্ণ কেউ খোদা বা সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না।

যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত এইসব দলিলতো আছেই, একইসাথে বহু আয়াতে করীমা ও হাদিস শরীফে আল্লাহ্ তা'আলার ঐ সব উত্তম সিফাতের প্রকৃত অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে স্পষ্টভাবে অবহিত করা হয়েছে। অতএব এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা জায়েজ নয়। সন্দেহ করলে তা কুফরের কারণ হবে। উপরে বর্নিত এই আটটি উত্তম সিফাতকে '**সিফাত-ই সুবুতিয়্যা**' বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সিফাত-ই সুবুতিয়্যা আটটি। সমস্ত কামাল

সিফাতের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তাঁর জাত ও সিফাতের মাঝে কোন ধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি, গোঁজামিল ও পরিবর্তনের অবকাশ নেই। '**সিফাত-ই জাতিয়্যা**' ও '**সিফাত-ই সুবুতিয়্যা**'কে একত্রে '**সিফাত-ই উলুহিয়্যা**' বলা হয়। কেউ যদি কোন সৃষ্টির মাঝে, এই সিফাত-ই উলুহিয়্যার বিদ্যমান থাকার বিষয়ে বিশ্বাস করে তবে সে **মুশরিকে** পরিণত হবে।

-৩-

ইসলামের শর্তসমূহ

সমস্ত জগতসমূহকে প্রতিটি মুহূর্তে অস্তিত্ব প্রদানকারী সত্ত্বা, যিনি নিজে প্রতিটি মুহূর্তে হাজির ও নাজির, যিনি সমস্ত মঙ্গল ও কল্যাণের উৎস এবং যাবতীয় নিয়ামত প্রদানকারী, সেই মহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য নিয়ে এখন আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় হাদিসটির ব্যাখ্যা শুরু করছি।

মুসলমানদের সাহসী ইমাম, আসহাবে কিরামের মাঝে অন্যতম শ্রেষ্ঠজন, সর্বদা সত্য বলার কারণে খ্যাতি অর্জনকারী, প্রিয় মুরুব্বি হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ননা করেছেন যে:

"ঐ দিন এমন একদিন ছিল, যখন আসহাবে কিরামদের থেকে আমরা কয়জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে তার খেদমতে উপস্থিত ছিলাম"। ঐ দিন ও ঐ মুহূর্ত এমন বরকতময় ও মহামূল্যবান ছিল যে, অনুরূপ আরেকটি মুহূর্ত পুনরায় উপভোগ করার সুযোগ পাওয়া অসম্ভব। ঐ দিন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সোহবতে, তাঁর সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকার কারণে নিজেরা সম্মানিত হয়েছিল। রূহের রসদ সরবরাহকারী, জানসমূহে স্বাদ ও প্রশান্তি প্রদানকারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক সৌন্দর্য অবলোকনের সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। এমন এক দিনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বুঝানোর জন্য বলেছেন যে, "ঐ দিন এমন এক দিন ছিল"। কেননা ঐ দিন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে মানবরূপে দেখার ও তাঁর আওয়াজ শুনার সৌভাগ্য হয়েছিল। মানুষের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় তথ্য অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট ভাবে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম ও প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক মুখ থেকে সরাসরি শ্রবণ করার সৌভাগ্য যে দিনে অর্জিত হয়েছে, এই দুনিয়ার জীবনে অনুরূপ আরেকটি মূল্যবান ও মর্যাদাবান মুহূর্তের সন্ধান পাওয়া সম্ভব কি?

"ঐ সময়ে, আমাদের নিকট এমন একজন আগমন করলেন যেন চাঁদের উদয় হল! তার পোশাক ধবধবে সাদা আর কেশ কুচকুকে কাল ছিল। তার মাঝে ধুলাবালি, ঘামের মত ভ্রমণের কোন আলামত বিদ্যমান ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী তথা আমাদের মধ্য থেকে কেউই তাকে চিনতে পারিনি। অর্থাৎ, তিনি আমাদের চিনা পরিচিত কেউ নন। এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বসলেন। তার হাঁটুকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাঁটু মুবারকের সংস্পর্শে রাখলেন"। আগত ব্যক্তি ছিলেন মহান ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল আলাইহি সালাম। মানুষের রূপে আবির্ভুত হয়েছিলেন। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের ঐভাবে বসাটা **আদবে**র বরখেলাপ বলে মনে হলেও আসলে ঐ অবস্থার দ্বারা আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে। এর দ্বারা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিল যে, দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য সংকোচিত হওয়া কিংবা অস্বস্থি বোধ করা উচিত নয়। একইভাবে, উস্তাদের মাঝেও গর্ব-অহংকার থাকা উচিত নয়। প্রত্যেকেরই ধর্মীয় বিষয়ে কিছু জানার ইচ্ছা হলে তা সাচ্ছন্দের সাথে ঐ বিষয়ের অবিজ্ঞ মুয়াল্লিমের নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়া উচিত। এ বিষয়ে লজ্জাবোধ করা উচিত নয়। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম উক্ত ঘটনার মাধ্যমে আসহাবে কিরামকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন। কেননা দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে কিংবা শিখানোর ক্ষেত্রে লজ্জিত হওয়া, সঙ্কোচ বোধ করা গ্রহণীয় নয়। মহান আল্লাহ্ তা'আলার হক্ক আদায়ের ক্ষেত্রে অস্বস্তিতে ভোগা নিন্দনীয়।

"ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তার হস্তদ্বয়কে হযরত রাসূল-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক হাঁটুর উপরে রাখলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, **ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে ইসলামিয়্যাত ও মুসলমানিত্ব সম্পর্কে বলুন**"।

ইসলাম শব্দের শাব্দিক অর্থ, অবনত মস্তকে আত্ম সমর্পন করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম কালিমাটিকে, ইসলামিয়্যাতের মূল পাঁচটি স্তম্ভের সামগ্রিক নাম হিসেবে নিম্নরূপে বর্ননা করেছেন।

রাসূল-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে:

১. ইসলামের শর্তসমূহের প্রথমটি হল, "**কালিমা-ই শাহাদাত পাঠ করা**"। কালিমা-ই শাহাদাত পাঠ করা বলতে, '**আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু**' বলাকে বুঝায়। অর্থাৎ, **কথা বলতে সক্ষম এমন প্রত্যেক আকেল ও বালেগ ব্যক্তির, এই কথা ক্বালবের দ্বারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে মুখে স্বীকার করা যে, তিনি ব্যতীত আসমান ও জমিনে ইবাদত পাওয়ার হক্বদার বা উপাসনার যোগ্য কেউ নাই, কোন কিছু নাই। শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলাই প্রকৃত মাবূদ বা উপাস্য**। তিনি ওয়াজিবুল উজুদ। তিনিই সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের অধিকারী। সকল ধরণের ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে তিনি পাক ও পবিত্র। তাঁর নাম হল **আল্লাহ্**। একইভাবে মনে প্রাণে এই সাক্ষ্য দেয়া যে, হাশেমী গোত্রের **হযরত আবদুল্লাহ পুত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামের সেই সুমহান ব্যক্তিত্ব, মহান আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা ও রাসূল বা পয়গম্বর**। যিনি ছিলেন গোলাপের মত কোমল, শুভ্র ও রক্তিমের মাঝামঝি উজ্জ্বল বর্ণের, মায়াবী চেহারার অধিকারী, যার ছিল কাল ভ্রূ ও কালো চক্ষু, প্রশস্ত কপাল, যিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী, যার ছায়া মাটিতে পড়ত না, যিনি ছিলেন মৃদু ও মিষ্টভাষী, আরবে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বিধায় তাকে আরব বলা হত। ওহাব'এর কন্যা হযরত আমেনা তাঁর মাতা ছিলেন। তিনি [৫৭১ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসের ২০ তারিখ রোজ সোমবার ফজরের সময়] পবিত্র মক্কা নগরীতে দুনিয়ায় আগমন করেছিলেন। চল্লিশ বছর বয়সের সময় হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম মারফৎ তাঁকে তাঁর নবুয়্যত প্রাপ্তির ব্যাপারে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। এই বছরকে একারণে **'বি'সাত'**এর বছর বলা হয়। এরপরে তের বছর পবিত্র মক্কা নগরীতে নিরলসভাবে মানুষদের নিকট ইসলাম দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। তারপর মহান আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে সেখান থেকে পবিত্র মদিনা নগরীতে হিজরত করেন। এখান থেকেই ইসলাম, জগতের চতুর্দিকে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। হিজরতের দশ বছর পরে অর্থাৎ ৬৩২ খৃস্টাব্দের জুন মাসে, হিজরী রবিউল আউয়াল মাসের

বার তারিখ রোজ সোমবারে পবিত্র মদিনা নগরীতে ইনতিকাল করেন। [ইতিহাসবেত্তাদের মতে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মক্কা-ই মুকাররমা থেকে মদিনা-ই মুনাওয়ারাতে হিজরতের সময়, ৬২২ খৃস্টাব্দে, সফর মাসের সাতাশ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যার নিকটবর্তী সময়ে 'সাওর' পর্বতের একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখান থেকে সোমবার রাতে বের হয়েছিলেন। খৃস্টীয় পঞ্জিকার হিসাব অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসের বিশ তারিখে, রূমী পঞ্জিকার হিসাব অনুযায়ী সেপ্টেম্বরের সাত তারিখে আর হিজরী পঞ্জিকা অনুযায়ী রবিউল আউয়াল মাসের আট তারিখ রোজ সোমবার পবিত্র মদিনা নগরীর 'কুবা' নামক গ্রামে উপস্থিত হন। এই আনন্দের দিবসটি মুসলমানদের '**হিজরী শামছী**' বছরের সূচনালগ্ন হিসেবে গৃহীত হয়েছে। শিয়াদের হিজরী শামছি বছরের সূচনা এর ছয় মাস পূর্বে। অর্থাৎ, অগ্নিপূজারি মাজুসী কাফিরদের নওরোজ উৎসব হিসেবে পালিত মার্চ মাসের বিশ তারিখকে বছরের প্রথম দিন হিসেবে গণ্য করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সপ্তাহের বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কুবায় রাত্রিযাপন করেছিলেন। বছরের ঐ দিন রাত ও দিন সমান হয়। পরেরদিন অর্থাৎ জুমার দিনে কুবা ত্যাগ করে পবিত্র মদিনায় উপনীত হয়েছিলেন। ঐ বছরের পয়লা মুহাররমকে **হিজরী কামারী** বর্ষপঞ্জিকার প্রথম দিন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। যা ঐ বছরের খৃস্টীয় বর্ষপঞ্জিকা অনুযায়ী জুলাই মাসের ষোল তারিখ রোজ শুক্রবার ছিল। একারণে যে কোন খৃস্টীয় পঞ্জিকা থেকে এই হিজরী সামছী পঞ্জিকা ৬২২ বছর কম হয়। একইভাবে হিজরী শামছী পঞ্জিকা থেকে খৃস্টীয় পঞ্জিকা ৬২১ বছর বেশি হয়।]

২. ইসলামের পাঁচটি শর্তের দ্বিতীয়টি হল, যাবতীয় শর্ত ও রুকন মেনে প্রতিদিন পাঁচবার "**ওয়াক্তমত নামাজ আদায় করা**"। প্রত্যেক মুসলমানের উপরই প্রতিদিন ওয়াক্ত অনুযায়ী পাঁচবার নামাজ আদায় করা এবং নামাজগুলি যে ওয়াক্তমত আদায় করেছে তা জানা ফরজ। জাহিল ও মাজহাববিরোধীদের প্রস্তুতকৃত ভ্রান্ত সময় পঞ্জিকার অনুসরণ করে, ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই নামাজ আদায় করলে তা সহীহ হয় না, একইসাথে গুনাহ হয়। ঐ সময়সূচী অনুসরণ করার ফলে, যোহরের ফরজের পূর্বের চার রাকাত সুন্নত ও মাগরিবের ফরজ

নামাজকে ‘কারাহাত ওয়াক্তে’ আদায় করা হয়।কাহারাতের সমএর ব্যাখ্যা করা হয়েছে **অশেষ রহমত** কিতাবের চতুর্থ অধ্যায়ে এবং **মিফতাহুল জান্নাহ** কিতাবের শুরুর পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে। [মুয়াজ্জিনের দেয়া আযানের দ্বারা বুঝা যায় যে নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়েছে। তবে মাইকের দ্বারা আহলি বিদায়াতের দেয়া যান্ত্রিক আওয়াজকে ‘**আযান-ই মুহাম্মদী**’ বলা যায় না।] সমস্ত ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতকে বিশেষ সতর্কতার সাথে পালন করে, আল্লাহ্ তা’আলার প্রতি হৃদয় ও মনকে পুরোপুরি সঁপে দিয়ে ওয়াক্তের সমাপ্তির পূর্বেই নামাজসমূহ আদায় করা উচিত। পবিত্র কুরআন করীমে নামাজকে **সালাত** বলা হয়েছে। সালাতের অর্থ হল, মানুষের ক্ষেত্রে দোয়া করা, ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে ইসতিগফার করা এবং আল্লাহ্ তা’আলার ক্ষেত্রে হলে দয়া করা, রহমত করা হয়। ইসলামিয়্যাতের পরিভাষায় **সালাত** বলতে, ফিকাহ্’এর কিতাবসমূহে যেভাবে বর্নিত হয়েছে ঠিক সেভাবে নির্দিষ্ট অঙ্গভঙ্গি করা ও সুনির্দিষ্ট কিছু জিনিস পাঠ করাকে বুঝায়। ‘**ইফতিতাহ তাকবীর**’এর মাধ্যমে নামাজ পড়া শুরু করা হয়। অর্থাৎ, **আল্লাহু আকবর** বলে পুরুষদের ক্ষেত্রে দুইহাত কান পর্যন্ত তুলে নাভির উপরে হাত বাঁধা আর নারীদের ক্ষেত্রে কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলে বুকের উপরে হাত বাঁধার মাধ্যমে নামাজ শুরু করা হয়। আর শেষ বৈঠকে, মাথাকে প্রথমে ডান কাঁধে ও পরে বাম কাঁধের দিকে ফিরিয়ে সালাম দিয়ে নামাজ শেষ করা হয়।

৩. ইসলামের পাঁচটি শর্তের তৃতীয়টি হল, “**সম্পদের যাকাত প্রদান করা**”। যাকাতের শাব্দিক অর্থ হল পরিষ্কার করা, সংশোধন করা, পরিশুদ্ধ করা, প্রশংসা করা, সুন্দর ও উত্তম হওয়া। ইসলামের পরিভাষায়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও **নিসাব** হিসেবে বিবেচিত নির্দিষ্ট পরিমাণ **যাকাত মালে**র মালিক ব্যক্তির তা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ আলাদা করে, পবিত্র কুরআন মজিদে বর্নিত মুসলমানদেরকে বিনীতভাবে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়। সাত শ্রেণীর মানুষকে যাকাত প্রদান করা যায়। চার মাজহাবেই, চার ধরণের সম্পদের জন্য যাকাতের বিধান রয়েছে। এগুলি হল: স্বর্ন ও রৌপ্যের যাকাত, ব্যবসায়িক মালের যাকাত, বছরের অর্ধেকেরও বেশি সময় তৃণভূমিতে বিচরণ করে পালিত

হওয়া হালাল পশুর যাকাত এবং মাটিতে উৎপাদিত ফসলের যাকাত। চতুর্থ প্রকারের যাকাতকে '**উশর্**' বলা হয়। জমি থেকে ফসল সংগ্রহের সাথে সাথেই উশর্ প্রদান করতে হয়। অন্য তিন ধরণের সম্পদের ক্ষেত্রে, নিসাবের সমান বা অধিক হওয়ার পর এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত দিতে হয়।

৪. ইসলামের পাঁচটি শর্তের চতুর্থটি হল, "**পবিত্র রমজান মাসের প্রত্যেকদিন রোজা রাখা**"। রোজা রাখাকে আরবীতে '**সাওম**' বলা হয়। সাওমের আভিধানিক অর্থ হল, এক জিনিসকে অপর জিনিস থেকে রক্ষা করা। ইসলামের পরিভাষায় সাওম বলতে, যথাযথ শর্ত মেনে পবিত্র রমজান মাসে, আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন এজন্যে প্রত্যেকদিন তিনটি বিষয় থেকে নিজেকে রক্ষা করা বা সংবরণ করা বুঝায়। এই তিনটি বিষয় হল: পান করা, আহার করা ও যৌন ক্রিয়া করা। রমজান মাস, আকাশে হেলাল [নতুন চাঁদ] দেখার মাধ্যমে শুরু হয়। আগে থেকে হিসাব করা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী শুরু হয় না।

৫. ইসলামের পাঁচটি শর্তের পঞ্চমটি হল, "**যার সামর্থ্য আছে তার জন্য জীবনে একবার হজ্জ পালন করা**"। যার মক্কা-ই মুকাররমায় যাওয়ার মত পাথেয়, শারীরিক সুস্থতা ও পথের নিরাপত্তা আছে এবং সেখানে গিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত যাদের ভরণ পোষণের দ্বায়িত্ব তার উপর রয়েছে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ-সম্পদের ব্যবস্থা করতে পারে, তার উপর জীবনে একবার কা'বা শরীফ তওয়াফ করা ও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা ফরজ।

আগত ব্যক্তি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উপরোক্ত জবাব শোনার পরে বললেন যে, "**ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি যথার্থই বলেছেন**"। সম্মানিত সাহাবীদের মধ্য থেকে সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা, তাঁর এই আচরণে অবাক হয়ে ছিলেন, হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এরূপ খবর দিয়েছেন। কেননা তিনিই প্রশ্ন করেছেন, আবার প্রদত্ত জবাবের সঠিক হওয়ার ব্যাপারে তিনিই সত্যায়ন করেছেন। কোন কিছুর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার অর্থ হল, অজানা বিষয়কে জানার ইচ্ছা পোষণ করা।

আপনি ঠিক বলেছেন, এই কথাটির দ্বারা জিজ্ঞাসাকারী যে বিষয়টি জানতেন তাই প্রতীয়মান হয়।

উপরে বর্নিত ইসলামের পাঁচটি শর্তের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল, '**কালিমা-ই শাহাদাত**' বলা ও এর অর্থকে বিশ্বাস করা। এর পরের স্থান হল, নামাজ আদায় করা। তারপর রোজা রাখা ও হজ্জব্রত পালন করা। সর্বশেষটি হল, যাকাত প্রদান করা। 'কালিমা-ই শাহাদাত'এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত পোষণ করেছেন। অবশিষ্ট চারটির গুরুত্বের ক্রমধারা, অধিকাংশ আলেমের মতে উপরে প্রদত্ত ক্রমের অনুরূপ। কালিমা-ই শাহাদাত, ইসলামের শুরুতেই ফরজ হয়েছে। এই বিবেচনায় এটিই সর্বপ্রথম ফরজ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, নবুয়্যত প্রাপ্তির দ্বাদশ বছরে ও হিজরতের বছর খানেক পূর্বে মিরাজের রজনীতে ফরজ হয়েছে। পবিত্র রমজান মাসের রোজা হিজরতের দ্বিতীয় বছরের শা'বান মাসে ফরজ হয়েছে। যাকাত প্রদান করা, যে বছর রমজান মাসের রোজা ফরজ হয়েছে সেই বছরের রমজান মাসেই ফরজ হয়েছে। আর হজ্জ হিজরতের নবম বছরে ফরজ হয়েছে।

কোন ব্যক্তি যদি, ইসলামের এই পাঁচ শর্তের কোন একটিকে অস্বীকার করে অর্থাৎ ফরজ হিসেবে মেনে না নেয়, অবিশ্বাস করে অথবা অমর্যাদা করে, তাচ্ছিল্য করে তবে নাউজুবিল্লাহ্ সে কাফির হয়ে যাবে। একইভাবে অন্যসব কিছুর ক্ষেত্রেও যেগুলির হালাল কিংবা হারাম হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে অবহিত করা হয়েছে, তার কোন একটিকে মেনে না নিলে অর্থাৎ কোন হালালকে হারাম কিংবা হারামকে হালাল হিসেবে বিবেচনা করলেও ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। দ্বীনের আবশ্যকীয় ইলম অর্থাৎ যা জানা সকলের জন্যই ফরজ এবং যা সম্পর্কে মুসলিম রাজ্যে বসবাসকারী সকলেই অবগত এমনকি জাহিলরা পর্যন্ত যেসব বিষয়ে শুনেছে, জেনেছে এমন দ্বীনী ইলমের কোন একটিকে অস্বীকার করলে, অপছন্দ করলেও ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হবে।

[উদাহরণস্বরূপ: শুকরের গোশত খাওয়া, মদ পান করা, জুয়া খেলা, নারীদের জন্য দেহ, চুল, হাত-পা উম্মুক্ত রেখে ও পুরুষের জন্য নাভি থেকে

হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান অনাবৃত করে অন্যকে প্রদর্শন করানো হারাম। এগুলি মহান আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ও নিষেধসমূহের ব্যাপারে আমাদেরকে অবহিত করেছে এমন চারটি হক্ব মাজহাবে, পুরুষের সতরের ব্যাপারে অর্থাৎ অন্যের দেহের যেসব স্থান দেখা ও নিজের দেহের যেসব স্থান অন্যকে দেখানো হারাম করা হয়েছে সেসব স্থানের ব্যাপারে ভিন্ন মত দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিত নিজ মাজহাবের মত অনুযায়ী সতর ঢাকা, এটি সকলের উপরই ফরজ। কারো যদি এসব স্থান উম্মুক্ত থাকে, তবে সেদিকে দৃষ্টি দেয়া অন্যদের জন্য হারাম হয়। '**কিমিয়া-ই সা'আদাত**' নামক কিতাবে বলা হয়েছে যে, মেয়েদের ও নারীদের মাথা, চুল, হাত-পা ইত্যাদি খোলা রেখে রাস্তায় চলাফেরা করা যেমন হারাম, একইভাবে পাতলা বা আঁটসাঁট পোশাক পরিধান করে, সেঁজেগুজে সুগন্ধি মেখে বাইরে বের হওয়াও হারাম। তাদের এইভাবে বাইরে চলাচলের ব্যাপারে যারা অনুমতি কিংবা সম্মতি দিল ও পছন্দ করল সেইসব মা, বাবা, স্বামী ও ভাইও তাদের দ্বারা কৃত গুনাহের ভাগীদার হবে ও একই আযাব ভোগ করবে। অর্থাৎ, একইসাথে জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে। তবে তওবা করলে হয়ত ক্ষমা প্রাপ্ত হবে, জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পাবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তওবাকারীদের পছন্দ করেন। আকিল ও বালিগ মেয়েদের ও নারীদের উপর, পরপুরুষদের থেকে নিজেদের পর্দা করার ব্যাপারে হিজরতের তৃতীয় বছরে আদেশ দেয়া হয়েছে। ইংরেজ গুপ্তচরদের ও তাদের ফাঁদে পা দেয়া জাহিলদের কথায় বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। তারা হিজাবের আয়াত অবতীর্ন হওয়ার পূর্বের বেপর্দার চলাফেরাকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করে বলে যে, পর্দার বিষয়টি পরবর্তীকালের ফাকিহ্দের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে।

নিজেকে মুসলমান দাবী করে এমন প্রত্যেকেরই, নিজের কাজকর্ম, চালচলন ইত্যাদি ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী হচ্ছে কি না সে ব্যাপারে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। না জানা থাকলে, কোন আহলি সুন্নাতের অনুসারী আলেমকে জিজ্ঞাসা করে অথবা ঐ আলেমদের রচিত কিতাবসমূহ পড়ে শিখে নেয়া জরুরী। কৃত কর্ম যদি শরীয়ত অনুযায়ী না হয়, তবে গুনাহ ও আযাব

থেকে মুক্তি পাবে না। এজন্য সকলেরই উচিত প্রতিদিন আন্তরিকতার সাথে তওবা করা। তওবা করলে অবশ্যই গুনাহ ও কুফুরী আচরণ মাফ করে দেয়া হবে। তওবা না করলে, দুনিয়া ও জাহান্নাম সর্বত্রই পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই আযাবের ব্যাপারে, আমাদের কিতাবের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। দোয়া করে **অশেষ রহমত** কিতাবের ষষ্ঠ অধ্যায় দেখুন। মুসলমান যদি কবীরা গুনাহ করে তবে ঐ গুনাহ অনুযায়ী আযাব ভোগের পরে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। আর যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে অবিশ্বাস করে ও ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত ঐসব কাফির ও খোদাদ্রোহীরা জাহান্নামের আগুনে চিরকাল জ্বলতে থাকবে।

পুরুষ ও নারীদের নামাজে ও নামাজের বাইরে সবসময় শরীরের যেসব স্থান ঢেকে রাখতে হয় সেসব স্থানকে সতর বা **আওরাত** বলা হয়। সতরের স্থানকে উম্মুক্ত রাখা ও অন্যের সতরের স্থানের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হারাম। যারা বলে, ইসলামে সতর বলে কিছু নাই তারা কাফির হয়ে যায়। ইজমা'র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ চার মাজহাব অনুযায়ীই যেসব স্থান সতর হিসেবে বিবেচিত সেসব স্থানকে উম্মুক্ত রাখা ও অন্যের সতরের স্থানের প্রতি দৃষ্টি দেয়াকে যারা হালাল বলে এবং এব্যাপারে অবহেলা করে অর্থাৎ এর আযাবের ভয়ে ভীত না হয় তারাও কাফিরে পরিণত হয়। নারীদের জন্য নিজের দেহকে উম্মুক্ত করা ও পুরুষদের সামনে গান পরিবেশন করা, এমনকি হামদ-নাত গাওয়া ইত্যাদি হারাম। পুরুষদের হাঁটু ও রান হাম্বলী মাজহাব অনুযায়ী সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়।

নিজেকে মুসলমান দাবী করে এমন ব্যক্তির জন্য, ঈমান ও ইসলামের শর্তসমূহ এবং চার মাজহাবের ইজমা হয়েছে অর্থাৎ ঐক্যমত পোষণ করা হয়েছে এমন ফরজ ও হারামের বিষয়কে যথাযথভাবে জানা ও গুরুত্ব সহকারে মানা আবশ্যক। না জেনে থাকাটা কোন বাহানা হিসেবে গৃহীত হবে না। একইভাবে জানল কিন্তু মানল না, তাও গ্রহণযোগ্য হবে না। নারীদের জন্য মুখমণ্ডল, হাত ও পায়ের তালু ব্যতীত পুরো শরীর, চার মাজহাব অনুযায়ীই সতরের অন্তর্ভুক্ত।

যে সব স্থানের ব্যাপারে ইজমা হয়নি, অর্থাৎ চার মাজহাবের কোনটির মতে সতরের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোন স্থানকে অবহেলা করে অন্যের সামনে প্রকাশ করলে ব্যক্তি কাফির না হলেও, নিজ মাজহাব অনুযায়ী তা সতরের অন্তর্ভুক্ত হলে কবীরা গুনাহ সম্পাদনকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। পুরুষের জন্য হাঁটুর উপরের রান উম্মুক্ত রাখার হুকুম এরূপ। শরীয়তের এরূপ আবশ্যকীয় বিষয় না জানা থাকলে, দ্রুত শিখাটাও ফরজ। শিখার সাথে সাথে তওবা করতে হবে ও সতর মেনে চলতে হবে।

মিথ্যা বলা, চোগলখোরী করা, গীবত করা, অপবাদ দেয়া, চুরি করা, ভেজাল দেয়া, খেয়ানত করা, হৃদয় ভাঙ্গা, ফিতনার উদ্রেক করা, বিনা অনুমতিতে অপরের সম্পদ ব্যবহার করা, শ্রমিকের কিংবা সেবা গ্রহণ করে তার বিনিময় প্রদান না করা, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অর্থাৎ আইন-কানুন অমান্য করা, রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান না মানা, কর বা শুল্ক প্রদান না করা গুনাহের কাজ। এসব কাজ কাফিরদের সাথেও করা যাবে না, কাফির রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও করা যাবে না, এরূপ করা হারাম। জাহিলরা জানে না ও দ্বীনের অতি জরুরী নয় এমন বিষয় না জানাটা কুফরের কারণ নয়, তবে 'ফিসক্' তথা গুনাহের কাজ।]

-৪-

ঈমানের শর্তসমূহ

"ঐ ব্যক্তি আরো জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! **ঈমান কি? এ সম্পর্কে আমাকে বলুন**"। ইসলাম কি? এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার ও জবাব পাওয়ার পর হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আমাদের প্রিয় রাসূল-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ঈমানের হাক্বীকত, এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। ঈমানের শাব্দিক অর্থ হল, কাউকে পূর্ণ সত্যবাদী হিসেবে জানা, বিশ্বাস করা। ইসলামের পরিভাষায়, রাসূল-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত সত্য পয়গম্বর হিসেবে, তাঁর নির্বাচিত সত্য নবী বা খবর প্রদানকারী হিসেবে জানা ও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে মুখে স্বীকার করা, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদেরকে সংক্ষেপে যা জানিয়েছেন তা সংক্ষেপে বিশ্বাস করা আর বিস্তারিত ও গভীরভাবে যা জানিয়েছেন তা অনুরূপভাবে বিশ্বাস করা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী মুখে 'কালিমা-ই শাহাদাত' বলাকে ঈমান বলা হয়। আগুন যে পুঁড়ায় আর বিষাক্ত সাপের ছোবলে যে মারা যেতে হয় তা যতটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আগুন ও সাপ থেকে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়, ঠিক একইভাবে মনে প্রাণে পূর্ণরূপে মহান আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর মহান সিফাতসমূহের বড়ত্বকে উপলব্ধিসহ বিশ্বাস করে, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ও সৌন্দর্যের সান্নিধ্য পাওয়ার আশায় পুণ্যের দিকে তীব্রতার সাথে ধাবিত হওয়া আর তাঁর গজব ও আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে পাপ থেকে প্রাণপণ পলায়নের চেষ্টা করা হল শক্তিশালী ঈমানের পরিচায়ক। মর্মর পাথরে যেমন খোদাই করে যেমন লেখা হয় তেমনিভাবে হৃদয়ে ঈমানকে প্রতিস্থাপন করা জরুরী।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে যে ঈমান ও ইসলাম শিক্ষা দিয়েছেন তা একই। দুইটিতেই 'কালিমা-ই শাহাদাত'এর মর্মার্থকে বিশ্বাস করা আবশ্যক। 'উমুম' ও 'খুসুস' এর বিবেচনায় এদের মাঝে

কিছু পার্থক্য থাকলেও ইসলামিয়্যাতের মাঝে কোন ভিন্নতা নাই। যদিও এদের অভিধানিক অর্থ ভিন্ন।

ঈমান কি একক কিছু? নাকি কয়েকটি অংশের সমষ্টি? যদি সমষ্টি হয়ে থাকে তবে এর কয়টি ভাগ রয়েছে? আমল ও ইবাদতসমূহ কি ঈমানের অংশ? নাকি এর বাইরের কিছু? 'আমার ঈমান আছে' এই কথাটি বলার সময় ইনশাআল্লাহ্ বলা জায়েজ নাকি জায়েজ নয়? ঈমানের ক্ষেত্রে অল্প বেশি বলা যায় কি? ঈমান কি মাখলুক? ঈমান গ্রহণের ক্ষমতা মানুষের আছে কি? মুমিনরা কি বাধ্য হয়ে ঈমান গ্রহণ করেছে? ঈমান গ্রহণের ক্ষেত্রে জবরদস্তি আছে কি? যদি থেকে থাকে তবে কেন ঈমান গ্রহণের জন্য আলাদাভাবে প্রত্যেককে আদেশ দেয়া হয়েছে? এইসব প্রশ্নের আলাদা আলাদা জবাব প্রদানের জন্য বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। একারণে এখানে প্রত্যেকটি প্রশ্নের আলাদ আলাদা জবাব দিচ্ছি না। তবে এখানে এতটুকু জানা দরকার যে, 'আশয়ারী' ও 'মুতাজিলা' মাজহাব অনুযায়ী, মুমকিন নয় এমন কোন কিছু করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ দেয়া জায়েজ নয়। এমনকি কোন কিছু মুমকিন হওয়ার পরও যদি মানুষের সাধ্যাতীত হয়, 'মুতাজিলা'দের মতে তাও জায়েজ হবে না। আশয়ারী মাজহাব অনুযায়ী, তা জায়েজ হলেও বাস্তবে এমন কোন আদেশ আল্লাহ্ তা'আলা দেননি। যেমন, মানুষকে শূন্যে ভাসার মত কোন আদেশ দেয়া হয়নি। ঈমান, ইবাদত ও আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার নিকট এমন কিছু চাননি যা তাদের সামর্থ্যের বাইরে। একারণেই মুসলমান কেউ ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় কিংবা পাগল বা অজ্ঞান অবস্থায় ঈমানের তাসদীক্ না করা সত্ত্বেও তার মুসলমানিত্ব অটুট থাকে।

এই হাদিস শরীফে যে ঈমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা এর আভিধানিক অর্থে বিবেচনা করা উচিত নয়। কেননা, ঈমানের শাব্দিক অর্থ হল: সত্য হিসেবে মেনে নেয়া, বিশ্বাস করা। ঐ সময়ের আরব জাহিলদের মাঝে এর অর্থ জানে না এমন কেউ ছিল না। আর সম্মানিত সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আলাইহিম আজমাইন্‌তো এর শাব্দিক অর্থ জেনেই থাকবেন। অথচ হযরত জিব্‌রাঈল আলিহিস্ সালাম, আসহাবে কিরামকে ঈমানের প্রকৃত অর্থ শিখাতে

চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঈমানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কাশফ্ অথবা বিবেকের দ্বারা কিংবা দলিলের উপর ভিত্তি করে আকলের দ্বারা নির্ধারিত, নির্দিষ্ট ও পছন্দনীয় একটি কথাকে বুঝে, বিশ্বাস করে মেনে নিয়ে এর দ্বারা নির্দিষ্ট ছয়টি বিষয়কে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে মুখে স্বীকার করাকে **ঈমান** বলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নির্দিষ্ট ছয়টি মৌলিক বিষয়কে একত্রে বিশ্বাস করাকে ঈমান হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এগুলি হল:

১. এই ছয়টি বিষয়ের প্রথমটি হল, **আল্লাহ্ তা'আলাকে একমাত্র ওয়াজিবুল উজুদ ও প্রকৃত মাবূদ এবং সমগ্র জগত ও এর মাঝে যা কিছু আছে সবকিছুর একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করা**। দুনিয়া ও আখিরাতে যা কিছু আছে তার সবকিছুই বস্তুহীন, সময়হীন ও নমুনাহীন অবস্থায় শূন্য থেকে অস্তিত্ব প্রদানকারী শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা, এ ব্যাপারে সুদৃঢভাবে বিশ্বাস করা। [তিনিই সকল বস্তুকে, অণু, পরমাণু, উপাদান, এককোষী, বহুকোষী, জড়, জীব, জীবন, মৃত্যু, সকল ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, সকল ধরণের শক্তি, ক্ষমতা, কানুন, গতিবিধি, রূহ, ফেরেশতা সহ যাবতীয় অস্তিত্বশীলকে শূন্য থেকে অস্তিত্ব দিয়েছেন এবং প্রদত্ত অস্তিত্বে টিকিয়ে রেখেছেন।] জগতের সবকিছুকে [শূন্য থেকে এক মুহূর্তে] যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, একইভাবে [প্রতিটি মুহূর্তে একটিকে অপরটি থেকেও অস্তিত্ব দিচ্ছেন, যখন কিয়ামতের সময় হবে তখনও এক মুহূর্তে সবকিছুকে] পুনরায় বিলুপ্ত করবেন। তিনিই সবকিছুর প্রকৃত স্রষ্টা, অধিপতি, খালিক, মালিক, হাকিম। তাঁর কোন হাকিম, আমীর নাই। তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিংবা তাঁর সমকক্ষও কেউ নাই। যাবতীয় শ্রেষ্ঠত্ব, মহৎ ও পরিপূর্ণ গুণাবলী শুধুমাত্র তাঁরই উপযুক্ত। তাঁর মাঝে কোন ধরণের ভুলত্রুটি, বিচ্যুতি বা অপরিপূর্ণ সিফাত নাই। যা ইরাদা করেন তাই করতে পারেন। কোন কিছু পাওয়ার আশায় কিংবা নিজের উপকারের জন্য কিছু করেন না। তথাপি তাঁর প্রতিটি কাজে হিকমত, ফায়দা, দয়া ও অনুগ্রহ নিহিত রয়েছে।

বান্দাদের মধ্য থেকে যারা উত্তম তাদেরকে পুরস্কৃত করতে, সওয়াব প্রদান করতে তিনি বাধ্য নন। একইভাবে মন্দদের আযাব দিতেও তিনি বাধ্য

নন। অবাধ্যদের, পাপ কর্ম সম্পাদনকারীদের সবাইকে জান্নাতে স্থানে দিলে, তাও তাঁর সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহের প্রকাশ হিসেব যথাযথ হবে। আবার অনুগত ও ইবাদতকারীদের সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলে, তাও তাঁর আদালতের প্রকাশ হিসেবে যথাযথ হবে। কিন্তু তিনি মুসলমানদেরকে, তাঁর ইবাদতকারীদেরকে জান্নাতে স্থান দিবেন এবং সীমাহীন নিয়ামত ও অনুগ্রহ প্রদান করবেন। আর কাফিরদেরকে অনন্ত আযাব ভোগের জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তিনি এরূপ ইরাদা করেছেন ও আমাদেরকে অবহিত করেছেন। তিনি কোনোভাবেই তাঁর প্রতিশ্রুতির ভঙ্গকারী হন না।

সমস্ত সৃষ্টি ঈমান গ্রহণ করলে, তাঁর আনুগত্য করলে তা তাঁর কোন উপকারে আসে না। একইভাবে সমগ্র জগত কুফুরী করলে, অবাধ্য হলে তাও তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারে না। বান্দা কিছু করতে চাইলে তা যদি তিনিও ইরাদা করেন তবেই তা সৃষ্টি করেন। বান্দার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি জিনিস তিনিই সৃষ্টি করেন। তিনি না চাইলে কোন কিছুই হয় না। তিনি ইরাদা না করলে কেউ কাফির হতে পারে না, কেউ অবাধ্য হতে পারে না। কুফর না গুনাহের ব্যাপারে তাঁর ইরাদা থাকলেও তিনি তাতে রাজী নন। তাঁর কাজে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কেন এরূপ করলেন? ঐভাবে কেন করলেন না? এ ধরণের প্রশ্ন করার কিংবা কৈফিয়ত চাওয়ার অধিকার বা সাধ্য কারো নাই। শিরক ও কুফর ব্যতীত যেকোন কবীরা গুনাহ করে তওবাহীন অবস্থায় কেউ মারা গেলে, চাইলে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন। আবার একটি সগীরা গুনাহের জন্যও চাইলে কাউকে আযাব দিতে পারেন। কিন্তু কাফির ও মুরতাদ হয়ে মৃত্যুবরণকারীদের তিনি কখনোই ক্ষমা করবেন না, তাদেরকে অনন্তকাল আযাব প্রদানের বিষয়ে সবাইকে অবহিত করেছেন।

মুসলমান অর্থাৎ **আহলি কিবলা** ও ইবাদতকারী হওয়ার পরও যারা **আহলি সুন্নাতের** ইতিক্বাদের অনুসারী না এবং তওবা না করেই ঐ অবস্থায় মারা যায়, ঐসব **আহলি বিদাআত** মুসলমানরা জাহান্নামের আযাব ভোগ করলেও তাদের এ শাস্তি চিরকালীন হবে না।

আল্লাহ্ তা’আলাকে দুনিয়াতে শারীরিক চক্ষু দিয়ে দেখা জায়েজ। কিন্তু কেউ দেখতে পায়নি। কিয়ামতের দিবসে হাশরের ময়দানে কাফির ও গুনাহগার মুমিনদের প্রতি কাহর্ ও জালাল্ রূপে আর সৎকর্মশীল মুমিনদের প্রতি লুত্ফ ও জামাল রূপে দেখা দিবেন। মুমিনগণ জান্নাতে তাঁর জামাল সিফাতের প্রকাশ দেখতে পাবেন। কাফিররা তাঁর এই রূপ দেখা থেকে বঞ্চিত হবে। জিনরাও দেখা থেকে মাহরুম হবে বলে শক্তিশালী হাদিস রয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে, ‘মাকবুল মুমিনগণ, প্রত্যেক ভোরে ও প্রত্যেক সন্ধ্যায়, যাদের মর্যাদা কম হবে তারা প্রত্যেক জুমারদিনে আর নারীরা দুনিয়ার ঈদের মত বছরে কয়েকবার আল্লাহ্ তা’আলার জামালের তাজাল্লী ও রু’ইয়তের দ্বারা পরম সৌভাগ্য অর্জন করবেন’।

[হযরত শাইখ আব্দুল হক্ক দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি[3] তার ‘**তাকমিলুল ঈমান**’ নামক কিতাবে বলেছেন যে, হাদিস শরীফে আছে, “**কিয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের রবকে পূর্নিমার চাঁদের ন্যায় দেখতে পাবে**”। মহান আল্লাহ্ তা’আলাকে দুনিয়াতে যেমন না বুঝেই জানা গেছে তেমনিভাবে আখেরাতে না বুঝেই দেখা যাবে। ইমাম আবুল হাসান আল আশয়ারী, ইমাম সুয়ুতী ও ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন’এর মত বিখ্যাত আলেমগণের মতে, ফেরেশতারা জান্নাতে আল্লাহ্ তা’আলাকে দেখতে পাবেন। ইমাম-ই আজম হযরত আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন যে, জ্বিনরা সওয়াব অর্জন করে না তাই জান্নাতেও প্রবেশ করবে না, তবে মুমিন জ্বিনরা জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। নারীরা, দুনিয়ার ঈদের দিনগুলির মত বছরে কয়েকবার দেখতে পারবে। কামিল মুমিনগণ প্রতিদিন ফজর ও মাগরিবের সময়ে আর সাধারণ মুমিনগণ প্রতি জুমার দিনে মহান আল্লাহ্ তা’আলার দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবে। এই ফকীরের মতে, মুমিন নারীগণ, ফেরেশতাগণ ও মুমিন জ্বিনরাও এই সৌভাগ্য অর্জন করবে। হযরত ফাতেমাতুজ্ জোহরা, আম্মাজান

[3] হযরত আব্দুল হক্ব দহেলভৌ, ১০৫২ হজিরী (১৬৪২ খৃস্টাব্দে) দলি্লীতে ইনতকিাল করছে।

হযরত খাদীজাতুল্ কুবরা ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুন্না এবং হযরত মরিয়ম ও হযরত আছিয়া আলাইহুমাস্ সালামের মত কামিল ও আরিফ নারীগণ অবশ্যই স্বীয় যোগ্যতা অনুযায়ী বিশেষভাবে পুরস্কৃত হবেন। ইমাম সুয়ুতী রহমাতুল্লাহি আলাইহিও এই বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করেছেন।]

আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন লাভের বিষয়টি বিশ্বাস করা উচিত তবে কিভাবে দেখা সম্ভব হবে তা নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার কাজকর্ম আমাদের আকল দিয়ে বুঝা সম্ভব নয়। আর তা দুনিয়ার কর্মের সাথে সাদৃশ্যও রাখে না। [পদার্থ ও রসায়নের জ্ঞান দিয়ে তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়] আল্লাহ্ তা'আলার দিক নাই। আল্লাহ্ তা'আলা কোন বস্তু বা উপাদান নন। [যৌগিক বা মৌলিক পদার্থ নন]। তাঁকে হিসাব করা, গণনা করা বা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তাঁর মাঝে কোন পরিবর্তন নাই। স্থান, কাল বা পাত্রের সাথে সম্পর্কিত নন। তাঁর জন্য পূর্ববর্তী বা পরবর্তী বলে কিছু নাই। তাঁর সামনে, পিছনে, উপরে, নিচে, ডানে, বামে বলতে কিছু নাই। একারণেই, মানুষের চিন্তা ও কল্পনা শক্তি তাঁর কোন কিছুই প্রকৃত অর্থে বুঝার সামর্থ্য রাখে না। তিনি কিভাবে দর্শিত হবেন তাও অনুধাবন করতে পারে না। হাত, পা, দিক, স্থান বা এর মত যেসব কালিমা তাঁর জন্য বলা জায়েজ নয় কিন্তু বিভিন্ন আয়াতে করীমায় ও হাদিস শরীফে এসেছে তা আমরা দৈনন্দিন যে অর্থে ব্যবহার করি সে অর্থে নয়। এই ধরণের আয়াতে করীমা ও হাদিস শরীফকে '**মুতাশাবিহাত**' বলা হয়। এগুলি যেভাবে আছে সেভাবে বিশ্বাস করতে হবে তবে এর প্রকৃতি কি বা কেমন সে ব্যাপারে মাথা ঘামানো উচিত নয়। অথবা একে '**তাওয়ীল**' করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার শানের উপযুক্ত কোন অর্থ প্রদান করা হয়। যেমন, হাত শব্দটিকে কুদরত, ক্ষমতা বা শক্তি অর্থে বুঝা উচিত।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহ্ তা'আলাকে মিরাজের রজনীতে দেখেছিলেন। তবে এই দেখা, দুনিয়াবী শারীরিক চক্ষুর মাধ্যমে ছিল না। কেউ যদি বলে, আমি দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেছি তবে সে পথভ্রষ্ট হবে। আওলিয়া কাদ্দাসাল্লাহু তা'আলা আসরারাহুম

আজমাইন’এর দেখা দুনিয়া বা আখেরাতের দেখার অত নয়। অর্থাৎ ‘**রু’ইয়াত**’ নয়। তারা ‘**শুহুদ**’ অর্জন করেছিলেন। [অর্থাৎ ক্বালবের চোখ দিয়ে তাঁর ‘মিছাল’কে দেখেছে।] আওলিয়া-ই কিরামদের মাঝে অনেকেই বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা’আলাকে দেখেছি। তাদের এই কথা ‘সাক্‌র’ অবস্থায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ আকলের অকার্যকর থাকা অবস্থায়, শুহুদকে রু’ইয়াত ভেবে বলেছে। অথবা এই ধরণের কথাকে তাওয়ীল করে বুঝতে হবে।

প্রশ্ন: উপরে বলা হয়েছে যে আল্লাহ্ তা’আলাকে দুনিয়ার চোখ দিয়ে দেখা জায়েজ। এখন জায়েজ কোন কিছু সম্পর্কে কেউ অর্জনের দাবী করলে কেন তাকে ‘জিনদিক’ বলা হবে। অর্জনের দাবীকারীকে যদি কাফির বলা হয় তবে সেই বিষয়টিকে কিভাবে জায়েজ বলা যায়?

জবাব: প্রথমত অভিধানে জায়েজ বলতে, কোন কিছুর হওয়া বা না হওয়া উভয়টিই সম্ভবকে বুঝায়। আশয়ারী[4] মাজহাব অনুযায়ী, রু’ইয়াত জায়েজ বলতে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্ তা’আলা চাইলে দুনিয়াবী কানুনের বাইরের কোন দৃষ্টি শক্তি সৃষ্টি করে দেখা দিতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, চীনে অবস্থানরত কোন অন্ধ ব্যক্তিকে আন্দালুসে অবস্থিত কোন মশাকে দেখার ক্ষমতা দিতে পারেন। আল্লাহ্ তা’আলা যা ইচ্ছা করেন তাই করতে সক্ষম। দ্বিতীয়ত, দুনিয়াতে দেখেছি বললে তা পবিত্র কুরআন মজিদের আয়াতে করীমার ও আলেমগণের ইজমার বরখেলাপ করা হবে। এজন্যই এরূপ দাবীকারীকে **মুলহিদ** অথবা **জিনদিক** বলা হয়েছে। তৃতীয়ত, দুনিয়াতে রু’ইয়াত জায়েজ বলতে জাগতিক উপায়ে দেখা সম্ভবের কথা বুঝানো হয়নি। অথচ যারা দেখেছি বলে, তারা দুনিয়ার চোখের দেখার কথাই বুঝিয়ে থাকে। যা জায়েজ নয় অর্থাৎ সম্ভব নয়। [হযরত মাওলানা খালিদ রাহিমাহুল্লাহু তা’আলা], এই জবাবের পরে বলেন যে, ‘সতর্ক হও!’ এর দ্বারা মূলত দ্বিতীয় জবাবের অধিক গ্রহণীয় হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। [**মুলহিদ** ও **জিনদিক** নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে। **মুলহিদ** এব্যাপারে আন্তরিক। নিজেকে মুসলমান

[4] হযরত আবুল হাসান আলী বনি ইসমাঈল আশয়ারী, ৩৩০ হজিরী (৯৪১ খৃস্টাব্দে) বাগদাদে ইনতকিাল করছেনে।

মনে করে, সঠিক পথের অনুসারী ভাবে। কিন্তু **জিনদিক** হচ্ছে ইসলামের শত্রু। তারা ইসলামিয়্যাতের মাঝে থেকে মুসলমানদেরকে প্রতারিত করার জন্য নিজেদেরকে মুসলমান বলে জাহির করে।]

আল্লাহ্ তা’আলার সাথে রাত, দিন কিংবা সময়কে সম্পর্কিত করার কথা ভাবা যায় না। আল্লাহ্ তা’আলার জন্য পরিবর্তনের কথাও ভাবা জায় না। এ কারণে, তাঁর জন্য অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বলতে কিছুই নাই। আল্লাহ্ তা’আলা কোন কিছুর মাঝে ‘খুলুল’ করেন না। তিনি কোন কিছুর সাথে মিশ্রিতও হন না। [শিয়াদের মধ্য থেকে **নুসাইরী** নামক ফিরকা এই আক্বীদার কারণে কাফির হয়ে যায় যে, তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহুর মাঝে খুলুল করেছেন।] আল্লাহ্ তা’আলার কোন শরীক, অংশীদার, সমকক্ষ, সাহায্যকারী, রক্ষাকারী নাই। তাঁর মা, বাবা, পুত্র, কন্যা, সঙ্গী বলতেও কিছু নাই। সর্বক্ষন ও সর্ববস্থায় সকলের নিকট হাজির এবং সবকিছুর নিয়ন্ত্রক ও পরিদর্শক। কিন্তু তাঁর এই হাজির হওয়া, সর্বব্যাপী হওয়া, নিকটবর্তী হওয়া আমরা যে অর্থে বুঝি সে অর্থে নয়। তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি আলেমদের ইলমের মাধ্যমে, বিজ্ঞানীদের জ্ঞানের দ্বারা ও আওলিয়া-ই কিরামের কাশ্ফ ও শুহুদের দ্বারা বুঝা সম্ভব নয়। মানুষের আকল এর মর্মার্থ বুঝতে অক্ষম। আল্লাহ্ তা’আলার জাত ও সিফাত এক। কোনটির মধ্যেই পরিবর্তন, বিবর্তন নাই। তাফাক্কারু ফি আলাইল্লাহ ওয়া লা তাফাক্কারু ফি জাতিল্লাহ। এই বিষয়ে মাকতুবাত কিতাবের প্রথম খণ্ডের ৪৬ নম্বর মাকতুব পড়ুন।

আল্লাহ্ তা’আলার ইসম্সমূহ ‘**তাওকিফী**’। অর্থাৎ ইসলামিয়্যাত যে নামসমূহ আমাদেরকে অবহিত করেছে তা বলা জায়েজ, এর পরিবর্তে অন্য নাম বলা জায়েজ নয়। [যেমন, ইসলামিয়্যাত আল্লাহ্ তা’আলার ইসম হিসেবে আলীম বলেছে। এখন এর কাছাকাছি অর্থের ফাকিহ নামটি এর বদলে আল্লাহ্ তা’আলার জন্য বলা যাবে না। কেননা ইসলামিয়্যাত, আল্লাহ্ তা’আলাকে ফাকিহ নাম দেয়নি। একইভাবে আল্লাহ্ নামের স্থানে দেবতা বা উপাস্য ইত্যাদি বলা জায়েজ হবে না। ‘আল্লাহ্ হলেন এক, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই’ বলা

যাবে। অন্য ভাষার ‘গড’, ‘খোদা’ ইত্যাদি ইলাহ্, মাবূদ অর্থে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ নামের বদলে ব্যবহার করা যাবে না।]

আল্লাহ্ তা’আলার অসংখ্য ইসম্ রয়েছে। মশহুর মত হল এক হাজার একটি ইসম্ রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর নামসমূহ থেকে এক হাজার একটি নাম মানুষকে জানানো হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিরানব্বইটি নাম অবহিত করেছেন। এগুলিকে ‘**আসমাউল হুসনা**’ বলা হয়।

আল্লাহ্ তা’আলার ছয়টি ‘**সিফাত-ই যাতিয়্যা**’ রয়েছে। [যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।] **মাতুরিদী** মাজহাব অনুযায়ী তাঁর আটটি ‘**সুবুতী সিফাত**’ রয়েছে। **আশয়ারী** মাজহাব অনুযায়ী এর সংখ্যা সাতটি। এই সিফাতগুলিও তাঁর জাতের মত অনাদি ও অনন্ত। সৃষ্টির সিফাতের মত নয়। আকল বা কল্পনার দ্বারা, দুনিয়ার ঐ ধরণের সিফাতের সাথে তুলনা করে তাঁর সিফাতসমূহ বুঝা অসম্ভব। আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর সিফাতসমূহ থেকে একেকটি নমুনা মানুষকে দান করেছেন। যাতে করে মানুষ এর দ্বারা আল্লাহ্ তা’আলার সিফাতসমূহকে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারে। আল্লাহ্ তা’আলার এই আটটি সুবুতী সিফাত তাঁর জাতের ‘আইনী’ও নয়, ‘গাইরী’ও নয়। অর্থাৎ এই সিফাতসমূহ তিনি নন, আবার সিফাতসমূহ তিনি ব্যতীত অন্য কিছুও নয়। এই আটটি সিফাত হল:

হায়াত, **ইলম**, **সাম’**, **বাছার**, **কুদরত**, **কালাম**, **ইরাদা** ও **তাকবীন**। আশয়ারী মাজহাব অনুযায়ী তাকবীন ও কুদরত সিফাতকে এক ধরা হয়েছে। আর মাশিয়াতকে ইরাদা বলা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা’আলার আটটি সিফাতের প্রত্যেকটি পরম অর্থ বহন করে ও একই অবস্থায় বিদ্যমান। কোনটিতেই কোনধরনের পরিবর্তন হয় না। কিন্তু মাখলুকের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার বিবেচনায় প্রত্যেকটিই অনেক হয়। একটি সিফাতের, মাখলুকের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার বিবেচনায় অনেক হওয়াটা, এর পরম হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাঁধা নয়। এর মতই আল্লাহ্ তা’আলা এত ধরণের মাখলুক সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকটিকে, প্রতি মুহূর্তে অস্তিত্বে টিকিয়ে

রেখেছেন তথাপি তিনি এক। এর দ্বারা তাঁর সিফাতের মাঝেও কোন পরিবর্তন হয় না। প্রতিটি সৃষ্টি প্রতি মুহূর্তে টিকে থাকার জন্য তাঁর মুখাপেক্ষী। কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

২. যে ছয়টি বিষয়ে ঈমান গ্রহণ করা আবশ্যক তার দ্বিতীয়টি হল: **তাঁর ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনা**। আরবীতে একে '**মালাক**' বলা হয়। এর অর্থ হল: দূত, খবর সরবরাহকারী অথবা শক্তি। ফেরেশতারা নূরানী সৃষ্টি ও জীবনের অধিকারী। তারা অতি সূক্ষ্ম উপাদানে (লাতিফ্) তৈরী। মানুষের মাঝে যে মন্দ ঋপু রয়েছে, ফেরেশতাদের মাঝে তা নাই। বহু আকৃতি ধারণ করতে পারে। ফেরেশতারা, বুজুর্গ ব্যক্তিদের দেহ থেকে আলাদা হওয়া রূহ নয়। খৃস্টানরা এরূপ ধারণা করে থাকে। ফেরশতারা বস্তুহীন কোন শক্তিও নয়। প্রাচীন দার্শনিকদের কেউকেউ এরূপ ধারণা করত। 'মালাক' এর বহুবচন '**মালাইকা**'। ফেরেশতাদেরকে জীবন ধারণকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে। এজন্য, কিতাবের প্রতি ঈমান আনার পূর্বে ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে। আর পয়গম্বরদের পূর্বে কিতাবের কথা বলা হয়েছে। কুরআন করীমে, আবশ্যকীয় বিশ্বাসের বিষয়গুলিকে এই ক্রমধারা অনুযায়ীই বর্নিত হয়েছে।

ফেরেশতাদের উপর ঈমান এরূপ হওয়া উচিত: ফেরেশতারা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি ও বান্দা। তাঁর অংশীদার নয়। তাঁর কন্যাও নয়। কাফির ও মুশরিকরা এরূপ ধারণা করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা সকল ফেরেশতাকে পছন্দ করেন। তারা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের পরম আনুগত্য করে। কোন ধরণের গুনাহ সম্পাদন করেন না। কোন আদেশের বিরোধিতাও করেন না। তারা পুরুষ বা নারী নন। বিবাহ করেন না, সন্তানও জন্ম দেন না। হায়াতের অধিকারী ও জীবন্ত। আল্লাহ্ তা'আলা যখন মানুষ সৃষ্টির ইরাদা করলেন তখন "ইয়া রব! আপনি কি এমন এক জাতি সৃষ্টি করবেন যারা ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদে লিপ্ত হবে ও রক্তারক্তি করবে?" এরূপ বলে যে সওয়াল করেছেন, তাকে '**জাল্লা**' বলা হয়। এ ধরণের জাল্লা তাদের মাসুম তথা নিষ্পাপ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন ক্ষতি সাধন করে না।

সংখ্যাধিক্যের বিবেচনায় ফেরেশতারাই সেরা মাখলুক। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কেউই তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা রাখে না। মহাশূন্যে, ফেরেশতাদের ইবাদত করা হয়নি এমন কোন খালি স্থান বিদ্যমান নাই। মহাকাশের প্রতিটি স্থানে রুকু ও সিজদাকারী ফেরশতাদের দ্বারা পরিপূর্ণ। আসমানে, জমিনে, তারায়, নক্ষত্রে, জড় ও জীবে, বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটায়, বৃক্ষের প্রতিটি পাতায়, প্রতিটি অণু ও পরমাণুতে, প্রতিটি ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অর্থাৎ সবকিছুতেই ফেরেশতারা প্রদত্ত দ্বায়িত্ব পালন করে থাকেন। সর্বত্র আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালন করেন। মূলত তারা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝের এক মাধ্যম। তাদের কেউ অন্য ফেরেশতাদের সর্দার, কেউ পয়গম্বরদের নিকট ওহী বহন করেন কেউবা মানুষের ক্বালবে সৎ চিন্তার উদ্রেক করেন। একে **ইলহাম** বলা হয়। আবার এমনও এনেক ফেরশতা আছেন, যাদের মানুষ বা অন্য সৃষ্টি সম্পর্কে কোন ধারণাই নাই। কেউ বা আল্লাহ্ তা'আলার জামাল দেখে আত্মহারা হয়ে আছেন। প্রত্যেক ফেরেশতারই নির্দিষ্ট দ্বায়িত্ব রয়েছে। তারা কখনোই তাদের দ্বায়িত্ব পালন থেকে মুহুর্তের জন্যও বিচ্যুত হন না। তাদের কারো দুইটি, কারো চারটি অথবা আরো অধিক ডানা রয়েছে। [মানুষ না জানা কিছু শুনলে তার জানা কিছুর সাথে তুলনা করে বুঝতে চেষ্টা করে,এভাবেই প্রতারিত হয়। ফেরেশতাদের ডানা আছে তা বিশ্বাস করি, কিন্তু এর প্রকৃতি কি তা আমাদের অজানা। খৃস্টানদের চার্চে কিংবা সাহিত্যে নারীরূপী ফেরেশতার ছবি অঙ্কিত আছে। মুসলমানরা এরূপে বিশ্বাস করে না। কেননা বাস্তবের সাথে এর যে কোন মিল নাই তা তারা ভালোভাবেই জানে।] জান্নাতের ফেরেশতারা জান্নাতে অবস্থান করেন। তাদের সর্দারের নাম হল **রিদওয়ান**। জাহান্নামে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের '**জাবানী**' বলা হয়। তারা সেখানে আদিষ্ট দ্বায়িত্ব পালনে রত থাকেন। জাহান্নামের আগুন তাদের কোন ক্ষতি করে না। যেমন মাছ পানিতে কষ্ট পায় না। জাবানীদের মাঝে উনিশজন বড় ফেরেশতা আছেন। তাদের সর্দারের নাম '**মালিক**'।

প্রত্যেক মানুষের ভাল ও মন্দ সকল কাজ লিপিবদ্ধ করার জন্য রাতে দুজন, দিনে দুজন এভাবে মোট চারজন ফেরেশতা দ্বায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

এদেরকে '**কিরামান কাতিবিন**' বা '**হাফাজা ফেরেশতা**' বলা হয়। ডান কাঁধের ফেরেশতা ভালোকাজসমূহ লেখেন একইসাথে তিনি বাম কাঁধের ফেরেশতার পরিচালকের দ্বায়িত্বও পালন করেন। বামের ফেরেশতা মন্দ কাজ লিপিবদ্ধ করেন। কবরে প্রশ্নকারী এবং কাফির ও পাপী মুসলমানদের শাস্তি প্রদানকারী ফেরেশতা রয়েছেন। কবরে প্রশ্নকারী ফেরেশতাদের '**মুনকার** ও **নাকির**' বলা হয়। মুমিনদেরকে যারা প্রশ্ন করবেন তাদেরকে '**মুবাশশির** ও **বশির**'ও বলা হয়।

ফেরেশতাদের মাঝে মর্যাদার দিক দিয়ে পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। তাদের মাঝে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী চারজন ফেরেশতা রয়েছেন। তাদের প্রথমজন হলেন, হযরত **জিবরাঈল** আলাইহিস্ সালাম: তাঁর দ্বায়িত্ব হল নবী-রাসূলদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার **ওহী** বহন করে নিয়া আসা। তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে অবহিত করা। দ্বিতীয়জন হলেন হযরত **ইসরাফিল** আলাইহিস্ সালাম: '**সূর**' বা শৃঙ্ঘায় ফুঁৎকারের জন্য দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা। তাঁর প্রথম ফুঁৎকারের আওয়াজ যারা শুনতে পাবে, আল্লাহ্ ব্যতীত জীবন্ত যা কিছু আছে তাদের সবাই মৃত্যুবরণ করবে। দ্বিতীয় ফুঁৎকারের আওয়াজ শুনে সমস্ত জীবের পুনর্জাগরণ হবে। তৃতীয়জন হলেন হযরত **মিকাঈল** আলাইহিস্ সালাম: রিজিক সরবরাহ করা, প্রাচুর্য কিংবা দূর্ভিক্ষের ব্যবস্থা [ইকতিছাদী নিজাম] করা, [প্রশান্তি ও স্বস্তি আনা] এবং প্রতিটি বস্তুর মাঝে গতির সঞ্চার করা ইত্যাদি তাঁর দ্বায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। চতুর্থজন হলেন হযরত **আজরাঈল** আলাইহিস্ সালাম: তিনি মানুষের জান কবজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা। [ফারসী ভাষায় রূহকে জান বলা হয়।] উনাদের পরে আরো চার শ্রেণীর ফেরেশতা রয়েছেন। '**হামালা-ই আরশ**' বা আরশের বহনকারী চারজন ফেরেশতা রয়েছেন। হুজুর-ই ইলাহী বা আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ফেরেশতাদেরকে '**মুকাররাবুন**' বলা হয়। আজাব প্রদানকারী ফেরেশতাদের বড়দেরকে '**কারুবিয়ান**' আর রহমতের ফেরেশতাদের '**রুহানিয়ান**' বলা হয়। এদের সবাই 'খাওয়াস' তথা বিশেষ ও শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা। তারা, পয়গম্বরগণ বাদে সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ।

আওলিয়া ও সালিহ মুসলমানগণ সাধারণ ফেরেশতাদের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী। আবার সাধারণ ফেরেশতাগণ সাধারণ মুসলমানের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান।

কাফিররা সকল সৃষ্টির চেয়ে অধম। শৃঙঘায় প্রথম ফুঁৎকারে, বড় চার ফেরেশতা ও হামালা-ই আরশগণ ব্যতীত অন্য সকল ফেরেশতাও অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। এরপর হামালা-ই আরশ ও চার বড় ফেরেশতাও বিলুপ্ত হবেন। দ্বিতীয় ফুঁৎকারে, প্রথমে সকল ফেরেশতাগণ জাগ্রত হবেন। হামালা-ই আরশ ও চার বড় ফেরেশতা দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পূর্বেই জাগ্রত হবেন। এর অর্থ দাঁড়ায়, যেভাবে এই ফেরেশতাগণ সকল প্রাণীর পূর্বে সৃষ্ট হয়েছেন তেমনিভাবে সকল জীবের পরেই তাঁদের মৃত্যু হবে।

৩. ঈমান গ্রহণ আবশ্যক এমন ছয়টি বিষয়ের তৃতীয়টি হল: **আল্লাহ্ তা’আলা যে সকল কিতাব নাযিল করেছেন সেগুলিকে বিশ্বাস করা**। মহান আল্লাহ্ তা’আলা এই কিতাবসমূহকে কতিপয় পয়গম্বরের প্রতি হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম মারফত ওহী হিসেবে প্রেরণ করেছেন অর্থাৎ পাঠ করিয়েছেন, কোন পয়গম্বরের প্রতি ‘লাওহা’ বা ফলকে লিপিবদ্ধ করে পাঠিয়েছেন আর কোন পয়গম্বরের প্রতি ফেরেশতাদের মাধ্যমে না পাঠিয়ে সরাসরি গায়েবী আওয়াজের মাধ্যমে শুনিয়ে নাজিল করেছেন। এগুলির সবই আল্লাহ্ তা’আলার কালামের অন্তর্ভুক্ত। এই বিবেচনায় তা চিরন্তন ও চিরস্থায়ী এবং মাখলূকের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলির সবই হক্ক। এগুলি কোন ফেরেশতা কিংবা পয়গম্বরের নিজের কথা নয়। আল্লাহ্ তা’আলার কালাম, আমরা যা লিখি বা মনে ধারণ করি কিংবা মুখে বলি সেরূপ কোন কালাম নয়। তাঁর কালাম কোন বর্ণ বা আওয়াজ নয়। আল্লাহ্ তা’আলার সিফাতসমূহের প্রকৃতি মানুষের পক্ষে বুঝা অসম্ভব। কিন্তু ঐ কালাম যখন মানুষের নিকট আসে তখন তা পড়া যায়, লিখা যায় ও মুখস্তও করা যায়। ঐ কালাম আমাদের সাথে হলে ‘হাদিস’ হয়। আল্লাহ্ তা’আলার কালাম মানুষের সাথে থাকলে মাখলুক ও হাদিস হয়। আল্লাহ্ তা’আলার কালাম হিসেবে ‘কাদিম’ হয়।

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাবসমূহের সবগুলিই হক্ক ও সঠিক। এতে কোন মিথ্যা বা ভুল হতে পারে না। আযাব দিব বলে ক্ষমা করে দেয়াটা জায়েজ হিসেবে উল্লেখ করা হলেও তা আমাদের না জানা কোন শর্ত অথবা তাঁর ইরাদার সাথে সম্পর্কিত। কিংবা এর অর্থ হবে, বান্দা আযাবের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ক্ষমা করে দেন। আযাব বা শাস্তির ঘোষণাকারী কালাম, কোন কিছুর ব্যাপারে খবর প্রদানের জন্য নয় যে, মিথ্যা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা যেসবের ওয়াদা করেছেন, সেসব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করা জায়েজ না হলেও, তাঁর পক্ষে আযাবসমূহ ক্ষমা করে দেয়া জায়েজ হয়। আকল ও আয়াতে করীমা এরূপ হওয়ার প্রতিই নির্দেশ করছে।

কোন 'মানি' বা সমস্যা না থাকলে, আয়াতে করীমা ও হাদিস শরীফের স্পষ্ট অর্থই প্রদান করতে হয়। সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য কোন অর্থ প্রদান করা জায়েজ নয়। [কুরআন করীম ও হাদিস শরীফ কুরাইশের ভাষা ও অভিধানে বর্নিত হয়েছে। তাই এদের কালিমার অর্থ প্রদানের সময়, চৌদ্দশত বছর পূর্বে হিজাজে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেই অর্থই প্রদান করতে হবে। সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হওয়া বর্তমানের অর্থ দিয়ে অনুবাদ করা সঠিক নয়।] **মুতাশাবিহ** নামক আয়াতে করীমাগুলিতে আমাদের বোধশক্তির উর্দ্ধের গোপন অর্থ রয়েছে। এগুলির অর্থ কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা জানেন, আর তিনি যাদেরকে (**ইলমে লাদুন্নী**) দিয়েছেন সেসকল কতিপয় নির্বাচিত বুজুর্গ ব্যক্তি ও আল্লাহ্র অলীগন তাদেরকে যতটুকু জানানো হয়েছে ততটুকু জানতে পারেন। অন্য কারো পক্ষে তা বুঝা সম্ভব নয়। একারণে, মুতাশাবিহ আয়াতসমূহকে আল্লাহ্র কালাম হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে কিন্তু এর নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। আশয়ারী মাজহাব অনুযায়ী তার সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিতভাবে **তাওয়ীল** করা জায়েজ। তাওয়ীল মানে, কোন কালিমার বিভিন্ন অর্থের মধ্য থেকে মশহুর নয় এমন অর্থকে গ্রহণ করা। উদাহরণস্বরূপ, সূরা ইসরার নিম্নোক্ত আয়াতে করীমাটি (তাফসীর আলেমদের প্রদত্ত অর্থ) "**আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর ছিল**" আল্লাহ্ তা'আলার কালাম হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা এর দ্বারা যাই মুরাদ করেছেন সেভাবেই বিশ্বাস করেছি বলা উচিত। এর

অর্থ আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই এ বিষয়ে ভাল জানেন, বলাটা উত্তম হল পন্থা। অথবা এভাবে তাওয়ীল করা যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইল্‌ম যেমন আমাদের মত নয়, তাঁর ইরাদা যেমন আমাদের মত নয়, তেমনিভাবে তাঁর হাতও সৃষ্টির হাতের মত হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাবসমূহে, কিছু আয়াতের শুধুমাত্র তিলাওয়াত কিংবা শুধুমাত্র অর্থ অথবা উভয়ই একসাথে **'নাসখ'** করা হয়েছে। সর্বশেষ ইলাহী কিতাব হল কুরআন করীম। কুরআন করীমকে প্রেরণ করার পরে, পূর্বের সমস্ত ইলাহী কিতাবের হুকুম 'নাস্‌খ' হয়ে গেছে। কুরআন করীমে কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। এতে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন সাধিত হবে না। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ইলম কুরআনের মাঝে নিহিত আছে। একারণেই অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও অধিক মূল্যবান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বড় মুজিযা হল এই কুরআন করীম। সমগ্র মানব ও জ্বিন জাতি একত্রিত হয়ে পবিত্র কুরআনের একটি সংক্ষিপ্ত সূরার অনুরূপ কিছু রচনা করার চেষ্টা করলেও তাতে সফল হবে না। তৎকালীন আরবের বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, ভাষাবিদরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু একটি আয়াতের বিকল্পও রচনা করতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের দুশমনদেরকে কুরআন করীমের দ্বারা পরাভূত করেছেন। কুরআন করীমের বালাগাত মানুষের সাধ্যাতীত। মানুষের পক্ষে এর মত করে বলা অসম্ভব। কুরআন করীমের আয়াতসমূহ, মানুষের মত ছন্দ, পদ্য কিংবা গদ্যের সাথে মিলে না। একইসাথে আবার এই কুরআন করীম, আরবদেশের সাহিত্যিকদের ব্যবহৃত হরফসমূহের দ্বারাই নাযিল হয়েছে।

আসমানী কিতাবসমূহের মধ্য থেকে আমাদেরকে একশ চারটির ব্যাপারে অবহিত করা হয়েছে। এগুলির মধ্য থেকে দশটি 'সুহুফ' হযরত **আদম** আলাইহিস্ সালামকে, পঞ্চাশটি সুহুফ হযরত শীশ (**শিত্**) আলাইহিস্ সালামকে, ত্রিশটি সুহুফ হযরত **ইদ্রিস** আলাইহিস্ সালামকে ও বাকী দশটি সুহুফ হযরত **ইবরাহীম** আলাইহিস্ সালামকে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের প্রতি '**তাওরাত**', হযরত দাউদ আলাইহিস্

সালামের প্রতি '**যাবুর**', হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের প্রতি '**ইনজিল**' ও সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি **কুরআন করীম**কে নাযিল করা হয়েছে।

একজন মানুষ কোন আদেশ কিংবা নিষেধ করার জন্য অথবা কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য বা কোন খবর প্রদানের জন্য ইচ্ছা করলে, প্রথমে তা মনে মনে চিন্তা করে, সাঁজায় ও প্রস্তুত করে। মনের মাঝে থাকা এই অর্থকে '**কালাম-ই নাফসী**' বলা হয়। এই অর্থকে আরবী, ফারসী বা অন্য কোন ভাষার সাথে সম্পর্কিত করা যায় না। এই অর্থকে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করলে বিভিন্ন অর্থ বহন করবে না। মনের ঐ অর্থকে ভাষায় প্রকাশ করলে তাকে '**কালাম-ই লাফজী**' বলা হয়। কালাম-ই লাফজী বিভিন্ন ভাষার হতে পারে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কালাম-ই নাফসী আল্লাহ্ তা'আলার অন্যান্য সিফাত যেমন ইলম, ইরাদা, বাস্র ইত্যাদির মত সত্ত্বার মাঝেই নিহিত, পৃথক একটি সিফাত ও অপরিবর্তনশীল। আর কালাম-ই লাফজী হল, ঐ কালাম-ই নাফসীকে প্রকাশকারী ও মানুষের কানে শোনা ও মুখ দিয়ে বলা হরফের সমষ্টি। অতএব আল্লাহ্ তা'আলার কালাম কোন মাখলুক নয়, জাতের মাঝে নিহিত অনাদি ও অনন্ত এক সিফাত। যা সিফাতে জাতিয়্যা থেকে ও ইলম, ইরাদা এর মত সিফাতে সুবুতিয়্যা থেকে ভিন্ন, স্বতন্ত্র একটি সিফাত।

কালাম সিফাতও পরম ও মৌলিক। এর কোন হরফ বা আওয়াজ নাই। আদেশ, নিষেধ, খবর প্রদানের মত কিংবা আরবী, ফারসী, ইবরানী, সুরিয়ানী ইত্যাদির মত ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণকারী নয়। আল্লাহ্ তা'আলার কালাম অবিভাজ্য। এর কোন কাঠামো নাই, তাই লেখা সম্ভব নয়। এর জন্য মস্তিষ্ক, কান বা জিহ্বার মত কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নাই। যে ভাষাতেই ইচ্ছা প্রকাশ করা সম্ভব। এভাবেই আরবী ভাষায় বলা হলে তাকে কুরআন করীম বলা হয়, ইবরানী ভাষায় হলে তাওরাত আর সুরিয়ানী ভাষায় হলে 'ইনজিল' বলা হয়।

['**শারহুল মাকাসিদ্**'[5] কিতাবে গ্রীক ভাষায় ইনজিল আর সুরইয়ানী ভাষায় হলে 'যাবুর' বলা হয়েছে।]

কালাম-ই ইলাহী আমাদেরকে অনেক কিছু অবহিত করে। ঘটনার বর্ননা করলে তাকে '**খবর**' বলা হয়। এরূপ না হলে তাকে '**ইনশা**' বলা হয়। কোন কিছু করার আদেশ বুঝালে তাকে '**আমর্**' আর কিছু করা থেকে নিষেধ করলে তাকে '**নাহ্ই**' বলা হয়। কালাম-ই ইলাহীর মাঝে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হয় না। নাযিলকৃত সমস্ত আসমানী কিতাব ও সাহিফাসমূহ, আল্লাহ্ তা'আলার কালাম সিফাত থেকে আগত। কালাম সিফাত থেকে অর্থাৎ, **কালাম-ই নাফসী**র থেকে আগত। আরবী হরফে নাযিলকৃত ওহীকেই কুরআন করীম বলা হয়। হরফে ভর করা, যা লেখা যায়, বলা যায়, শুনা যায় ও মুখস্ত করা যায় এমন সারিবদ্ধভাবে নাযিল হওয়া ওহীকে '**কালাম-ই লাফজী**' বা '**কুরআন করীম**' বলা হয়। এই কালাম-ই লাফজী, কালাম-ই নাফসীর প্রতি নির্দেশ করে বিধায় একেও কালাম-ই ইলাহী বা সিফাত-ই ইলাহী বলা জায়েজ। এর সম্পূর্নটিকে একত্রে কুরআন করীম বলা হয়, একইভাবে এর কোন অংশ বা আয়াতকেও কুরআন বলা হয়।

কালাম-ই নাফসী যে মাখলুক নয়, বরং অন্যান্য সিফাতের মতই কাদিম সে ব্যাপারে সত্যপন্থী আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন। তবে কালাম-ই লাফজী হাদিস না কাদিম এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। তবে অধিকাংশ আলেমই কালাম-ই লাফজীকে হাদিস বলতে নিষেধ করেছেন। কেননা এর দ্বারা মানুষ কালাম-ই নাফসীকেও হাদিস ভাবতে পারে। এটিই সর্বাধিক উপযুক্ত কথা। মানুষের চিন্তাশক্তি, কোন কিছুর প্রতি নির্দেশকারী কিছু শুনলে, তৎক্ষণাৎ ঐ জিনিস কল্পনা করে। আহলে সুন্নাত আলেমদের মধ্য থেকে কুরআন করীমকে যারা হাদিস বলেন তারা এর দ্বারা, আমাদের মুখ দিয়ে কুরআনের যে আওয়াজ বা হরফ উচ্চারিত হয় তাকে বুঝাতে চেয়েছেন। আর তা মাখলুক।

---

[5] শারহুল মাকাসদি কতিাবটি সাদ্‌উদ্‌দনি তাফতাযানী রচনা করছেনে। তনিি ৭৯২ হজিরীতে (১৩৮৯ খৃস্‌টাব্‌দে) সমরকন্‌দে ইনতকিাল করছেনে।

তবে আহলে সুন্নাত আলেমগণ এব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, কালাম-ই লাফজী ও কালাম-ই নাফসী উভয়ই আল্লাহ্‌র কালাম হিসেবে বিবেচিত। এই কথাকে অনেকে মাযাজ হিসেবে গ্রহণ করলেও, এখানে কালাম-ই নাফসী আল্লাহ্‌ তা'আলার কালাম বলতে, আল্লাহ্‌ তা'আলার কালাম সিফাতকে বুঝানো হয়েছে। আর কালাম-ই লাফজী আল্লাহ্‌ তা'আলার কালাম বলতে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এর খালেক তা বুঝানো হয়েছে।

সওয়াল: উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার আযালী কালাম শোনা সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌র কালাম শুনেছি বলতে, তিলাওয়াতকৃত আওয়াজ বা কালিমা শুনেছি বুঝানো হয়। অথবা তিলাওয়াতকৃত আওয়াজ ও কালাম-ই নাফসী অনুধাবন করেছি বুঝানো হয়। সকল পয়গম্বর এমনকি সকল মানুষ এভাবে আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে সক্ষম। তবে কেন হযরত মূসা আলাইহিস্‌ সালামকে আলাদাভাবে 'কালীমুল্লাহ' বলা হয়?

জবাব: হযরত মূসা আলাইহিস্‌ সালাম সাধারণ ইলাহী আদতের থেকে আলাদাভাবে হরফহীন ও আওয়াজহীনভাবে কালাম-ই আযালীকে শুনতে পেয়েছেন। জান্নাতে যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলাকে না বুঝে দেখা যাবে যার ব্যাখ্যা অসম্ভব, তিনিও তেমনি বর্ননাতীতভাবে আল্লাহ্‌র কালাম শুনেছেন। অথবা আওয়াজের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র কালাম শুনেছেন, তবে তা শুধুমাত্র কান দিয়ে নয় বরং শরীরের প্রতিটি কণার দ্বারা শুনেছেন। বাতাসের কম্পন কিংবা অন্য কোন মাধ্যমের দ্বারা শুনেননি। তিনি এভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার কালাম শুনেছিলেন বিঁধায় তাঁকে '**কালীমুল্লাহ**' বলা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রজনীতে সরাসরি কালাম-ই ইলাহী শুনেছেন। একইভাবে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্‌ সালামও ওহী নেয়ার সময় শুনেছেন।

৪. ঈমান গ্রহণ আবশ্যক এমন ছয়টি বিষয়ের চতুর্থটি হল: **পয়গম্বরদের প্রতি ঈমান**। পয়গম্বরগণ, মহান আল্লাহ্‌ তা'আলার পছন্দনীয় পথের সন্ধান দেয়ার জন্য, সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। সমস্ত পয়গম্বরগণ একই ঈমানের কথা বলে গিয়েছেন। 'রুসুল' রাসূলের বহুবচন। এর

অর্থ হল প্রেরিত পুরুষ, দূত বা সংবাদদাতা। ইসলামিয়্যাত অনুযায়ী **রাসূল** হলেন, স্বভাব-প্রকৃতি, শারীরিক গড়ন, ইলম, আকল ইত্যাদির বিবেচনায় সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। যার কোন মন্দ স্বভাব বা অপছন্দনীয় দিক নাই। সকল পয়গম্বরের '**ইসমত**' সিফাত রয়েছে। অর্থাৎ নবুয়্যত প্রকাশের পূর্বে বা পরে তাদের দ্বারা ছোট বা বড় কোন ধরণের গুনাহ সম্পাদিত হয় না। [ইসলামকে ভিতর থেকে ধ্বংস করতে ইচ্ছুক কাফিররা বলে যে, 'হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়্যত প্রাপ্তির পূর্বে মূর্তির সামনে কুরবানী দিয়েছেন' আর এর সপক্ষে মাজহাব বিরোধীদের রচিত কিতাব থেকে দলিল প্রদর্শন করে। এই কুৎসিত অপবাদের যে কোন ভিত্তি নাই তা উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়।] নবুয়্যত প্রাপ্তির পরে তা প্রচারের আগ পর্যন্ত অন্ধ বা বধির হওয়ার মত শারীরিক ত্রুটিও থাকে না। এছাড়াও প্রত্যেক পয়গম্বরের সাতটি সিফাত রয়েছে। এগুলিকে বিশ্বাস করা জরুরী। এগুলি নিম্নরূপ: **আমানত**, **সিদক**, **তাবলীগ, আদালত, ইস্‌মত**, **ফাতানাত ও আমনুল আযল্‌** অর্থাৎ পয়গম্বরগণ কখনোই তাদের নবুয়্যত থেকে বহিষ্কৃত হন না। ফাতানাত অর্থ হল, অত্যন্ত মেধাবী ও খুবই বুঝমান হওয়া।

যে সকল পয়গম্বর নতুন শরীয়ত বা আহকাম নিয়ে এসেছেন তাদেরকে **রাসূল** বলা হয়। নতুন কোন শরীয়ত না এনে পূর্ববর্তী শরীয়তের প্রচারকারী পয়গম্বরদের **নবী** বলা হয়। পয়গম্বরদের উপর ঈমান আনা বলতে, তাদের পরস্পরের মাঝে কোন ধরণের ভেদাভেদ না করে প্রত্যেককেই মহান আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্বাচিত সাদিক বা সত্যবাদী হিসেবে বিশ্বাস করাকে বুঝায়। কেউ যদি তাদের মধ্য থেকে কোন একজনকেও নবী হিসেবে অস্বীকার করে তবে তা সকল পয়গম্বরকেই অস্বীকার করার শামিল হবে।

কঠোর সাধনা করে, অনেক বেশি ইবাদত করে, ক্ষুধার কষ্ট ও অন্যান্য যন্ত্রণা ভোগ করে নব্যুয়ত অর্জন করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশেষ ইহসান বা কৃপার দ্বারা যাকে মনোনীত করবেন তিনিই পয়গম্বর হতে পারেন। মানুষ যেন দুনিয়া ও আখেরাতের কাজকর্মকে সঠিকভাবে করতে পারে এবং নিজেকে ক্ষতিকর জিনিসের হাত থেকে বাঁচিয়ে সালামত, হেদায়েত

ও রহমত অর্জন করতে পারে সেই পথের দিশা দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা’আলা যুগে যুগে মানুষের নিকট পয়গম্বরদের মাধ্যমে সঠিক দ্বীনের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। পয়গম্বরগণ, আল্লাহ্ তা’আলা যেসব বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন আর যেসব করতে নিষেধ করেছেন তা প্রচারের ক্ষেত্রে একটুও বিচলিত হননি। দুশমনদের শত বাঁধা, অত্যাচারও তাদেরকে দ্বায়িত্ব থেকে পিছপা করতে পারেনি। পয়গম্বরগণ যে তাঁদের দাওয়াতের ব্যাপারে সত্যবাদী ছিলেন তা মানুষের নিকট সত্যায়ন করার জন্য মুজিযা প্রদান করেছেন। কেউই ঐসব মুজিযার মোকাবিলা করার সামর্থ্য রাখেনি। কোন পয়গম্বরের নবুয়্যত মেনে যারা তাঁকে বিশ্বাস করেছে তারা ঐ পয়গম্বরের **উম্মত** হিসেবে বিবেচিত হয়। কিয়ামতের দিবসে, আল্লাহ্ তা’আলা পয়গম্বরদেরকে স্বীয় গুনাহগার উম্মতের জন্য শাফায়াত করার অনুমতি দিবেন ও তাঁদের শাফায়াত কবুলও করবেন। তাছাড়া উম্মতের আলেম, সালিহ ও অলী বান্দাদেরও শাফায়াতের অনুমতি দেয়া হবে। পয়গম্বরগণ আলাইহিমুস্ সালাওয়াতু ওয়াস্ সালাম কবরে আমাদের না জানা এক ধরণের হায়াত যাপন করছেন। তাঁদের বরকতময় দেহকে মাটি পঁচাতে পারে না। একারণেই একটি হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, “**পয়গম্বরগণ নিজেদের কবরে নামাজ আদায় করেন ও হজ্জ পালন করেন**”।

[বর্তমানে আরবে বসবাসরত **ওহাবী** মতবাদের অনুসারীরা এই হাদিস সমূহকে বিশ্বাস করে না। একইসাথে এই হাদিস শরীফকে বিশ্বাসকারী প্রকৃত মুসলমানদেরকে কাফির আখ্যা দেয়। মা’না বা অর্থ স্পষ্ট নয় এমন নাস্‌সমূহের ভুল ব্যাখ্যা করার কারণে নিজেরা কাফির না হলেও **আহলি বিদায়াতে**র অন্তর্ভুক্ত হয়। মুসলমানদের ইতিক্বাদের ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ‘নাজদ্’ শহরে জন্মগ্রহণকারী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহহাব নামক ব্যক্তির দ্বারা ওহহাবী মতবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। ইংরেজ গোয়েন্দা হেম্ফার, ইবনে তাইমিয়াহের[6] ভ্রান্ত ফিকিরসমূহের দ্বারা তাকে প্ররোচিত করে। পরবর্তীতে মিশরের মুহাম্মদ আবদুহ্[7] নামের জনৈক ব্যক্তির রচিত কিতাবসমূহের দ্বারা দুনিয়ার সর্বত্র

---

[6] আহমদ ইবনে তাইময়িাহ, ৭২৮ হজিরী তথা ১৩২৮ খৃস্টাব্দে শাম নগরে মৃত্যুবরণ করে।

[7] ১৩২৩ হজিরীতে তথা ১৯০৫ খৃস্টাব্দে মশিরে মৃত্যুবরণ করে।

ছড়িয়েছে। এদেরকে পঞ্চম মাজহাব হিসেবে নয় বরং ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী হিসেবে, **আহলে সুন্নাত** আলেমগণ শতশত কিতাবে অবহিত করেছেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমান যুবকদেরকে ইংরেজদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই ওহহাবী মতবাদের অনুসারী হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখুক এবং হাদিস শরীফের দ্বারা প্রশংসিত **আহলে সুন্নাত** আলেমদের প্রদর্শিত সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত না করুক! আমীন!]

পয়গম্বর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামদের মুবারক চক্ষু যখন ঘুমায় তখনও তাদের অন্তর চক্ষু ঘুমায় না। পয়গম্বরীয় দ্বায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ও পয়গম্বরীয় মর্যাদা ধারণের ক্ষেত্রে সমস্ত পয়গম্বর সমান। উপরে বর্নিত সাতটি বিষয় প্রত্যেক পয়গম্বরের মাঝে বিদ্যমান। পয়গম্বরগণ কোন অবস্থাতেই স্বীয় দ্বায়িত্ব থেকে বহিষ্কৃত হন না, পদচ্যুত হন না। কিন্তু আওলিয়াদের ক্ষেত্রে অলীত্ব হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে। সমস্ত পয়গম্বর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াত্ তাসলিমাত মনুষ্য জাতির অন্তর্ভুক্ত। জ্বিন কিংবা ফেরেশতাদের জাতি থেকে মানুষের জন্য পয়গম্বর হওয়া সম্ভব নয়। কেননা জ্বিন কিংবা ফেরেশতাগণের পক্ষে পয়গম্বরদের সমপর্যায়ে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। তবে পয়গম্বরদের মাঝে সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন উম্মতের আধিক্য, যে এলাকায় পয়গম্বর হিসেবে পাঠানো হয়েছে তার ব্যাপ্তি, ইলম ও মারিফাতের বহু জায়গায় প্রচারিত হওয়া, মুজিযার আধিক্য বা অবিরাম হওয়া, ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ নিয়ামত বা অনুগ্রহ পাওয়া ইত্যাদির বিবেচনায় শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে আখেরী জামানার পয়গম্বর হযরত **মুহাম্মদ** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত পয়গম্বরদের মাঝে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। 'উলুল আজম' পয়গম্বরগণ অন্যদের থেকে এবং যারা রাসূল তাঁরা নবীদের তুলনায় অধিক মর্যাদাবান।

পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালাওয়াতু ওয়াস্ সালামদের প্রকৃত সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। তবে এক লক্ষ চব্বিশ হাজারের চেয়ে বেশি হওয়ার ব্যাপারটি মশহুর হয়েছে। তাঁদের মাঝ থেকে তিনশত তের কিংবা তিনশত পনের জন একইসাথে রাসূলও ছিলেন। তাঁদের মাঝ থেকে ছয়জন ছিলেন অধিক মর্যাদাবান।

তাঁদেরকে ‘**উলুল্ আযম**’ পয়গম্বর বলা হয়। তাঁরা হলেন, **হযরত আদম, হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা, হযরত ঈসা** আলাইহিমুস্ সালাম **ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

পয়গম্বরদের মাঝ থেকে ত্রিশ জনের নাম মশহুর হয়েছে। তাঁরা হলেন: **হযরত আদম, হযরত ইদ্রিস, হযরত শিত বা শীশ, হযরত নূহ, হযরত হূদ, হযরত সালিহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত লূত, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব, হযরত ইউসুফ, হযরত আইয়ুব, হযরত শুয়াইব, হযরত মূসা, হযরত হারুন, হযরত খিজির, হযরত ইউসা বিন নূন, হযরত ইলিয়াস, হযরত এলিয়াসা, হযরত যুল-কিফিল, হযরত শামুন, হযরত ইশমইল, হযরত ইউনুস বিন মাত্তা, হযরত দাউদ, হযরত সুলায়মান, হযরত লোকমান, হযরত যাকারিয়্যা, হযরত ইয়াহিয়া, হযরত উযাইর, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম, হযরত যুল-কারনাইন** আলাইহিমুস্ সালাম **ও হযরত মুহাম্মদ** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

উপরোক্ত পয়গম্বরদের মধ্য থেকে আটাশ জনের নাম কুরআন করীমে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত যুল-কারনাইন, হযরত লোকমান, হযরত উযাইর ও হযরত খিজির আলাইহিমুস্ সালাম পয়গম্বর ছিলেন কিনা, এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। উরওয়াতুল উসকা হযরত **মোহাম্মদ মাসুম** কুদ্দিসা সিররুহু’এর ‘**মাকতুবাত-ই মাসুমিয়্যা**’র দ্বিতীয় খণ্ডের ছত্রিশতম মাকতুবে, হযরত খিজির আলাইহিস্ সালামের পয়গম্বর হওয়ার ব্যাপারে শক্তিশালী খবর রয়েছে বলে উল্লেখ আছে। একশ বিরাশিতম মাকতুবে, হযরত খিজির আলাইহিস্ সালামের মানুষ রূপে দৃশ্যমান হওয়া ও কিছুকিছু কাজকর্ম সম্পাদন করা প্রমাণ করে না যে তিনি এখনো দুনিয়ার হায়াত ধারণকারী। তিনি এবং তাঁর মত একাধিক পয়গম্বর ও আওলিয়াদের রূহসমূহকে আল্লাহ্ তা’আলার পক্ষ থেকে মানুষের রূপ ধারণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাই তাঁদের দৃশ্যমান হওয়া তাঁদের দুনিয়াবী হায়াতের বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে দলিল হবে না। জুলকিফিল্ আলাইহিস্ সালামের অপর নাম হারকিল। তাঁকে কেউ ইলিয়াস, কেউ ইদরিস্ কেউবা যাকারিয়্যা আলাইহিস্ সালাম বলেও অভিহিত করেছেন।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম হলেন ‘খলীলুল্লাহ’। কেননা তাঁর ক্বাল্‌বে আল্লাহ্ তা’আলার ভালোবাসা ব্যতীত কোন মাখলুকের ভালোবাসা ছিল না। হযরত মূসা আলাইহিস্ সাল্লাম হলেন ‘কলীমুল্লাহ’। কেননা তিনি আল্লাহ্ তা’আলার সাথে কথা বলে ছিলেন। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম হলেন ‘কালিমাতুল্লাহ’। কারণ তাঁর বাবা ছিল না। শুধুমাত্র ‘কুন্’ (হও) ইলাহী কালিমার দ্বারা মায়ের মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাছাড়াও তিনি আল্লাহ্ তা’আলার হিকমতপূর্ণ কালিমাসমূহকে ওয়াজ করে মানুষের কানে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

বনী আদমের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাধিক গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী এবং সমস্ত মাখলুকের সৃষ্টির সবব্ তথা কারণ হযরত **মুহাম্মদ** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন ‘হাবীবুল্লাহ’। তাঁর হাবীবুল্লাহ হওয়ার প্রমাণকারী এবং তাঁর গুরুত্ব, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি নির্দেশকারী বহু জিনিস রয়েছে। তাই তাঁর ব্যাপারে পরাজিত হয়েছে, পর্যুদস্ত হয়েছে এরূপ ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়। কিয়ামতের দিবসে তিনিই সর্বপ্রথম কবর থেকে জাগবেন। হাশরের ময়দানেও সবার আগে উপস্থিত হবেন। আর জান্নাতেও সর্বপ্রথম তিনি প্রবেশ করবেন। তাঁর মুজিযাসমূহ অগণিত, মানুষের পক্ষে তা গুণে শেষ করা সম্ভব নয়। তথাপি মিরাজ মুজিযার বিষয়টি উল্লেখ করত এই লেখাটিকে সাঁজানোর চেষ্টা করছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শায়িত অবস্থা থেকে জাগিয়ে, তাঁর মুবারক শরীর সহ তাঁকে পবিত্র মক্কা নগরী থেকে কুদুস্ শহরে অবস্থিত মসজিদে আকসায়, সেখান থেকে আসমানসমূহ পার করে সর্বশেষ সপ্তম আসমানে এবং সেখান থেকে আল্লাহ্ তা’আলা যেসব স্থানে চেয়েছেন সেসব স্থানে ভ্রমণ করানো হয়েছে। এভাবেই মিরাজের বিষয়টি বিশ্বাস করা উচিত। [‘ইসমাঈলী’ নামক ভ্রান্ত ফিরকার অনুসারীরা ও ইসলামের আলেম রূপধারণকারী দ্বীনের দুশমনেরা প্রচার করে যে, মিরাজ একটি অবস্থার নাম যা রূহের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছিল। রাসূল শরীর সহ মিরাজে যাননি, এই বলে যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এই ধরণের ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচারকারী বইসমূহ পড়া ও এর দ্বারা প্ররোচিত হওয়া উচিত নয়। মিরাজ কিভাবে সংঘটিত

হয়েছে তা বহু মূল্যবান কিতাবে বর্নিত হয়েছে, যেমন '**শিফা-ই শরীফে**'[8] বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, '**সা'আদাত-ই আবাদিয়্যা**' কিতাবেও দীর্ঘ বর্ননা রয়েছে।] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা-ই মুকাররমা থেকে '**সিদরাতুল মুনতাহা**' পর্যন্ত হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের সাথে ভ্রমণ করেছেন। **সিদরাতুল মুনতাহা** হল সপ্তম আসমানে অবস্থিত একটি বৃক্ষের নাম, সমস্ত তথ্য ও উত্থানসমূহ যাকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। রাসূল-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদরাতুল মুনতাহাতে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে ছয়শত ডানা সহ তাঁর আপন রূপে দেখেছেন। এই পর্যন্ত এসে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম থেমে যান। মক্কা-ই মুকাররমা থেকে কুদুস শরীফ পর্যন্ত কিংবা সপ্তম আসমান পর্যন্ত 'বুরাক'এর দ্বারা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। **বুরাক** হল গাধার চেয়ে বড় কিন্তু ঘোড়ার চেয়ে ছোট জান্নাতী এক পশু। তা দুনিয়ার পশুদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তা পুরুষও নয় স্ত্রীও নয়। অতি দ্রুত গতিসম্পন্ন। এক পলকে দৃষ্টি সীমা অতিক্রম করতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **মসজিদে আকসা**য় পয়গম্বরদের জামাতের ইমাম হয়ে এশার কিংবা ফজরের নামাজ আদায় করেছেন। পয়গম্বর আলাইহিস্ সালামদের রূহসমূহ নিজ নিজ ইনসানী রূপ ধারণ করে ঐ জামাতে উপস্থিত ছিল। **কুদুস** থেকে সপ্তম আসমান পর্যন্ত **মিরাজ** নামক অজানা এক সিঁড়ির মাধ্যমে মুহুর্তের মধ্যে পৌঁছে দেয়া হয়েছিল। পথে ফেরেশতাগণ ডানে বামে সারিবদ্ধ হয়ে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুরুদ ও ছানা পেশ করতে ছিল। প্রত্যেক আসমান অতিক্রম করার সময় জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তশরীফ ফরমানের ঘোষণা ও সুসংবাদ প্রদান করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক আসমানে এক একজন পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাৎ করে সালাম বিনিময় করেছেন। **সিদরাতুল মুনতাহা**য় বহু আশ্চর্যজনক জিনিস দেখতে পেয়েছেন। জান্নাতের নিয়ামতসমূহ ও জাহান্নামের আজাবসমূহ অবলোকন

[8] শিফা'এর রচয়িতা কাজী ইয়াদ মালকিী, ৫৪৪ হজিরী (১১৫০ খৃস্টাব্দে) মাররাকুস নগরীতে ইনতকিাল করেন।

করেছেন। মহান আল্লাহ্ পাকের জামাল তথা সৌন্দর্য দর্শনের তীব্র আকাঙ্খার কারণে জান্নাতের নিয়ামতসমূহের কোনটির প্রতি দৃষ্টি দেননি। সেখান থেকে তিনি একাকী নূরের মধ্য দিয়ে সামনে অগ্রসর হয়েছেন। এসময় ফেরেশতাদের কলমের আওয়াজ শ্রবণ করেছেন। তিনি এভাবে সত্তর হাজার পর্দা অতিক্রম করেছেন, যার দুইটি পর্দার মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচ হাজার বছরের পথের সমান। এরপর সূর্যের চেয়েও অধিকতর উজ্জ্বল **রফ্রফ্** নামক মাদুরে চড়ে ইলাহী আরশে পৌঁছেছেন। আরশ থেকে জামান, মাকান ও বস্তু জগতের উর্দ্ধে গিয়ে মহান আল্লাহ্ তা'আলার কালাম শ্রবণের মাকামে উপনীত হয়েছেন।

স্থানহীন ও কালহীন ভাবে আখিরাতে যেমন মহান আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন লাভ করা যাবে, তেমনি অবোধ্য ও অবর্ননীয় উপায়ে তিনি আল্লাহ্ পাকের দিদার লাভ করেছেন। বর্ণহীন ও আওয়াজহীন উপায়ে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলেছেন। মহান আল্লাহ্র দরবারে তাসবীহ, হামদ ও ছানা পেশ করেছেন। নিজে অগণিত নিয়ামত, অনুগ্রহ এবং সীমাহীন মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছেন। সেখানেই নিজের ও উম্মতের জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের আদেশ প্রাপ্ত হন, যা পরবর্তীতে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের পরামর্শে ধাপে ধাপে ফিরে পাঁচ ওয়াক্ত পর্যন্ত কমিয়ে এনেছেন। ইতিপূর্বে কেবল ফজর ও আছরের কিংবা এশার নামাজ আদায় করা হত। এত সুদীর্ঘ ভ্রমণ ও সীমাহীন ইকরাম, ইহসান প্রাপ্তির পরে এবং আশ্চর্যজনক বহু কিছু দেখে ও শুনে ফিরার পরে যখন তিনি নিজ বিছানায় আসলেন, দেখলেন যে বিছানা তখনও উষ্ণ রয়েছে। মিরাজ সম্পর্কিত ঘটনার কিছু অংশ আয়াত-ই করীমার দ্বারা আর বাকী অংশ হাদিস শরীফের দ্বারা জানানো হয়েছে। এর সব অংশের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব না হলেও, আহলি সুন্নাত আলেমদের থেকে আসা এ সংক্রান্ত খবর সমূহকে গ্রহণ না করলে, আহলি সুন্নাত থেকে বিচ্যুত হতে হবে। আর সরাসরি আয়াত-ই করীমা ও সহীহ হাদিস শরীফকে অবিশ্বাস করলে কুফুরী হবে।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন '**সাইয়্যেদুল আনবিয়া**', অর্থাৎ সমস্ত পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালাওয়াতুত্ তাসলিমাত্দের

মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠজন। এর পক্ষে অসংখ্য দলিল রয়েছে, যার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে:

কিয়ামতের দিবসে সমস্ত পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালাওয়াতুত্ তাসলিমাত্গণ তাঁর ঝাণ্ডার নিচে আশ্রয় গ্রহণ করবেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সমস্ত পয়গম্বরগণকে এই বলে আদেশ দিয়েছেন যে, "আমার মাখলুকের মাঝ থেকে নির্বাচিত, সর্বাধিক প্রিয় আমার হাবীব মুহাম্মদ আলাইহিস্ সালামের নবুয়্যতের যুগে যদি উপস্থিত হও তবে তাঁর উপর ঈমান আনো এবং তাঁর সাহায্যকারী হয়ে যাও"। সমস্ত পয়গম্বরগণও নিজ নিজ উম্মতকে তা অসিয়্যত করে গেছেন, আদেশ দিয়ে গেছেন।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন '**খাতামুল আনবিয়া**'। অর্থাৎ তাঁর পরে আর কোন পয়গম্বর আসবেন না। তাঁর মুবারক রূহকে, সকল পয়গম্বরের পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। নবুয়্যতের মাকামেও তাঁকেই সর্বপ্রথম স্থান দেয়া হয়েছে। আর তাঁর দুনিয়ায় আগমনের মাধ্যমে নবুয়্যতের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়েছে। হযরত ঈসা আলাইহিমুস্ সালাম, যদিও কিয়ামতের আগে, হযরত মেহদী'র জামানায় আসমান থেকে 'শাম'এ অবতরণ করবেন, তথাপি তিনি জমিনে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীনকেই প্রচার করবেন এবং তাঁর উম্মতেরই একজন হিসেবে বিবেচিত হবেন।

[১২৯৬ হিজরীতে ও ১৮৮০ খৃস্টাব্দে, হিন্দুস্তানে ইংরেজরা '**কাদিয়ানী**' নামক এক বাতিল ফিরকার উদ্ভব করে। তারা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে মিথ্যা ও কুৎসিত ধারণা পোষণ করে। নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে মূলত ভিতর থেকে ইসলামের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা চালায়। তারা যে অমুসলিম, এ ব্যাপারে ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে। এদেরকে '**আহমাদিয়্যা**' নামেও অবিহিত করা হয়।

হিন্দুস্তানে প্রকাশ পাওয়া আহলে বিদায়াত ও জিনদিক ফিরকাসমূহের আরেকটি হল '**জামায়াতুত তাবলিগীইয়্যা**'। যা ১৩৪৫ হিজরীতে (১৯২৬ খৃস্টাব্দে) ইলিয়াস নামের এক জাহিল প্রতিষ্ঠা করেছে। তার বক্তব্য ছিল, 'মুসলমানরা দালালাতে পতিত হয়েছে, তাদেরকে রক্ষার জন্য স্বপ্নে আদিষ্ট

হয়েছি’। তাদের গুরুগণ ভ্রষ্ট নাজির হুসাইন, রশিদ আহম্মদ গাঙ্গুহি ও হালিল আহম্মদ শাহরানপুরীর কিতাবসমূহ থেকে শিখেছে বলে দাবী করত। মুসলমানদেরকে প্রতারিত করার জন্য, সর্বদা নামাজ ও জামাতের গুরুত্বের ব্যাপারে আলোচনা করে। অথচ, আহলি বিদায়াতের অর্থাৎ ‘**আহলি সুন্নাতের**’ মাজহাবের অনুসারী নয় এমন কারো নামাজসমূহ ও অন্যান্য ইবাদতের কিছুই কবুল হয় না। তাই তাদের উচিত, আহলে সুন্নাতের কিতাবসমূহ পড়ে প্রথমে বিদায়াতী আক্বীদা থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত মুসলমান হওয়া। কুরআন করীমে, স্পষ্ট নয় এমন আয়াতে করীমার ভুল অর্থ প্রদানকারীদের **আহলি বিদায়াত** বা **ভ্রষ্ট** বলা হয়। নিজের ভ্রান্ত মতবাদ ও অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থের উদ্দেশ্যে আয়াতে করীমার ভুল ব্যাখ্যা প্রদানকারী ইসলামের দুশমনদেরকে **জিনদিক** বলা হয়। জিনদিকরা পবিত্র কুরআন করীম ও ইসলামিয়্যাতকে পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা চালিয়া যাচ্ছে। এদেরকে লালন পালনকারী ও দুনিয়ার সর্বত্র প্রচারের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ প্রদানকারী, সবচেয়ে বড় দুশমন হল ইংরেজ। এই ইংরেজ কাফিরদের ফাঁদে পা দেয়া জাহিল ফিরকা হল **জামায়াতুত-তাবলীগিয়্যা**, যারা নিজেদেরকে **আহলি সুন্নাত** দাবী করে নামাজ আদায় করে মিথ্যা বলছে, মুসলমানদেরকে প্রতারিত করছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, “দ্বীন না থাকা সত্ত্বেও নামাজ আদায়কারীদের দেখা মিলবে”। এরা জাহান্নামের পাদদেশে চিরকাল আযাব ভোগ করবে। তাদের এক অংশ, মিনারের চূড়ায় থাকা বকের বাসার মত বড় পাগড়ী, দাড়ি ও জুব্বাসহ আয়াতে করীমা পড়ে, এর ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মুসলমানদেরকে প্রতারিত করে। অথচ হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, “**ইন্নাল্লাহা লা ইয়ানজুরু ইলা সুওয়ারিকুম ওয়া সিয়াবিকুম ওলাকিন ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া নিয়্যাতিকুম**”, (আল্লাহ্ তা’আলা তোমাদের বাহ্যিক রূপ ও পোশাক দেখেন না বরং তিনি তোমাদের ক্বালব ও নিয়্যাতের প্রতি লক্ষ্য করেন)। পঙক্তি:

কাদ্দ-ই বুলন্দ দারদ, দাস্তার পারা পারা,
চূন আশিয়ান-ই লকলক, বার কাল্লা-ই মিনারা।

এই জাহিলদের, আহমাকদের আকর্ষনীয় বক্তব্যগুলি যে মিথ্যা, তা প্রমাণকারী ‘**হাক্বীকাত কিতাবএভি**’ এর কিতাবসমূহের জবাব দিতে অপারগ

হওয়ায় এই বলে প্রচার করে যে, 'হাক্বীকাত কিতাবএভির কিতাবসমূহ ভুল, ভ্রান্তিতে পূর্ণ। এই কিতাবসমূহ পড়া থেকে বিরত থাকুন'। ইসলামের দুশমন ভণ্ড ও জিনদিকদের সবচেয়ে বড় আলামত হল, আহলি সুন্নাত আলেমদের দ্বারা লিখিত ও প্রকাশিত হাকিকী দ্বীন কিতাবসমূহকে ভুল আখ্যা দেয়া, তা পড়তে বারণ করা। তাদের দ্বারা ইসলামের যে ক্ষতি হয়েছে ও তাদের বিপক্ষে আহলি সুন্নাত আলেমদের প্রদত্ত জবাবসমূহ '**মা'লুমাতুন-নাফিয়া**' নামক কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ননা করা হয়েছে।]

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর ও সমস্ত জগতের জন্য রহমত। আঠার হাজার আলম তথা জগত তাঁর রহমতের দরিয়া থেকে উপকৃত হচ্ছে। অনস্বীকার্যভাবে তিনি সমস্ত মানব ও জ্বিনের জন্য পয়গম্বর। এমনকি ফেরেশতাগণ, উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল সহ সকল জড়ের জন্যও তিনি পয়গম্বর। এ ব্যাপারে বহু মুবারক ব্যাক্তি খবর প্রদান করেছেন। অন্যান্য পয়গম্বরগণ নির্দিষ্ট কোন এলাকায়, নির্দিষ্ট কোন জাতি কিংবা গোত্রের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। আর রাসূল-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সমস্ত জগতের জন্য, জড় ও জীব সমস্ত মাখলুকের জন্য পয়গম্বর। মহান আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য পয়গম্বরদের ক্ষেত্রে সরাসরি নাম ধরে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, ওহে আমার রাসূল! ওহে আমার পয়গম্বর! বলে সম্বোধন করে মর্যাদা প্রদান করেছেন, সম্মানিত করেছেন। অন্যান্য পয়গম্বর আলাইহিস্ সালামদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে দেয়া সকল মুজিযার অনুরূপ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও ইহসান করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এত বেশি সম্মান দিয়েছেন, এত বেশি ইকরাম করেছেন, এত বেশি মুজিযা প্রদান করেছেন যে, অন্য কোন পয়গম্বরকে অনুরূপ প্রদান করেননি। হযরত পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদের দ্বিখণ্ডিত হওয়া, মুবারক হাতের তালুতে নেয়া পাথরগুলির তাসবীহ্ করা, বৃক্ষরাজির 'ইয়া রাসূলুল্লাহ!' বলে তাঁকে সালাম প্রদান করা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচ্ছেদের কারণে '**হান্নানা**' নামক শুঁকনো কাঠের শব্দ করে ক্রন্দন করা, রাসূলের মুবারক আঙ্গুলগুলি থেকে সুপেয় পানির প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদির

মত মুজিযার দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে। আখিরাতে তাঁকে '**মাকাম-ই মাহমুদ**', '**শাফায়াত-ই কুবরা**', '**হাউজ-উ কাওসার**', '**উসিলা**' ও '**ফাদিলা**' নামক মাকামসমূহ প্রদান করে এবং জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই 'জামাল-ই ইলাহী'এর দর্শনের দ্বারা মহিমান্বিত করা হয়েছে। আর দুনিয়াতে উত্তম চরিত্র, অকাট্য দ্বীন, ইলম, হিলম্, সবর, শুকরিয়া, তাকওয়া, সম্মান, মর্যাদা, লাজুকতা, সাহসিকতা, বিনয়, হিকমত, আদব, সৎকর্মশীলতা, দয়া, করুণা, মমতা ও আরো বহু ধরণের বিশেষণে বিশেষিত করে সকল পয়গম্বরের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। তাঁকে অগণিত মুজিযা প্রদান করা হয়েছে। তাঁর আনীত দ্বীন পূর্বের যাবতীয় দ্বীনকে রহিত করেছে। যা পরিপূর্ণ, সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছে। তাঁর উম্মত অন্যান্য সকল উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েছে। তাঁর উম্মতের আওলিয়াগন অন্যান্য উম্মতের আওলিয়াদের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান হয়েছেন।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের আওলিয়াদের মাঝে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফা হওয়ার যোগ্যতা অর্জনকারী, তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) খেলাফতের ব্যাপারে সর্বাধিক উপযুক্ত, ইমাম ও ওলীদের মাথার তাজ হলেন হযরত **আবুবকর সিদ্দীক** রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি পয়গম্বরদের পরে এপর্যন্ত যত মানুষ এই দুনিয়ায় এসেছেন এবং আসবেন তাদের মাঝে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ জন। খিলাফতের মর্যাদা ও দ্বায়িত্বভারও তাই তিনিই সর্বপ্রথম অর্জন করেন। ইসলাম প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেও তিনি মহান আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও ইহসানের কারণে, মূর্তির পূজা করেননি। কুফুরী ও ভ্রষ্টতার পঙ্কিলতা থেকে মহান আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। [আর যারা মনে করে ও প্রচার করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়্যত লাভের পূর্বে মূর্তি পূজা করেছিলেন, তারা কতটা মূর্খ এ থেকেও তা বুঝা যায়।]

তাঁর পরের শ্রেষ্ঠ মানব হলেন 'ফারুক-ই আযম' হযরত **উমর ইবনে খাত্তাব** রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীবের সঙ্গী হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং যিনি দ্বিতীয় খলীফা হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করেছেন।

উনার পরের শ্রেষ্ঠজন হলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তৃতীয় খলীফা, পুণ্য ও ইহসানের ভাণ্ডার এবং ঈমান, হায়া ও

ইরফানের উৎস, জিন্নুরাইন হযরত **উসমান ইবনে আফফান** রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

তাঁর পর সর্বোত্তম মানুষ হলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চতুর্থ খলীফা হিসেবে দ্বায়িত্ব পালনকারী, যিনি আশ্চর্যজনক প্রতিভার অধিকারী ও 'আল্লাহ্র সিংহ' উপাধি অর্জনকারী, হযরত **আলী ইবনে আবি তালিব** রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

উনার পরে হযরত **হাসান ইবনে আলী** রাদিয়াল্লাহু আনহুম খলিফা হয়েছেন। হাদিস শরীফে খেলাফতের সীমা ত্রিশ বছর উল্লেখ করা হয়েছে, যা হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে[৭]। তাঁর পরে শ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখের মনি হযরত **হুসাইন ইবনে আলী** রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম আজমাইন।

তাঁদের এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হল অধিক সওয়াব অর্জন করা, দ্বীন-ই ইসলামের জন্য মাতৃভূমি, প্রিয়জন ইত্যাদি ত্যাগ করতে পারা, শুরুর দিকে মুসলমান হওয়া, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বোচ্চ অনুসরণ করা, তাঁর সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা, দ্বীন প্রচারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, ফিতনা-ফাসাদ্ ও কুফুরীর প্রতিরোধ করা।

যদিও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত অন্য সবার আগে মুসলমান হয়েছেন কিন্তু তিনি ঐ সময় মাল-সম্পদহীন বালক হওয়ায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে রাসূলের খেদমতে নিয়োজিত থাকায়, শুরুতেই তাঁর ঈমান গ্রহণ অন্যদের ঈমান গ্রহণে উদ্‌ভুদ্ধ করার ও কাফিরদের মনোবল ধ্বংসের কারণ হতে পারেননি। অথচ অন্য তিন খলিফার ঈমান গ্রহণ, ইসলামের শক্তিকে বৃদ্ধ করেছিল। ইমাম আলী ও তাঁর সন্তানগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটাত্মীয় হওয়ায় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক রক্ত ধারণ করায়, সিদ্দীক-ই আকবর ও ফারুক-ই আজমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে তাঁদের

---

[৭] হাসান ইবনে আলী ৪৯ হজিরীতে (৬৬৯ খৃস্টাব্দে) মদনিা-ই মুনাওয়ারাতে বষিক্রয়িায় আক্রান্ত হয়ে ইনতকিাল করছেনে।

এই শ্রেষ্ঠত্ব সর্ববিবেচনায় নয়। এই শ্রেষ্ঠত্ব সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এটা খিজির আলাইহিস্ সালাম যেমন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে কিছু বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার অনুরূপ। [রক্তের সম্পর্কের দিক থেকে যে যত তাঁর নিকটের, ততই শ্রেষ্ঠ হলে হযরত আব্বাস, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে শ্রেষ্ঠ হতেন।

একারণেই আবু তালেব ও আবু লাহাব, মুমিনদের সর্বনিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তির চেয়েও বহুগুণে অধম।] রক্তের সম্পর্কের দিক থেকে হযরত **ফাতেমা**, হযরত **খাদিজা** ও হযরত **আয়েশা** রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না থেকে অধিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। তবে এই বিবেচনার শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব বিবেচনার শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠা করে না। এই তিনজন মহীয়সী নারীর মাঝে কে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ সে ব্যাপারে আলেমগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হাদিস শরীফ থেকে বুঝা যায় যে, দুনিয়ার নারীদের মাঝে সর্বোত্তম হলেন হযরত ফাতিমা, হযরত খাদিজা, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না এবং হযরত **মরিয়ম** ও হযরত **আছিয়া** আলাইহুমাস্ সালাম। হাদিস শরীফে এসেছে, "**হযরত ফাতিমা** (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) **জান্নাতী মহিলাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। আর হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন** (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) **হলেন জান্নাতী যুবকদের মাঝে শ্রেষ্ঠ**"।

উনাদের পরে, আসহাবে কিরামের মাঝে অধিক মর্যাদাবান হলেন '**আশারা-ই মুবাশশারা**'এর অন্তর্ভুক্ত সাহাবীগণ। এর মানে হল, যারা দুনিয়াতে থাকা অবস্থাতেই জান্নাত প্রাপ্তির সুসংবাদ পেয়েছিলেন। তাঁদের সংখ্যা দশ। উনাদের পরে অধিক মর্যাদার অধিকারী হলেন বদরের জিহাদে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ। এরপর পর্যায়ক্রমে উহুদের জিহাদে অংশগ্রহণকারীগণ ও যারা '**বিয়াতুর রিদওয়ান**'এ (হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়) উপস্থিত ছিলেন সেসকল সাহাবীগণ অধিক মর্যাদাবান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নিজেদের জান ও মাল উতসর্গ করেছেন, তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন যে আসহাবে কিরাম, তাঁদের প্রত্যেককে যথাযথ সম্মান ও ভালোবাসার সাথে স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য। তাঁদের অসম্মান হয় এমন কোন কথা বা আচরণ করা আমাদের জন্য

কখনোই জায়েজ হবে না। তাঁদের নামসমূহকে অমর্যাদা করা, তাচ্ছিল্য করা দালালাত বা পথভ্রষ্টতার শামিল।

যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসেন, তাদের উপর রাসূলের প্রত্যেক সাহাবীকে ভালোবাসাও আবশ্যক। কেননা একটি হাদিস শরীফে এসেছে যে, "**আমার সাহাবীদের যারা ভালোবাসল তারা আমাকে ভালবাসে বলেই এরূপ করল। যারা তাঁদেরকে ভালোবাসল না, তারা আমাকেও ভালোবাসল না। তাঁদের কাউকে কষ্ট দেয়া আমাকে কষ্ট দেয়ার শামিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে মূলত আল্লাহ্ তা'আলাকে কষ্ট দিল। আল্লাহ্ তা'আলাকে যে কষ্ট দিল সে অবশ্যই আজাব ভোগ করবে**"। অপর আরেকটি হাদিস শরীফে বলা হয়েছে যে, "**মহান আল্লাহ্ তা'আলা যখন আমার উম্মত থেকে কারো জন্য কল্যাণ করতে ইরাদা করেন, তখন তার ক্বালবে আমার সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসা পয়দা করে দেন। সে প্রত্যেক সাহাবীকে নিজের জানের মত ভালোবাসে**"।

একারণেই, আসহাবে কিরামদের মাঝে যে সংঘর্ষ হয়েছে; তা অসৎ উদ্দেশ্যে বা খেলাফত দখলের উদ্দেশ্যে কিংবা নাফসের বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে হয়েছে বলে মনে করা উচিত নয়। এরূপ ভাবা এবং এ কারণে তাঁদেরকে কটাক্ষ করা মুনাফেকীর পরিচায়ক, যা ব্যক্তিকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। কেননা তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সালামের সরাসরি সান্নিধ্য লাভের ও তাঁর মুবারক কথা শ্রবণ করার কারণে, তা'আসসুব [অর্থাৎ, জেদ ও অসহনসীলতা] এবং পদের লোভ ও দুনিয়ার আসক্তি তাঁদের প্রত্যেকের ক্বালব থেকে মুছে গিয়েছিল। হিরস্ [অতৃপ্তি, আসক্তি], হিংসা ও মন্দ আচরণ থেকে তাঁরা মুক্ত ছিল, পবিত্র ছিল। ঐ মহান পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের আওলিয়ার থেকে কোন একজনের সান্নিধ্যে কয়েক দিন অতিবাহিত করার কারণে যদি কোন ব্যক্তি, ঐ ওলীর সুন্দর বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উন্নত আখলাকের দ্বারা উপকৃত হয়, আত্মশুদ্ধি লাভ করে ও দুনিয়ার আসক্তি থেকে মুক্তি পায় তবে আসহাবে কিরামগণ, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবকিছুর চেয়ে বেশী ভালোবাসতেন, রাসূলের জন্য নিজের জান, মাল উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁর জন্য মাতৃভূমি ত্যাগ করেছিলেন তাঁরা, রূহের ক্ষুধা মিটায় রাসূলের এমন সোহবতের আশিক হওয়া সত্ত্বেও, মন্দ স্বভাব

থেকে পরিত্রাণ পায়নি, নাফসসমূহকে সংশোধন করতে পারেনি, ক্ষণিকের এই দুনিয়া উপভোগের জন্য পরস্পর লড়াই করেছে, তা কিভাবে চিন্তা করা সম্ভব? ঐ মহান ব্যক্তিগণের মন, অবশ্যই অন্য সকলের চেয়ে অধিক পরিষ্কার ছিল। তাঁদের মাঝের মতানৈক্য ও দ্বন্দকে, আমাদের মত নষ্ট নিয়্যাতের অধিকারীদের সাথে তুলনা দেয়া, দুনিয়ার জন্য ও নাফসের কুবাসনা চরিতার্থের জন্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে বলে দাবী করা কি সংগতিপূর্ণ হবে? আসহাব-ই কিরামদের ব্যাপারে এরূপ কুৎসিত ধারণা পোষণ করা জায়েজ নয়। যারা এরূপ বলে, তারা কি কখনো এটি খেয়াল করে না যে, আসহাব-ই কিরামের সাথে দুশমনি করা প্রকারন্তরে তাঁদের দীক্ষা দানকারী ও পরিচর্যাকারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দুশমনি করার শামিল হয়। তাঁদের নিন্দা করা প্রকারন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিন্দার সমতুল্য। একারণেই বুজুর্গ দ্বীন আলেমগণ বলেছেন যে, ‘যারা আসহাব-ই কিরামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানে না, তাঁদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে না তারা মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিই ঈমান আনল না’। উষ্ট্রী ও সিফফিনের যুদ্ধ, কোনোভাবেই তাঁদের সমালোচনার কোন সবব হতে পারে না। এই যুদ্ধগুলিতে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহুর বিরুদ্ধে যারা অবস্থান নিয়েছেন তাঁদের সকলকে সমালোচনা থেকে পরিত্রাণের জন্য, এমনকি সওয়াব অর্জনের মাধ্যম হওয়ার মত দ্বীনী সবব বিদ্যমান রয়েছে। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে যে, **“ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মুজতাহিদের জন্য একটি সওয়াব আর সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য দুইটি অথবা দশটি সওয়াব রয়েছে। দুইটি সওয়াবের প্রথমটি ইজতিহাদের জন্য আর দ্বিতীয়টি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য”**। দ্বীনের বুজুর্গ ব্যক্তিদের মাঝের এই দ্বন্দ ও সংঘাত, জেদের কারণে বা শত্রুতার কারণে নয়। ইজতিহাদের ভিন্নতার কারণে হয়েছিল। ইসলামিয়্যাতের আদেশসমূহকে যথাযথভাবে প্রয়োগের ইচ্ছার কারণে হয়েছিল। আসহাব-ই কিরামের প্রত্যেকেই মুজতাহিদ ছিলেন। [উদাহরণস্বরূপ, হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহুর মুজতাহিদ হওয়ার ব্যাপারে, ‘হাদিকা’ কিতাবের দুইশত আটানব্বইতম পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হাদিস শরীফ দ্বারা অবহিত করা হয়েছে।]

প্রত্যেক মুজতাহিদের জন্য, আপন ইজতিহাদ অনুযায়ী যে হুকুম বা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তদনুযায়ী আমল করা ফরজ। নিজের ইজতিহাদ, যদিও বা নিজের চেয়ে বড় কোন মুজতাহিদের ইজতিহাদের অনুরূপ নাও হয়, তবুও তার উপর নিজের ইজতিহাদের উপর আমল করা আবশ্যক। অন্য কারো ইজতিহাদের অনুসরণ করা জায়েজ নয়। ইমাম আজম হযরত আবু হানিফার[10] তালাবা হযরত আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ শায়বানী এবং ইমাম মুহাম্মদ শাফিঈ[11] এর তালাবা আবু সাওর ও ইসমাঈল মুজানী বহু ক্ষেত্রে আপন উস্তাদদের অনুসরণ করেননি। উস্তাদদের **হারাম** হিসেবে বিবেচিত করা কিছু জিনিসকে **হালাল** হিসেবে হুকুম দিয়েছেন। আবার হালাল হিসেবে বিবেচিত কিছু জিনিসকে হারাম ঘোষণা করেছেন। এর উপর ভিত্তি করে, তাঁরা গুনাহের কাজ করেছেন, পাপী হয়েছেন বলা সম্ভব নয়। ইতিহাসে এরূপ বক্তব্য প্রদানকারী কারো হদিস পাওয়া যায়নি। কেননা, তাঁরাও তাঁদের উস্তাদদের মত মুজতাহিদ ছিলেন।

হ্যাঁ, বস্তুত হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত মুয়াবিয়া ও হযরত আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার থেকে অধিক জ্ঞানী ও অধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। উনাদের তুলনায় নিজের মাঝে বহু শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। তাঁর ইজতিহাদও ঐ দুইজনের ইজতিহাদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য ছিল। তথাপি প্রত্যেক সাহাবীই মুজতাহিদ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায়, দুইজনেরই এই মহান ইমামের ইজতিহাদকে অনুসরণ করা জায়েজ হত না। তাঁদের উপর আপন ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক ছিল।

সওয়াল: জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধে, মুহাজির ও আনসারের মাঝ থেকে বহু সাহাবী ইমাম আলীর পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। তাঁর আনুগত্য করেছিল। তাঁর অনুসরণ করেছিল। তাঁদের প্রত্যেকেই মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও, ইমাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুসরণকে আবশ্যক মনে করেছিল। এর থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম আলীর আনুগত্য করা মুজতাহিদদের উপরও

[10] আবু হানফিা নুমান বনি সাবতি, ১৫০ হজিরীতে (৭৬৭ খৃস্টাব্দে) বাগদাদে ইনতকিাল করনে।

[11] মুহাম্মদ বনি ইদ্রীস শাফঈি, ২০৪ হজিরীতে (৮২০ খৃস্টাব্দে) মসিরে ইনতকিাল করছেনে।

ওয়াজিব ছিল। কেউ যদি এরূপ বলে, আপন ইজতিহাদ না মিললেও তাঁর পক্ষে অবস্থান নেয়া আবশ্যক ছিল:

জবাব: হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে যারা অনুসরণ করেছিল, তাঁর পক্ষে যারা যুদ্ধ করেছিল, তাঁরা তাঁর ইজতিহাদের উপর আমল করার জন্য তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেননি। বরং নিজেদের ইজতিহাদও ইমামের ইজতিহাদের অনুরূপ হওয়ায়, তাঁদের ইজতিহাদই ইমাম আলীর আনুগত্যকে ওয়াজিব বিবেচনা করেছে। একইভাবে, মহান আসহাবে কিরামের অনেকের ইজতিহাদ, ইমাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইজতিহাদের সাথে মিলেনি। তাঁদের ইজতিহাদ অনুযায়ী, এই মহান ইমামের বিপক্ষে যুদ্ধ করা আবশ্যক ছিল। ঐ সময়ে আসহাব-ই কিরামের ইজতিহাদের হুকুম তিন ধরণের হয়েছিল। এক দল, ইমাম আলীর ইজতিহাদকে হক্ক হিসেবে বুঝতে পারল। তাঁদের উপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর আনুগত্য করা ওয়াজিব ছিল। আরেক দল, তাঁর বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণাকারীদের ইজতিহাদকে হক্ক হিসেবে দেখতে পেল। তাঁদের উপর হযরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়েছিল। আর তৃতীয় দলের ইজতিহাদ ছিল, কোন পক্ষেরই অনুসরণ না করা, পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া আবশ্যক। তাঁদের এই ইজতিহাদ, যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়াকে ওয়াজিব করেছিল। তিনদলই, হক্কের উপর ছিল ও সওয়াব অর্জন করেছিল।

সওয়াল: উপরের বক্তব্য, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছেন তাদের ইজতিহাদকেও হক্ক হিসেবে বিবেচনা করছে। অথচ, আহলি সুন্নাত আলেমদের মতে, ইমাম আলীর ইজতিহাদ হক্ক ছিল, তাঁর বিরোধীদের ইজতিহাদে ভুল ছিল, যেহেতু শরয়ী উজর ছিল তাই তাঁরা ক্ষমা প্রাপ্ত হয়েছেন অথবা এজন্য সওয়াবও অর্জন করেছেন। এর ব্যাখ্যা কি?

জবাব: ইমাম শাফিঈ ও হযরত উমর বিন আবদুল আজিজ রাহিমাহুমুল্লাহু তা'আলার মত দ্বীনের বুজুর্গ ব্যক্তিগণ জানিয়েছেন, আসহাব-ই কিরামের কোন পক্ষের জন্যই ভুল করেছেন বলা জায়েজ নয়। একারণেই, 'বুজুর্গ ব্যক্তিদের জন্য ভুল করেছে' বলাটা সমীচীন নয়। ছোটদের বড়দের ব্যাপারে, 'সঠিক করেছে, ভুল করেছে, পছন্দ করেছি, পছন্দ হয়নি' ইত্যাদির মত বলা জায়েজ নয়। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের হাতকে যেমনিভাবে ঐ বুজুর্গদের রক্তারক্তি করা থেকে বাঁচিয়েছেন তেমনিভাবে আমাদেরও উচিত, তাঁদের

ব্যাপারে হক্ব করেছে না ভুল করেছে সে ব্যাপারে মন্তব্য করা থেকে নিজেদের জিহ্বাকে রক্ষা করা। গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ যাবতীয় দলিল নিরীক্ষা করে ও ঘটনা পর্যবেক্ষন করে, ইমাম আলী সঠিক ছিলেন তাঁর বিরোধীরা ভুল করেছিল, বললেও এই বক্তব্য দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, 'হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, বিরোধী পক্ষের সাথে আলোচনা করার সুযোগ পেলে তাদেরকেও নিজের ইজতিহাদের যথার্থতা বুঝাতে সক্ষম হতেন'। যেমন, হযরত যুবাইর বিন আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু উষ্ট্রীর যুদ্ধে হযরত আলীর বিপক্ষে অবস্থান করা সত্ত্বেও, ঘটনার নিবিড় পর্যবেক্ষনের পরে নিজের ইজতিহাদকে পরিবর্তন করেছিলেন। যুদ্ধ থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন। এটাই হল, আহলে সুন্নাত আলেমদের মধ্য থেকে, যারা বিরোধীদের ব্যাপারে ভুল বলাকে জায়েজ মনে করে তাদের বক্তব্য। নতুবা, হযরত আলী ও তাঁর পক্ষে যারা ছিলেন শুধুমাত্র তাঁরা হক্বের উপর ছিলেন আর আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা ও তাঁর সাথে থাকা আসহাবে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন বাতিলের উপর ছিলেন বলা কোনভাবেই জায়েজ নয়।

আসহাব-ই কিরামের মাঝের এই সংঘাত, আহকাম-ই শরইয়্যার একটি শাখার তথা ইজতিহাদের ভিন্নতার কারণে সংঘটিত হয়েছিল। তাঁদের মাঝে ইসলামিয়্যাতের মূল ভিত্তি ও নির্দিষ্ট বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে কোন মতবিরোধ ছিল না। বর্তমানের কেউ কেউ, হযরত মুয়াবিয়া ও হযরত আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মত দ্বীনের বুজুর্গদের প্রতি কটাক্ষ করে, অসম্মান করে। অথচ আসহাব-ই কিরামকে হেয় করা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয় করা বা কষ্ট দেয়ার কারণ তা বুঝতে পারে না। ইমাম মালিক বিন আনাস তাঁর '**শিফা-ই শরীফ**' নামক কিতাবে বলেছেন যে, "মুয়াবিয়া অথবা আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে[12] যারা গালি দেয় বা কটাক্ষ করে, তাঁর নিজেরাই নিজেদের বুলির উপযুক্ত। তাঁদের সাথে যারা বেয়াদবী করে, তাঁদের বিরুদ্ধে যারা কটাক্ষ করে বা লিখে তাদেরকে শাস্তি দেয়া আবশ্যক"। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ক্বালবসমূহকে তাঁর হাবীবের আসহাবের

---

[12] হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান, ৬০ হিজরীতে (৬৮০ খৃস্টাব্দে) শাম নগরীতে ইনতিকাল করেন। হযরত আমর ইবনে আস, ৪৩ হিজরীতে (৬৬৩ খৃস্টাব্দে) মিসরে ইনতিকাল করেন।

প্রতি ভালোবাসা দিয়ে পূর্ণ করুক। ঐ বুজুর্গদের যারা সালিহ ও মুত্তাকী তারাই ভালোবাসে। যারা মুনাফিক ও অপরাধী তারাই তাঁদেরকে ভালোবাসে না।

[রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝে তাঁদের প্রত্যেককে ভালোবেসে, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে যারা তাঁদের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করে, তাদেরকে **আহলি সুন্নাত** বলা হয়। তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে ভালোবাসি আর অনেককে অপছন্দ করি বলার মাধ্যমে যারা তাঁদের কারো পথেরই অনুসরণ করে না, তাদেরকে ‘**রাফিজী**’ বা ‘**শিয়া**’ বলা হয়। ইরান, হিন্দুস্তান ও ইরাকে বহু রাফিজী আছে। তুরস্কে কোন রাফিজী নাই। এদের কেউ কেউ, মুসলমানদের ও খাঁটি ‘আলাভী’দের প্রতারিত করার জন্য, নিজেদেরকে ‘আলাভী’ বলে দাবী করে। অথচ, ‘আলাভী’ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভালোবাসে এমন মুসলমানদের বলা হয়। কাউকে ভালোবাসার জন্য, তার অনুসরণ করতে হয়, তার ভালোবাসার মানুষদের ভালোবাসতে হয়। এরা যদি প্রকৃত পক্ষেই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভালোবাসত তবে তাঁর প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করত। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, আসহাব-ই কিরামের প্রত্যেককেই ভালোবাসতেন। তিনি দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন, দুঃখ-কষ্টের সঙ্গী ছিলেন। হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার থেকে হওয়া তাঁর মেয়ে হযরত উম্মু কুলসুমকে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিবাহ করেছেন। খুতবাতে তিনি হযরত মুয়াবিয়ার ব্যাপারে বলেছেন যে, ‘আমাদের ভাইরা আমাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছেন। অবশ্যই তারা কাফির বা ফাসিক নন। তাঁদের ইজতিহাদ আমাদের থেকে ভিন্ন ছিল’। নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হলে তিনি তাঁর চেহারায় লেগে থাকা মাটিকে নিজ হাতে মুছে দিয়েছেন, তাঁর জানাজার নামাজে নিজেই ইমামতি করেছেন। আল্লাহ্ তা’আলা পবিত্র কুরআন করীমে ইরশাদ করেছেন যে, “**মুমিনরা পরস্পরের ভাই**”। সূরা ফাতিহ’এর সর্বশেষ আয়াত-ই করীমায়, “**আসহাব-ই কিরামগণ পরস্পরকে ভালোবাসতেন**” বলে খবর প্রদান করা হয়েছে। আসহাব-ই কিরাম থেকে কোন একজনকেও অপছন্দ করা, কুরআন করীমকে অস্বীকার করার শামিল। আহলি সুন্নাত আলেমগণ, আসহাব-ই কিরাম রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহুম

আজমাঈন'এর ফজিলতসমূহকে উত্তমভাবে অনুধাবন করেছেন। তাঁদের প্রত্যেককেই ভালোবাসার জন্য আদেশ দিয়েছেন। আর এভাবে মুসলমানদেরকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

আহলি বাইত অর্থাৎ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সকল আওলাদকে, তাঁর বংশধরদেরকে যারা অপছন্দ করে, আহলি সুন্নাতের চোখের মনি তুল্য ঐসকল বুজুর্গদের সাথে যারা দুশমনি করে, তাদেরকে '**খারেজী**' বলা হয়। বর্তমানে খারেজীদেরকে **'ইয়াজিদী'** বলা হয়। ইয়াজিদীদের দ্বীন ও ঈমান ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ।

আসহাব-ই কিরামের প্রত্যেককে ভালোবাসি বলে দাবী করে কিন্তু তাঁদের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ না করে, নিজেদের ভ্রান্ত চিন্তা ভাবনাকে আসহাবের পথ হিসেবে উপস্থাপনকারীদের **'ওহহাবী'** বলা হয়। ওহহাবী মতবাদ, মাজহাবহীন দ্বীনী ব্যক্তি আহমাদ ইবনে তাইমিয়্যার কিতাবসমূহের ভ্রান্ত ফিকিরের সাথে, হ্যাম্ফার নামের ইংরেজ গোয়েন্দার মিথ্যা ব্যাখ্যার সংমিশ্রণে অর্জিত হয়েছে। ওহহাবীরা, আহলে সুন্নাত আলেমদের, তাসাওউফের অনুসারী বুজুর্গদের ও শিয়াদের অপছন্দ করে, প্রত্যেককেই মন্দ আখ্যা দেয়। কেবলমাত্র নিজেদেরকেই মুসলমান হিসেবে বিবেচনা করে। তাদের মতবাদের সাথে যাদের অমিল হয় তাদেরকে মুশরিক মনে করে। তাদের জান ও মালকে নিজেদের জন্য হালাল মনে করে। '**ইবাহী**' হিসেবে বিবেচিত হয়। নাস'সমূহ থেকে, অর্থাৎ কুরআন করীম ও হাদিস শরীফ থেকে ভুল ও নষ্ট অর্থ বের করে, এগুলিকেই ইসলাম বলে ধারণা করে। আদিল্লা-ই শরইয়্যা ও হাদিস শরীফের অধিকাংশকেই অস্বীকার করে। চার মাজহাবের আলেমগণ বহু কিতাবে দলীলসহ প্রমাণ করেছেন যে, আহলে সুন্নাত থেকে যারা আলাদা হয়, তারা দালালাতে নিমজ্জিত হয় ও ইসলামিয়্যাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধনের কারণ হয়। আরো বেশী জানার জন্য '**কিয়ামত ও আখেরাত**' এবং '**সাআ'দাত-ই আবাদিয়্যা**' কিতাবসমূহ পড়ুন, এছাড়াও আরবী ভাষার '**মিনহাতুল ওহবীয়্যা**', '**আত্তাওয়াস্সুল বিন্নবী ওয়া বিস্সালিহীন**', '**সাবিলুন নাজাত**' এবং ফারসী ভাষার '**সাইফুল আবরার**' নামক কিতাবসমূহ পাঠ করুন। এই কিতাবসমূহ সহ আহলে বিদায়াতের প্রতি রাদ্দিয়্যা হিসেবে লিখিত বহু মূল্যবান কিতাব, ইস্তানবুলের '**হাক্বীকাত কিতাবএভী**'র পক্ষ থেকে প্রকাশ

করা হয়েছে। **হযরত ইবনে আবিদীন**’এর[13] তৃতীয় খণ্ডে বাগী’দের আলোচনায় ও **‘নিয়ামতে ইসলাম’** কিতাবের নিকাহ অধ্যায়ে, ওহহাবীদের ইবাহী হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে লিখিত আছে। সুলতান দ্বিতীয় আবদুলহামিদ খান’এর এডমিরালদের মধ্য থেকে আইয়্যুব সাবরী পাশা[14], **‘মির’আতুল হারামাইন’** ও **‘তারিখে ওহহাবিয়্যান’** নামক কিতাবে এবং আহমাদ যাওদাত পাশা, তারিখ কিতাবের সপ্তম খণ্ডে ওহহাবীদের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইউসুফ নাবহানী’র মিশরে আরবী ভাষায় প্রকাশিত **‘শাওয়াহিদুল হক্ক’** কিতাবেও ওহহাবী ও ইবনে তাইমিয়্যাহকে বিস্তারিত জবাব প্রদান করা হয়েছে। এই কিতাব থেকে পঞ্চাশ পৃষ্ঠা, ১৯৭২ সালে ইস্তানবুলে আরবী ভাষায় আমাদের প্রকাশিত **‘ইসলামী আলেম ও ওহহাবীরা’** নামক কিতাবে মওজুদ রয়েছে।

আইয়্যুব সাবরী পাশা রাহিমাহুল্লাহু তা’আলা বলেন যে: “ওহহাবী মতবাদ, ১২০৫ হিজরীতে (১৭৯১ খৃস্টাব্দে) আরব উপদ্বীপের রক্তাক্ত ও যন্ত্রণাদায়ক এক বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে”। মাজহাবহীনতা ও ওহহাবী মতবাদের কিতাবসমূহ দুনিয়ার সর্বত্র প্রচারের জন্য চেষ্টাকারীদের একজন হল, মিশরের মুহাম্মদ আবদুহ। একজন মাসন্ ও কায়রোর মাসন্ পরিষদের প্রধান জামালুদ্দীন আফগানী’র[15] প্রতি নিজের ভক্তির কথা স্পষ্টভাবে বর্ননাকারী আবদুহকে মহান ইসলামী আলেম, আধুনিক দ্বীনী চিন্তার জনক ও গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারবাদী হিসেবে যুবকদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। আহলে সুন্নাতকে ধ্বংস করার জন্য, ইসলামিয়্যাতকে পরাজিত করার জন্য ফাঁদ পেতে বসে থাকা ইসলামের দুশমনেরা এই সুযোগে, নিজেদেরকে দ্বীনী ব্যক্তিত্ব হিসেবে জাহির করে, চমৎকার বক্তব্যের দ্বারা তার মুসলমানিত্বকে প্রশংসিত করে এই ফিতনার তেজকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। আবদুহকে প্রশংসার দ্বারা আকাশে উঠাল আর আহলে সুন্নাতের মহান আলেমদের, মাজহাব ইমামদের জাহিল আখ্যা দিল। এমনকি তাঁদের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা থেকে বিরত রাখল। কিন্তু, ইসলামের জন্য রক্ত দানকারী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[13] হযরত মুহাম্মদ আমনি ইবনে আবদীন ১২৫২ হিজরীতে (১৮৩৬ খৃস্টাব্দে) শামে ইনতকিাল করেন।

[14] আইয়্যুব সাবরী পাশা, ১৩০৮ হিজরীতে (১৮৯০ খৃস্টাব্দে) ইনতকিাল করছেনে।

[15] জামালুদ্দীন আফগানী, ১৩১৪ হিজরীতে (১৮৯৭ খৃস্টাব্দে) মৃত্যু বরণ করে।

ওয়া সাল্লাম'এর প্রেমে নিজেদের জান উতসর্গকারী পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকারীরা, শান ও শারাফতের অধিকারী শহীদদের নিষ্কলুষ ও খাঁটি বংশধরেরা, এই অপপ্রচার ও কোটি কোটি টাকা খরচ করে উপস্থাপন করা বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রতারিত হয়নি। এমনকি ফুলানো দ্বীনী বীরদের প্রতি কর্ণপাত করেনি ও পরিচিত হয়নি। জনাব-ই হক্ক, শহীদ সন্তানদের এই হীন চক্রান্তের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। বর্তমানেও মাওদুদী[16], সাইয়্যিদ কুতুব[17], হামিদুল্লাহ ও তাবলীগ জামাতের প্রবক্তাদের মত মাজহাবহীনদের কিতাবসমূহ অনুবাদ করে যুবকদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বিশাল ধরণের বিজ্ঞাপনের দ্বারা মিষ্টি-মধুর প্রশংসায় সিক্ত এই অনূদিত কিতাবসমূহে, মুসলমান আলেমগণ কর্তৃক জানানো ইসলামের বিরোধী ও ভ্রান্ত মতবাদের অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছি। স্রোত থামলেও শত্রু থামে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাবীব, সর্বাধিক প্রিয় পয়গম্বর হযরত মুহামদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানে, মুসলমানদেরকে এই গাফলতের ঘুম থেকে জাগিয়ে দিক। দুশমনদের মিথ্যা প্রচার ও অপবাদের দ্বারা প্রতারিত হওয়া থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুক! আমীন! শুধুমাত্র দোয়া করার দ্বারাও যেন নিজেদেরকে প্রতারিত না করি! আল্লাহ্ তা'আলার আদত-ই ইলাহিয়্যার অনুগত না হয়ে, সববসমূহকে আঁকড়ে না ধরে, পরিশ্রম না করে শুধুমাত্র দোয়া করা, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুজিযা দাবী করার শামিল। ইসলামিয়্যাতে একইসাথে প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করতে হয়, সাথে সাথে দোয়া করতে হয়। প্রথমে সববসমূহকে আঁকড়ে ধরতে হয় তারপর দোয়া করতে হয়। কুফরের আপদ থেকে বাঁচার প্রথম সবব হল, ইসলামিয়্যাতকে শিখা ও শিক্ষা দেয়া। আহলে সুন্নাতের ইতিক্বাদ এবং ফরজ ও হারামসমূহ শিখা, নারী ও পুরুষ প্রত্যেকের জন্যই ফরজ। প্রথম পালনীয় কর্তব্য। বর্তমানে এগুলি শিখা খুবই সহজ। কেননা, দ্বীনের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানকারী কিতাবসমূহ লেখা ও প্রচার করার ক্ষেত্রে কোন বাঁধা নাই। মুসলমানদেরকে স্বাধীনতা প্রদানকারী এরূপ রাষ্ট্রকে সহায়তা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই আবশ্যক।

[16] মাওদুদী, হিন্দুস্তানের জামায়াতুল ইসলামী'এর প্রবর্তক। ১৩৯৯ হিজরীতে (১৯৭৯ খৃস্টাব্দে) ইনতিকাল করেন।

[17] সাইয়্যিদ কুতুব ১৩৮৬ হিজরীতে (১৯৬৬ খৃস্টাব্দে) মিশরে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হন।

যারা আহলি সুন্নাতের ইতিক্বাদ ও ইলম-ই হাল শিখে না ও নিজেদের সন্তানদেরকেও শিখায় না, তারা ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে, কুফরের গর্তে পতিত হওয়ার মত বিপদজনক অবস্থানে রয়েছে। এরূপ কোন ব্যক্তির দোয়াও কবুল হয় না, যার কারণে কুফর থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতেও পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, **"যেখানে ইলম আছে সেখানেই মুসলমানিত্বের অস্তিত্ব রয়েছে। যেখানে ইলম নাই সেখানে মুসলমানিত্বের অস্তিত্বও থাকে না"**। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য যেমন পানাহার করা আবশ্যক, একইভাবে কাফিরদের প্রতারণা থেকে বাঁচার জন্য এবং দ্বীন থেকে বিচ্যুত না হওয়ার জন্যও, দ্বীন ও ঈমান সম্পর্কে ইলম অর্জন করা আবশ্যক। আমাদের পূর্বপুরুষগণ সবসময় একত্রিত হয়ে ইলমে হাল কিতাবসমূহ পাঠ করত, এভাবেই দ্বীনের শিক্ষা নিত। একারণেই তাদের মুসলমানিত্ব অটুট ছিল। ইসলামিয়্যাতের স্বাদ আস্বাদন করতে পেরেছিল। এই সৌভাগ্যের আলোকে আমাদের প্রতি সঠিকভাবে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদেরও মুসলমান হিসেবে টিকে থাকার জন্য ও সন্তানদেরকে ভিতর ও বাইরের কাফিরদের দ্বারা প্রতারিত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য, প্রথম ও সর্বাধিক প্রয়োজনীয় উপায় হল, সব কিছুর আগে আহলে সুন্নাত আলেমদের রচিত ইলমে হাল কিতাবসমূহ পড়া ও তা রপ্ত করা। সন্তানদের মুসলমানিত্বকে যারা টিকিয়ে রাখতে চান, সেই বাবা-মার উচিত সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেয়া। সুযোগ থাকতেই পড়া উচিত, শিখা উচিত এবং সন্তানদেরকে ও যারা আমাদের অধীনস্ত তাদেরকে শিখানো উচিত। স্কুলে যাওয়া শুরু করার পর শিখানো অনেক কঠিন হয়ে যায়। এমন কি অসম্ভব হয়। বিপদ উপস্থিত হওয়ার পর, আহ! বলার কোন ফায়দা নাই। ইসলামের দুশমনদের ও জিনদিকদের মনোরম ও চমৎকার কিতাব, পত্রিকা, সাময়িকী, টেলিভিশন, রেডিও ও চলচ্চিত্র ইত্যাদির দ্বারা প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। ইবনে আবিদীন রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা, তৃতীয় খণ্ডে বলেছেন যে, "কোন ধর্মের প্রতি বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে জাহির করে, কুফরের সবব হয় এমন জিনিসকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে উপস্থাপন করে, মুসলমানদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টায়রত চতুর কাফিরদেরকে **'জিনদিক'** বলা হয়"।

সওয়াল: মাজহাব বিরোধীদের ক্ষতিকর কিতাবসমূহের অনুবাদকৃত লেখা পাঠকারী একজন বলে যে, 'কুরআন করীমের তাফসীরসমূহ পাঠ করা আবশ্যক। আমাদের দ্বীন ও কুরআন করীম বুঝার জন্য দ্বীন আলেমদের উপর ভরসা করা, বিপদজনক ও ভয়ংকর এক চিন্তা। কুরআন করীমে 'হে দ্বীনের আলেমগণ' বলা হয়নি। বরং 'হে ঈমানদারগণ', 'হে ইনসান' ইত্যাদির বলে সম্ভোধন করা হয়েছে। একারণেই, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, কুরআন করীমকে নিজের মত করে বুঝা। অন্যের বুঝের দ্বারা নয়'।

এই ধরণের ব্যক্তি চায় যে, প্রত্যেকেই নিজের মত করে তাফসীর ও হাদিস অধ্যয়ন করুক। ইসলামী আলেমদের, আহলে সুন্নাতের অনুসারী বুজুর্গদের কালাম, ফিকাহ ও ইলমে হাল কিতাবসমূহ পড়ার জন্য অনুৎসাহিত করে। তুরস্কের ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত মিশরের রশীদ রিজার[18] ১৩৯৪ হিজরীর (১৯৭৪ খৃস্টাব্দের) ও ১৫৭তম সংখ্যায় '**ইসলামে ঐক্য ও ফিকাহের মাজহাবসমূহ'** নামক কিতাবটি পাঠকদেরকে সম্পূর্ণরূপে আবাক করেছে। এই কিতাবের বহু স্থানে, যেমন ষষ্ঠ বক্তব্যে বলেন যে:

(মুজতাহিদ ইমামগণকে পয়গম্বরদের 'সালাওয়াতুল্লাহি তা'আলা আলাইহিম আজমাঈন' সমপর্যায়ে তুলেছে। এমনকি, পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসকে অনুসরণ করে না এমন মুজতাহিদের কথাকে গ্রহণ করে, হাদিসকে ত্যাগ করেছে। এ ব্যাপারে বলে যে, সম্ভবত এই হাদিসটি নাসখ হয়েছে অথবা ইমামের নিকট এর চেয়ে শক্তিশালী অন্য কোন হাদিস রয়েছে।

এই তাক্বলীদপন্থীরা, ভুল হুকুম দিতে পারে অথবা না জানাটা জায়েজ এমন কারো কথাকে গ্রহণ করে আমল করে, অথচ ভুল করা থেকে মুক্ত পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসকে পরিত্যাগ করে। এর দ্বারা মুকাল্লিদরা মূলত তাক্বলীদ থেকেই বিচ্যুত হয়। একইসাথে কুরআন থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়। তাদের মতে, মুজতাহিদ ইমামগণ ব্যতীত অন্য কেউ কুরআন বুঝতে সক্ষম নয়। ফাকিহ ও অন্য তাক্বলীদপন্থীদের এই ধরণের

[18] রশীদ রজিা, মুহাম্মদ আবদুহরে ছাত্র ছলিনে। ১৩৫৪ হজিরীতে (১৯৩৫ খৃস্টাব্দে) ইনতকিাল করনে।

বক্তব্য দেখিয়ে দেয় যে, তা ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের থেকে আমাদের মাঝে প্রবেশ করেছে। অথচ কুরআন ও হাদিস বুঝা, ফাকিহদের লিখিত কিতাবসমূহ বুঝার চেয়ে অধিক সহজ। যে আরবী ভাষার শব্দ ও ব্যকরন রপ্ত করেছে, সে কুরআন ও হাদিস বুঝার ক্ষেত্রে বেগ পায় না। আল্লাহ্ তা’আলা নিজের কালামকে স্পষ্টভাবে বুঝাতে সক্ষম, এই বিষয়টিকে কে অস্বীকার করতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা’আলার মুরাদকে সকলের চেয়ে উত্তমরূপে বুঝতে পেরেছেন ও বুঝানোর ক্ষেত্রেও অন্যদের চেয়ে অধিকতর যোগ্য ছিলেন, এই বিষয়কেই বা কে অস্বীকার করতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা উম্মতের জন্য যথেষ্ঠ নয় বলার অর্থ হল, তিনি তাঁর তাবলীগের দ্বায়িত্ব পূর্ণরূপে আদায় করে যাননি, দাবী করা। অধিকাংশ মানুষই যদি, কুরআন করীম ও সুন্নাতকে বুঝতে অপারগ হত, তাহলে মহান আল্লাহ্ তা’আলা ঐ কিতাব ও সুন্নাতের হুকুমসমূহের দ্বারা সমস্ত মানুষকে মুকাল্লিফ করতেন না। ইনসান যা বিশ্বাস করে, তার তা দলিলসহ জানা উচিত। জনাব-ই হক্ক, তাক্বলীদকে অপছন্দ করেছেন। বাপ-দাদাদের তাক্বলীদের কারণে ভুল করাকে, উজর হিসেবে গ্রহণ করা হবে না তা আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আয়াতসমূহ নির্দেশ করে যে, তাক্বলীদ আল্লাহ্ তা’আলার নিকট কোনোভাবেই মাকবুল হয় না। দ্বীনের আমলের বিষয়সমূহ দলিলসমূহ থেকে বুঝতে পারা, ঈমানের বিষয়সমূহ বুঝার চেয়ে অধিক সহজ। কঠিন বিষয় পালনের আদেশ দিয়ে, সহজ বিষয়ে মুকাল্লিফ না করা কিভাবে সম্ভব? কতিপয় হাদিস থেকে হুকুম বের করা কঠিন হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তা না জানা বা না পালন করা উজর হিসেবে বিবেচিত হবে। ফাকিহগণ, নিজ থেকে বহু মাস’আলা উৎপন্ন করেছেন। একইসাথে সেগুলির জন্য হুকুমও বাতলে দিয়েছেন। তারপর এগুলিকে রায়, কিয়াস-ই জলী, কিয়াস-ই খফী ইত্যাদি নামে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এই ধরণের দলিলকে, যে সব বিষয়ে আকলের দ্বারা জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয় অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন। এভাবে, দ্বীনকে চওড়া করে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করেছেন। মুসলমানদেরকে কষ্টের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। আমি কিয়াসকে অস্বীকার করি না। কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে কিয়াস নাই বলে দাবী করি। ঈমান ও ইবাদতসমূহ, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ই পূর্ণতা পেয়েছে। কেউই, এর সাথে নতুন কিছু যোগ করতে পারে না। মুজতাহিদ

ইমামগণ, মানুষদেরকে তাক্বলীদ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, তাক্বলীদকে হারাম ঘোষণা করেছেন।)

মাজহাববহীন রশীদ রিজা তার **‘ইসলামে ঐক্য ও ফিকাহের মাজহাবসমূহ’** নামক কিতাবের সার সংক্ষেপ হিসেবে রচিত উপরের বক্তব্যে, মাজহাব বিরোধী সকল কিতাবের মত, মুসলমানদেরকে চার মাজহাব ইমামের তাক্বলীদ করা থেকে নিষেধ করে। প্রত্যেককেই তাফসীর ও হাদিস শিখার জন্য আদেশ দেয়। এ বিষয়ে আপনার মত কি?

জবাব: মাজহাবহীনদের বক্তব্যকে মনোযোগ সহকারে পড়লে সহজেই বুঝা যায় যে, ভ্রান্ত মতবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাকে, মানতিকের অপব্যাখ্যা ও চমৎকার ভাষাশৈলীর দ্বারা সুসজ্জিত করে মুসলমানদেরকে প্রতারিত করার চেষ্টা করছে। জাহিলরা, এই বক্তব্যকে মানতিক, আকল ও ইলমের উপর ভিত্তি করছে ভেবে বিশ্বাস করে, তাদের অনুসরণ করে। কিন্তু ইলম ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারীগণ, কখনোই এদের ফাঁদে পা দেয় না।

মুসলমানদেরকে সীমাহীন বিপর্যয়ের দিকে ধাবিতকারী এই মাজহাববিরোধীদের বিপদ থেকে যুবকদেরকে সতর্ক করার জন্য, ইসলামের আলেমগণ রাহিমাহুমুল্লাহু তা’আলা চৌদ্দ শতাব্দী ধরে হাজার হাজার মূল্যবান কিতাব লিখে গেছেন। উপরের সওয়ালের জবাব হিসেবে, ইউসুফ নাব্হানী’র[19] **‘হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন’** নামক কিতাবের সাতশ একাত্তরতম পৃষ্ঠা থেকে শুরু করে কিছু অংশের অনুবাদ এখানে উল্লেখ করাকে উপযুক্ত মনে করছি:

কুরআন করীম থেকে আহকাম বের করা, সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। মুজতাহিদ আলেমদের পক্ষেও, কুরআন করীমের সকল আহকাম বের করা সম্ভব নয়। একারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কুরআন করীমের আহকামসমূহ হাদিস শরীফের দ্বারা ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন। কুরআন করীমকে যেমন শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

[19] ইউসুফ নাবহানী, ১৩৫০ হিজরীতে (১৯৩২ খৃস্টাব্দে) বৈরুতে ইনতিকাল করেন।

ব্যাখ্যা করেছেন, তেমন হাদিস শরীফসমূহও কেবলমাত্র আসহাব-ই কিরাম ও মুজতাহিদ ইমামগণ বুঝতে পেরেছেন ও বুঝাতে পেরেছেন।

এগুলি অনুধাবনের জন্য, আল্লাহ্ তা'আলা মুজতাহিদ ইমামগণকে আকলী ও নাকলী ইলমসমূহ, বুঝশক্তি, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি ও অত্যাধিক মেধা সহ আরো অনেক শ্রেষ্ঠত্ব ইহসান করেছেন। এই শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষে তাকওয়ার অবস্থান। এরপর হল, ক্বালবসমূহে নূর-ই ইলাহীর অস্তিত্ব। মুজতাহিদ ইমামগণ, এই সকল বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে, আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কালাম থেকে তাদের মুরাদকে বুঝতে পেরেছেন। আর যা বুঝতে পারেননি তা **কিয়াসে**র মাধ্যমে জানিয়ে গেছেন। চার মাজহাব ইমামের প্রত্যেকেই অবহিত করেছেন যে, তারা নিজেদের মনগড়া কোন ফতোয়া প্রদান করেননি। একইসাথে নিজের অনুসারীদের বলেছেন যে, 'সহীহ হাদিসের সন্ধান পেলে, আমার মতকে ত্যাগ করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের অনুসরণ কর'। মাজহাব ইমামগণ, এই কথা তাদের মত মুজতাহিদ ও গভীর ইলমের অধিকারীদেরকে বলেছেন। যেই আলেমগণ, চার মাজহাবের দলীল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন, যারা আহলি তারজিহ'এর অন্তর্ভুক্ত।

এই মুজতাহিদ আলেমগণ, মাজহাব ইমামের ইজতিহাদের দলিলের সাথে নতুন জানা সহীহ হাদিসের সনদসমূহ, বর্ননাকারীদের অবস্থা ও কোন হাদিস পরে ওয়ারিদ হয়েছে ইত্যাদির মত আরো বহু বিষয়ে পর্যবেক্ষন করে কোন হুকুম গ্রহণ করতে হবে তা বুঝতে পারে। অথবা মুজতাহিদ ইমাম, কোন মাসআলার ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে নিজের নিকট হাদিস শরীফ না পৌঁছার কারণে, কিয়াস করে হুকুম দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর তালাবাদের কেউ ঐ মাসআলার জন্য সনদ হবে এমন হাদিস শরীফ সম্পর্কে জেনে, ভিন্ন হুকুম প্রদান করে থাকতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে এরূপ ইজতিহাদ করার সময় তালাবাগণ, কোন অবস্থাতেই মাজহাব ইমামের কায়দাসমূহের বাইরে যান না। তাঁদের পরে আসা মুজতাহিদ মুফতীগণ, এইরূপ ফতোয়া দিয়েছেন। এই আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, চার মাজহাব ইমামকে ও তাঁদের শিক্ষায় বড় হওয়া মুজতাহিদদের তাক্বলীদকারী মুসলমানগণ, মূলত আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমকে তামিল করল। এই মুজতাহিদগণ, কুরআন করীম ও হাদিস শরীফ থেকে অন্যদের পক্ষে বুঝা

অসম্ভব এমন হুকুমসমূহকে বুঝতে পেরেছেন এবং যা বুঝেছেন তা সকলকে জানিয়ে গেছেন। আর মুসলমানরা, তাঁদের কিতাব ও সুন্নাত থেকে বুঝে যা অবহিত করে গেছেন তার তাক্বলীদ করেছেন। কেননা সূরা নাহলের তেতাল্লিশতম আয়াতে করীমায় (মুফাসসিরদের প্রদত্ত অর্থানুযায়ী) বলা হয়েছে যে, "**না জানলে, যারা জানে তাদের জিজ্ঞাসা কর!**"।

এই আয়াতে করীমা, সকলের পক্ষে কিতাব ও সুন্নাত যে সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব হবে না, না বুঝা লোকও থাকবে, তা প্রকাশ করতেছে। যারা বুঝতে পারে না তাদেরকে, কুরআন করীম ও হাদিস শরীফ থেকে বুঝার জন্য চেষ্টা করতে বলা হয়নি, যারা বুঝেছে তাদের থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়ার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন করীম ও হাদিস শরীফের অর্থসমূহ যদি প্রত্যেকেই সঠিকভাবে বুঝতে পারত তবে বাহাত্তরটি ভ্রষ্ট ফিরকার উদ্ভব হত না। এই ফিরকাগুলির প্রতিষ্ঠাতাদের সকলেই মেধাবী ছিল। কিন্তু তাদের কেউই, নাস্ সমুহের অর্থাৎ কুরআন করীম ও হাদিস শরীফের অর্থসমূহকে সঠিকভাবে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল। ভুল বুঝার কারণে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়ার সবব্ হয়েছিল। নাস্সমূহ থেকে ভুল অর্থ বের করার ক্ষেত্রে, কেউ কেউ এতটাই সীমা অতিক্রম করেছে যে, সঠিক পথের অনুসারী মুসলমানদেরকে পর্যন্ত কাফির, মুশরিক বলার পর্যায়ে পৌঁছেছে। তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করে, গোপনে তুরস্কের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া **'কাশফুশ্ শুবুহাত'** নামক ওহহাবী মতাদর্শের কিতাবে, আহলে সুন্নাত ইতিক্বাদের অনুসারী মুসলমানদেরকে হত্যা করা ও তাদের মাল-সম্পদ হরণ করাকে মুবাহ বলা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা, মাজহাব ইমামদের ইজতিহাদ করা, মাজহাবের উদ্ভব হওয়া ও সমস্ত মুসলমানদের এই মাজহাবের উপর একত্রিত হওয়াকে, শুধুমাত্র প্রিয় পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতকে ইহসান করেছেন। জনাব-ই হক্ব, একদিকে ইতিক্বাদী ইমামদের সৃষ্টি করে পথভ্রষ্ট, জিনদিক, মুলহিদ ও মানব শয়তানদের দ্বারা ইতিক্বাদ ও ঈমানের জ্ঞানকে ধ্বংস করার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, অপরদিকে মাজহাব ইমামদের সৃষ্টি করে দ্বীনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। খৃস্টান ও ইয়াহুদীদের মাঝে এই

নিয়ামত না থাকার কারণে, তাদের দ্বীন নষ্ট হয়ে গেছিল, খেলনার পাত্রে পরিণত হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের চারশত বছর পরে, ইজতিহাদ করার মত বিজ্ঞ আলেমদের শূন্যতা প্রকটভাবে প্রতীয়মান হয়। এমনকি মুসলমান আলেমগণ এই শূন্যতার বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। এমতাবস্থায় বর্তমানে ইজতিহাদ করা প্রয়োজন, দাবীকারী ব্যাক্তির ক্ষেত্রে সহজেই বলা যায় যে, হয় সে মানসিক রোগী নতুবা দ্বীনের বিষয়ে অজ্ঞ। বিখ্যাত আলেম জালালুদ্দীন সুয়ুতি[20] রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা, ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন বলে স্বীকৃত। ঐ সময়ের আলেমগণ তাকে একটি প্রশ্ন করে, এর দুই ধরণের জবাব প্রদান করা হয়েছে, তার মাঝে কোন জবাবটি অধিক গ্রহণীয় জানতে চেয়েছেন। তিনি জবাব দিতে পারেননি। অধিক কর্মব্যস্ততা থাকায়, এ বিষয়ে জবাব প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত সময়ের অভাবে অপারগতা প্রকাশ করেন। অথচ তার থেকে শুধুমাত্র ফতোয়ার বিষয়ের ইজতিহাদ চাওয়া হয়েছিল। যা ইজতিহাদের ধরণগুলির মাঝে সর্বনিম্ন পর্যায়ের। ইমাম সুয়ুতি (র:) এর মত বিজ্ঞ একজন আলেম যেখানে, ফতোয়ার মাঝে ইজতিহাদ করার ক্ষেত্রে অপারগতা প্রকাশ করেছেন, সেখানে মুসলমানদেরকে মুতলাক ইজতিহাদের দিকে যারা ধাবিত করতে চায়, তাদেরকে পাগল কিংবা দ্বীনী বিষয়ে অজ্ঞ না বলে কি বলা উচিত? ইমাম গাজ্জালী[21] রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা, তার সময়ে মুজতাহিদ খুঁজে না পাওয়ার কথা '**ইহইয়া-উল উলুম আদ দিন**' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

মুজতাহিদ নয় এমন কোন মুসলমান একটি সহীহ হাদিস জানার পরে দেখল যে, ঐ ক্ষেত্রে নিজের মাজহাব ইমামের প্রদত্ত হুকুম ঐ হাদিসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এমতাবস্থায় নিজ মাজহাবের অনুসরণ করা তার নিকট কঠিন মনে হলে, সে চার মাজহাবের মাঝে ঐ হাদিসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ইজতিহাদ করেছেন এমন মুজতাহিদ ইমামকে খুঁজে বের করবে অতঃপর উক্ত বিষয়ে ঐ

---

[20] আবদুররহমান সুয়ুতি, ৯১১ হজিরী/১৫০৫ খৃষ্টাব্দে মসিরে ইনতকিাল করছেনে।

[21] ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী, ৫০৫ হজিরী/১১১১ খৃষ্টাব্দে 'তুস' নামক শহরে ইনতকিাল করছেনে।

মাজহাব অনুযায়ী আমল করা তার জন্য আবশ্যক হবে। মহান আলেম ইমাম নববী[22] রাহিমাহুল্লাহি তা'আলা তাঁর '**রওজাতুত্ তালিবীন**' নামক কিতাবে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কেননা, ইজতিহাদ করার মত যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত, কারো জন্যই কিতাব ও সুন্নত থেকে হুকুম আহরণ করা জায়েজ নয়। বর্তমান সময়ে কতিপয় জাহেল, নিজেদেরকে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা অর্জনকারী মনে করে, 'নাস্' থেকে অর্থাৎ মহাপবিত্র কিতাব কুরআন ও সুন্নাতে শরীফ থেকে হুকুম বের করতে সক্ষম ভাবে তাই চার মাজহাব থেকে কোন একটির অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা নাই বলে দাবী করছে। বহু বছর ধরে অনুসরণ করে আসা মাজহাবকে ত্যাগ করছে। বিকৃত চিন্তাচেতনার দ্বারা মাজহাবগুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। পূর্বেকার আলেমগণের অভিমতসমূহকে অনুসরণ করার দরকার নাই কেননা তারাও আমাদের মতই আলেম ছিল, এরূপ বোকামি ও অজ্ঞতাপূর্ণ কথাবার্তা বলে। শয়তানের প্ররোচনায় ও নাফসের উসকানির দ্বারা, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে। এরূপ বলার মাধ্যমে, মূলত নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব নয় বরং নীচতার প্রকাশ পায় তা তারা উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের মাঝ থেকে কেউ কেউ বলে যে, সকলের তাফসীর অধ্যয়ন করা দরকার, সকলের তাফসীর ও বুখারী শরীফ থেকে হুকুম আহরণ করা দরকার। এরূপ জাহেল ও পথভ্রান্তদের অস্তিত্বও লক্ষ্য করা যায়। সাবধান মুসলমান ভাইসব! এই ধরণের অজ্ঞদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, তাদেরকে দ্বীনদার মনে করা ও তাদের রচিত কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করা থেকে অতি সাবধান হোন! নিজ ইমামের মাজহাবকে শক্তভাবে আকড়ে ধরুন! চার মাজহাবের যে কোনটিকে আপন ইচ্ছা ও পছন্দানুযায়ী গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু, মাজহাবগুলির মাঝে সহজ হুকুমগুলি অন্বেষণ করা অর্থাৎ '**তালফিক**' করা জায়েজ নয়। [**তালফিক** হল, প্রত্যেকটি মাজহাব থেকে সহজতর হুকুমগুলি খুঁজে বের করে সেই অনুযায়ী কোন আমল করা, যার দ্বারা মূলত কোন মাজহাবেরই অনুসরণ করা হয় না। কোন কাজ করার সময় চার মাজহাব থেকে কোন একটিকে পূর্ণ অনুসরণের পর, বাকী তিন মাজহাব অনুযায়ীও উক্ত কাজের সহীহ ও মাকবুল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহকে

---

[22] ইয়াহয়িা নববী, ৬৭৬ হজিরীতে (১২৭৭ খৃস্টাব্দে) শাম নগরীতে ইনতকিাল করনে।

সাধ্যানুযায়ী সম্পাদন করাকে ‘**তাকওয়া**’ বলা হয়। তাকওয়ার দ্বারা প্রচুর সওয়াব অর্জিত হয়।]

হাদিস শরীফ পাঠ করে তার অর্থ বুঝতে সক্ষম কোন মুসলমানের উচিত, প্রথমে নিজের মাজহাবের দলিল হিসেবে উপস্থাপিত হাদিসসমূহ অধ্যয়ন করা অতঃপর উক্ত হাদিসসমূহের দ্বারা যে সব আমলের প্রশংসা করা হয়েছে তা পালন করা আর যে সব করতে বারণ করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকা। এরপর হাদিস শরীফ থেকে ইসলাম দ্বীনের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব, মহান আল্লাহ্ তা’আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসম্ ও সিফাতসমূহের সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর মুজিযাসমূহ, দুনিয়া, আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থাসমূহ, ফেরেশতা, জ্বিন, পূর্ববর্তী উম্মত ও তাদের নিকট প্রেরিত পয়গম্বর ও কিতাবসমূহ এবং তাদের উপরে কুরআন-ই করীম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ‘রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আলাইহিম আয্মাঈন’ অবস্থা ও মর্যাদা, কিয়ামতের আলামতসমূহ এবং এরূপ আরো অনেক দুনিয়া ও আখিরাতের জ্ঞানসমূহ অর্জন করা দরকার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস শরীফের মাঝে দুনিয়া ও আখিরাত সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় জ্ঞানকে একত্রীভূত করা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা যদি বোধগম্য হয়ে থাকে তবে, মুজতাহিদগণ হাদিস শরীফ থেকে যে সকল দ্বীনি হুকুম বের করেন তার কোন ফায়দা নেই যারা বলে, তারা কতটা জাহিল তা বুঝা যাবে। হাদিস শরীফের দ্বারা আমাদেরকে অসংখ্য ইলম্ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এর মাঝে ইবাদত ও মুয়ামালাত সম্পর্কিত হাদিস শরীফের সংখ্যা অতি নগণ্য। কতিপয় আলেমের মতে তা পাঁচশর মত হবে। [একই অর্থ বহনকারী ভিন্ন ভিন্ন বর্ননার হাদিস শরীফ সহ গণনা করলেও তা তিন হাজারের অধিক হবে না।] এত কম সংখ্যক হাদিস শরীফ থেকে এমন কোন সহীহ হাদিস থাকতে পারে না, যা চার মাজহাব ইমামের থেকে কেউই শ্রবণ করেননি। এরূপ ধারণা করা অসম্ভব। সহীহ হাদিসসমূহের প্রত্যেকটিই, চার মাজহাব ইমামের থেকে কেউ না কেউ অবশ্যই দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কোন মুসলমান যদি দেখতে পায় যে, তার

অনুসৃত মাজহাবের কোন হুকুম বা ফতোয়া, সহীহ কোন হাদিস শরীফের সাথে সামাঞ্জষ্যপূর্ণ হচ্ছে না তাহলে তার উচিত হবে, ঐ বিষয়ে উক্ত হাদিস শরীফ অনুযায়ী ইজতিহাদ করেছেন এমন কোন মাজহাব ইমামের অনুসরণ করা। তবে খেয়াল রাখতে হবে, নিজের মাজহাব ইমামও হয়ত উক্ত হাদিসটি শ্রবণ করেছেন, কিন্তু এর চেয়েও অধিক সহীহ কোন হাদিস শরীফের সন্ধান পেয়েছেন বলে অথবা অন্য কোন হাদিস শরীফ দ্বারা উক্ত হাদিসটির নাসখ্ হয়েছে জেনে কিংবা মুজতাহিদের জানা অন্য কোন যুক্তিযুক্ত কারণ থাকায় উক্ত হাদিস শরীফকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেননি। কোন মুসলমান যখন কোন একটি হাদিস শরীফের সহীহ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয় এবং দেখতে পায় যে নিজের অনুসৃত মাজহাব উক্ত হাদিস শরীফের হুকুম অনুযায়ী আমল করছে না তখন তার জন্য নিজ মাজহাবের প্রদত্ত হুকুম না মেনে উক্ত হাদিস শরীফের অনুসরণ করা যদিও উত্তম হবে তথাপি তার কর্তব্য হল উক্ত হাদিস শরীফের ভিত্তিতে হুকুম প্রদানকারী অন্য মাজহাবের তাক্বলীদ করা।

কেননা ঐ মাজহাব ইমাম, আহকামের দলিলসমূহ সম্পর্কে তার না জানা বিষয়েও জ্ঞান রাখেন, অতএব উক্ত হাদিস শরীফ অনুযায়ী আমলের ক্ষেত্রে অন্য কোন ধরণের বাঁধার অস্তিত্বহীনতার ব্যাপারে অবগত থাকবেন। একইভাবে ঐ ক্ষেত্রে নিজ মাজহাবের অনুসরণ করে আমল করাও জায়েজ হবে। কেননা মাজহাব ইমামের ঐরূপ ইজতিহাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই মজবুত কোন দালিলিক ভিত্তি রয়েছে। মুকাল্লিদ হিসেবে এই সংক্রান্ত দলিলের বিষয়ের অজ্ঞতাকে, ইসলামিয়্যাত উজর হিসেবে গণ্য করে। কেননা চার মাজহাবের কোন ইমামই, ইজতিহাদের ক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নত থেকে একচুল পরিমাণও ছাড় দেননি। মূলত তাদের মাজহাবগুলি হল কিতাব ও সুন্নতের বিবরণ ও ব্যাখ্যা মাত্র। কিতাব ও সুন্নাতের অর্থ, তাৎপর্য ও হুকুমসমূহকে সাধারণ মুসলমানদের জন্য উপস্থাপন করেছেন। তারা যেন বুঝতে পারে সেভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন, নিজেদের রচিত কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ করেছেন। মাজহাব ইমামগণের 'রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা' এই মহান প্রচেষ্টা, ইসলাম দ্বীনের জন্য এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক এক খেদমত যে, মহান আল্লাহ তা'আলার অশেষ দয়া ও সহায়তা ব্যতিরেকে কোন মানুষের পক্ষে তা করা সম্ভব হত না। এক অর্থে, এই মাজহাবসমূহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হক্ব পয়গাম্বর ও

ইসলামের সহীহ দ্বীন হওয়ার বিষয়কে প্রমাণকারী সবচেয়ে দৃঢ দলিলসমূহের অন্যতম।

আমাদের দ্বীনি ইমামদের ইজতিহাদের মাঝে পরস্পরের থেকে ভিন্নমত পোষণ করা শুধুমাত্র 'ফুরু-ই দ্বীন'এর ক্ষেত্রে হয়েছে। অর্থাৎ ফিকহের মাসলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে হয়েছে। 'উসুল-উ দ্বীন' তথা ইতিক্কাদ ও ঈমানের বিষয়ে কোন ধরণের মতপার্থক্য নাই। ফুরু'এর ক্ষেত্রেও দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়সমূহ তথা যেসবের দলিলসমূহ হাদিস শরীফ থেকে তাওয়াতুরের মাধ্যমে জানানো হয়েছে, তাতেও কোন ইখতিলাফ নাই। ফুরু-ই দ্বীন'এর কিছুকিছু বিষয়ে তাদের মাঝে মত পার্থক্য রয়েছে। এর কারণ হল, দলিলের অকাট্যতার ব্যাপারে তাদের বুঝার ভিন্নতা। এই ধরণের ছোট খাটো ইখতিলাফ মূলত এই উম্মতের প্রতি এক ধরণের রহমত হিসেবে বিবেচিত। মুসলমানদের জন্য আপন ইচ্ছানুযায়ী, নিজের জন্য পালন করা সহজ এমন মাজহাবের অনুসরণ করা জায়েজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ধরণের মত পার্থক্যের ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন, বাস্তবেও তা তাই হয়েছে।

পবিত্র কুরআন করীম ও হাদিস শরীফে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এমন ইতিক্কাদী বিষয়ে ও ফিকহী মাসয়ালার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ জায়েজ নয়। এসব ক্ষেত্রে ইজতিহাদ, দালালাত ও পথভ্রষ্টতার কারণ হয়। কবীরা গুনাহ হয়। ইতিক্কাদের বিষয়ে একটিমাত্র সঠিক পথ রয়েছে। আর তা হল **আহলি সুন্নত ওয়াল জামায়াতের মাজহাব**। পবিত্র হাদিস শরীফে রহমত হিসেবে বিবেচিত ইখতিলাফ মূলত ফুরু'এর জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ ফিকহী মাসায়েলের সাথে সম্পর্কিত।

আমলের ক্ষেত্রে চার মাজহাবের মাঝে মত পার্থক্য রয়েছে এমন কোন একটি মাসয়ালার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটির হুকুম সসীহ হবে। এই সহীহ হুকুমের অনুসারীদের জন্য দুইটি সওয়াব রয়েছে আর সহীহ নয় এমন হুকুমের অনুসারীদের জন্য একটি সওয়াব রয়েছে। মাজহাবসমূহকে রহমত হিসেবে গণ্য করায়, এক মাজহাব ছেড়ে আমলের ক্ষেত্রে অন্য মাজহাবের অনুসরণ করা যে জায়েজ হবে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই চার মাজহাবের বাইরে আহলি সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত অন্য কোন মাজহাবের এমনকি আসহাবে কিরামদেরও তাক্কলীদ করা জায়েজ নয়। কেননা তাদের মাজহাবসমূহ কিতাবে

লিপিবদ্ধ হয়নি। তাই হারিয়ে গেছে। বর্তমানে জ্ঞাত এই চার মাজহাবের বাইরে অন্য কিছুর তাক্বলীদ করার কোন সুযোগ অবশিষ্ট নাই। ইসলামের আলেমগণ ঐক্যমতের ভিত্তিতে ঘোষণা করেছেন যে, আসহাবে কিরামের তাক্বলীদ করা জায়েজ নয়।

ইমাম আবুবকর রাজী[23] 'রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা'ও এ ব্যাপারে খবর প্রদান করেছেন। মাজহাবসমূহের ও মুজতাহিদগণের, বিশেষকরে চার মাজহাব ইমামের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফজিলত, মাজহাবসমূহ যে কিতাব ও সুন্নত থেকে একচুল পরিমাণও ছাড় দেয়নি, কিয়াস ও ইজমার দ্বারা যে সমস্ত হুকুম প্রদান করা হয়েছে তা যে তাদের ব্যক্তিগত মত নয় বরং কিতাব ও সুন্নত থেকেই নেয়া হয়েছে তা বুঝতে চাইলে ইমাম আবদুল ওহহাব শারানী রাহিমাহুল্লাহু তা'আলার রচিত '**মিজানুল কুবরা**' ও '**মিজানুল হিদরিয়া**' নামক কিতাবসমূহ পড়ার জন্য অনুরোধ করছি। এখানে '**হুজ্জাতিল্লাহি আলা-ল আলামীন**' কিতাব থেকে অনুবাদ করা অংশের সমাপ্তি হয়েছে। উপরে লিখিত অংশের সবটুকুই মূল আরবী কিতাব থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। আমাদের অন্যান্য প্রকাশনার মত এখানেও অন্যান্য কিতাব থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্‌ধৃত করা হয়েছে। যা ব্র্যাকেটের মাঝে উল্ল্যেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্‌ধৃত অংশকে মূল কিতাবের অনুবাদের থেকে পৃথক করা হয়েছে। উপরে অনুবাদকৃত অংশটির জন্য মূল আরবী কিতাব '**হুজ্জাতুল্লাহি আলা-ল আলামীন**'এর ১৩৯৪ হিজরীতে (১৯৭৪ খৃষ্টাব্দ) ইস্তানবুল থেকে প্রকাশিত সংস্করণকে অনুসরণ করা হয়েছে।

'পবিত্র কুরআন করীমে দ্বীন আলেমদের কথার উল্লেখ নাই' কথাটি সঠিক নয়। বিভিন্ন আয়াত-ই করিমায়, ইলম ও আলেমগণের প্রশংসা করা হয়েছে। হযরত আব্দুল গনী নাবলুসী রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা তার '**হাদিকা**' নামক কিতাবে বলেছেন যে:

সূরা আম্বিয়ার সপ্তম আয়াত-ই করিমায় (তাফসীর আলেমদের দেয়া অর্থানুযায়ী) বলা হয়েছে যে, "**তোমাদের না জানা বিষয়ে, জিকিরওয়ালদেরকে জিজ্ঞেস কর**" এখানে জিকির মানে হল ইলম্। এই আয়াত-ই করিমাটি, না জানা বিষয়ে আলেমদেরকে খুঁজে বের করে তাদেরকে

---

[23] হযরত আবুবকর আহমদ রাজী, ৩৭০ হিজরীতে (৯৮০ খৃস্টাব্দে) ইনতকিাল করছেনে।

জিজ্ঞেস করে শিক্ষা নেয়ার জন্য আদেশ করেছে। সূরা আল-ইমরানের সপ্তম আয়াতে (তাফসীর আলেমদের দেয়া অর্থানুযায়ী) বলা হয়েছে, "**মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের অর্থ শুধুমাত্র ইলমের অধিকারীরা বুঝতে পারে**" এবং অষ্টদশ আয়াতে (তাফসীর আলেমদের দেয়া অর্থানুযায়ী) বলা হয়েছে, "**আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব ও একত্ববাদের বিষয়টি আলেমগণ অনুধাবন করতে পারেন ও প্রচার করেন**"। সূরা কাসাস'এর একাশিতম আয়াতে (তাফসীর আলেমদের দেয়া অর্থানুযায়ী) বলা হয়েছে যে, "**আলেমগণ বললেন, যারা ঈমান এনে নেক আমল করে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা যে সওয়াব প্রদান করবেন, তা দুনিয়ার নিয়ামতসমূহ থেকে অধিক উত্তম**"। সূরা রুমের ছাপ্পান্নোতম আয়াতে (তাফসীর আলেমদের দেয়া অর্থানুযায়ী) বলা হয়েছে, "**ইলম ও ঈমানের অধিকারীরা তাদের বলবে, দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় যে কিয়ামতকে অস্বীকার করতে আজকে সেই দিন সংঘটিত হচ্ছে**"। সূরা ইস্রার একশ আটতম আয়াতে (তাফসীর আলেমদের দেয়া অর্থানুযায়ী) বলা হয়েছে, "**আলেমগণ যখন কুরআন করীম শ্রবণ করেন তখন তারা সিজদায় নত হন ও বলেন, আমাদের মালিকের কোন ধরণের ত্রুটি বিচ্যুতি নাই, তিনি কখনো ওয়াদার বরখেলাফ করেন না**"। সূরা হজ্জ'এর চুয়ান্নতম আয়াতে (তাফসীর আলেমদের দেয়া অর্থানুযায়ী) বলা হয়েছে, "**আলেমগণ, পবিত্র কুরআন করীম যে মহান আল্লাহ্ তা'আলার কালাম তা অনুধাবন করতে পারেন**"। সূরা আনকাবুত'এর পঞ্চাশতম আয়াতে (তাফসীর আলেমদের দেয়া অর্থানুযায়ী) বলা হয়েছে, "**কুরআন-ই করীমকে আলেমগণের ক্বালবে খোদিত করা হয়েছে**"। সূরা সাবা'এর ষষ্ঠ আয়াতে (তাফসীর আলেমদের দেয়া অর্থানুযায়ী) বলা হয়েছে, "**আলেমগণ জানেন যে, পবিত্র কুরআন করীম আল্লাহ্ পাকের কালাম, এভাবে তারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন**"। সূরা মুজাদালার একাদশ আয়াতে (তাফসীর আলেমদের দেয়া অর্থানুযায়ী) বলা হয়েছে, "**আলেমদেরকে জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হবে**"। সূরা ফাতির'এর

সাতাশতম আয়াতে (তাফসীর আলেমদের দেয়া অর্থানুযায়ী) বলা হয়েছে, "**শুধুমাত্র আলেমগণই মহান আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে ভীত হন**"। সূরা হুজুরাত'এর চতুর্দশ আয়াতে (তাফসীর আলেমদের দেয়া অর্থানুযায়ী) বলা

হয়েছে, "**তোমাদের মাঝে সেই সর্বাধিক সম্মানিত, যে আল্লাহ্ তা'আলাকে সর্বাধিক ভয় পান**"।

'**হাদিকা**' নামক কিতাবের তিনশ পঁয়ষট্টিতম পৃষ্ঠায় বর্নিত হাদিস শরীফসমূহে এ ব্যাপারে আরো বলা হয়েছে যে, "**যারা মানুষকে কল্যাণ শিক্ষা দেয় তাদের জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলা, ফেরেশতাগণ ও সকল জীব দোয়া করে", "কিয়ামতের দিন প্রথমে পয়গম্বরগণ তারপর আলেমগণ তারপর শহিদগণ শাফায়াত করবেন", "হে ইনসান! জেনে নাও যে, ইলম্ আলেমদের থেকে শুনে শুনে শিখতে হয়", "ইলম্ অর্জন কর, ইলম্ অর্জন করা ইবাদত। ইলম্ যে শিক্ষা দেয় আর যে শিক্ষা নেয় তাদের জন্য জিহাদের সওয়াব রয়েছে। ইলম্ শিক্ষা দেয়া সাদাকা দেয়ার তুল্য। আলেমের থেকে ইলম্ অর্জন করা তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের মত**"। '**খুলাছা**' নামক ফতোয়ার কিতাবের রচয়িতা হযরত তাহির বুখারী[24] রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা বলেছেন যে, "ফিকাহ্'এর কিতাব অধ্যয়ন করা, রাত জেগে নামাজ আদায় করার চেয়েও অধিক সওয়াবের"। কেননা ফরজ ও হারামসমূহ, [আলেমদের থেকে অথবা তাদের রচিত] কিতাব থেকে শেখা ফরজ। নিজে পালন করা ও অন্যদের শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে ফিকাহ্'এর কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করা, তাসবীহ নামাজ আদায়ের চেয়েও অধিক পুণ্যের। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, "**ইলম্ অর্জন করা, সকল নফল ইবাদতের চেয়ে অধিক সওয়াবের। কেননা এতে নিজের সাথে সাথে অন্যের জন্যও ফায়দা বিদ্যমান**"। হাদিসে আরও বলা হয়েছে, "**অপরকে শেখানোর জন্য যে ইলম্ অর্জন করে, তাকে সিদ্দিকদের তুল্য সওয়াব প্রদান করা হয়**"। ইসলামের জ্ঞান কেবলমাত্র উসতাদ ও কিতাব থেকে শেখা সম্ভব। যারা বলে, ইসলাম শেখার জন্য কিতাব ও রাহবারের প্রয়োজন নেই তারা মিথ্যাবাদী ও দ্বীন বিদ্বেষী। এভাবে তারা মুসলমানদেরকে প্রতারিত করছে, ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দ্বীনি কিতাবসমূহে বর্নিত ইলম্সমূহ মূলত কুরআন করীম ও

---

[24] হযরত তাহরি বুখারী রাহমিাহুল্লাহু তায়ালা ৫৪২ হজিরীতে (১১৪৭ খৃস্টাব্দ) ইনতকািল করছেনে।

হাদিস শরীফ থেকে আহরিত হয়েছে। '**হাদিকা**'[25] কিতাবের অনুবাদ এখানেই সমাপ্ত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা তার সম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পবিত্র কুরআন করীমের তাবলীগের জন্য, শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন। সম্মানিত সাহাবীগণ, পবিত্র কুরআন করীমের জ্ঞানকে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শিখেছেন। আর দ্বীনের আলেমগণ এই জ্ঞান আসহাবে কিরাম থেকে শিখেছেন। পরবর্তীতে সমস্ত মুসলমান, পবিত্র কুরআনের জ্ঞানকে দ্বীন আলেমদের থেকে, তাদের রচিত কিতাবসমূহ থেকে শিখছে। হাদিস শরীফে এসেছে, "**ইলম্ হল এক ভাণ্ডার, আর এর চাবি হল জিগ্যেস করে শিক্ষা অর্জন করা**", "**তোমরা নিজেরা শিক্ষা অর্জন কর ও অপরকে শিক্ষা প্রদান কর**", "**সবকিছুরই উৎস রয়েছে, তাকওয়ার উৎস হল আরিফদের ক্বলব**" ও "**ইলম্ শিক্ষা দেয়া কৃত গুনাহের কাফফারা হিসেবে পরিগণিত হবে**"।

ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ-ই আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর '**মাকতুবাত**' নামক কিতাবের প্রথম খণ্ডের একশ তিরানব্বইতম [১৯৩] মাকতুবে বলেছেন যে:

মুকাল্লিফ তথা আকিল ও বালিগ ব্যক্তির জন্য প্রথমে নিজের ঈমান ও ইতিক্বাদকে সংশোধন করা জরুরী। অর্থাৎ আহলি সুন্নাত আলেমদের রচিত আকাঈদ সম্পর্কিত ইলম্সমূহ শিখে তদনুযায়ী বিশ্বাস করা আবশ্যক। মহান আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল মহান আলেমদেরকে তাদের নিরলস প্রচেষ্টার জন্য অনেক অনেক সওয়াব প্রদান করুক। আমিন! কিয়ামতের সময় জাহান্নামের ভয়াবহ আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়টি ঐ সকল আলেমদের শিখানো ইতিক্বাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সম্পর্কিত। কেবলমাত্র তাদের প্রদর্শিত পথের অনুসারীরাই কিয়ামতের দিবসে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। [তাদের পথের অনুসারীদের **সুন্নী** বলা হয়।] কেবলমাত্র এরাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সম্মানিত সাহাবীদের 'রাদিয়াল্লাহু আলাইহিম

[25] 'হাদকা'এর রচয়তিা আব্দুল গনী নাবলুসী, ১১৪৩ হজিরীত (১৭৩১ খৃস্টাব্দ) ইনতকািল করছেনে।

আজমাঈন’ প্রদর্শিত পথের অনুসারী। কিতাব তথা কুরআন করীম ও সুন্নাত তথা হাদিস শরীফ থেকে উতসরিত মূল্যবান ও সহীহ ইলম্ কেবলমাত্র এই ধরণে আলেমদের মারফৎ তাদের রচিত কিতাবসমূহ থেকে অর্জন করা সম্ভব। কিতাব ও সুন্নাত থেকে তারা যা বুঝেছেন তাই সহীহ ইলম্। প্রত্যেক আহলি বিদায়াত তথা রিফর্মিষ্টি, **পথভ্রষ্ট** ও মাজহাববিরোধী ব্যক্তি নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদসমূহকে, স্বীয় অপ্রতুল আকলের দ্বারা কিতাব ও সুন্নাত থেকে আহরিত বলেই দাবী করে। এর দ্বারা আহলি সুন্নাতের অনুসারী আলেমদেরকে অপদস্ত করতে সচেষ্ট হয়। একারণেই কিতাব ও সুন্নাত থেকে আহরিত বলে দাবী করা যে কোন বক্তব্য বা লেখাকে যথাযথ অনুসন্ধান না করে সহীহ ভাবা উচিত নয়, জাঁকজমকপূর্ণ প্রোপাগান্ডার দ্বারা প্রতারিত হওয়া উচিত নয়।

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারী আলেমদের দ্বারা ঘোষিত সহীহ ইতিক্বাদকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে, মহান আলেম হযরত তুরপুশতি রহমাতুল্লাহি আলাইহ ফারসি ভাষায় ‘**আল-মু’তামাদ**’ নামে একটি কিতাব রচনা করেছেন। কিতাবটি খুবই মূল্যবান ও অতি স্পষ্ট ভাষায় লিখিত হয়েছে, যা সহজেই বুঝতে পারা যায়। [**হাক্বীকাত কিতাবএভি**, ১৪১০ হিজরী (১৯৮৯ খৃস্টাব্দে) কিতাবটি প্রকাশ করে। হযরত ফাদলুল্লাহ বিন হাসান তুরপুসতি রহমাতুল্লাহি আলাইহি হানেফী ফিকাহ’এর আলেম ছিলেন। ৬৬১ হিজরী (১২৬৩ খৃস্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেন।]

আকাঈদ তথা বিশ্বাসের বিষয়কে সংশোধনের পরে **হালাল, হারাম, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মানদুব** ও **মাকরুহের** বিষয়ে আহলি সুন্নাতপন্থী আলেমদের রচিত ফিকাহ’এর কিতাবসমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা ও তদনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। এই ধরণের আলেমদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় এমন জাহিলদের রচিত ভ্রান্তিময় গ্রন্থসমূহ পড়া থেকে নিজেদের বিরত রাখা উচিত। মহান আল্লাহ্ তা’আলা আমাদের রক্ষা করুক! ইতিক্বাদ তথা বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়গুলিতে আহলি সুন্নাতের মাজহাবের বরখেলাপ বিশ্বাসের অধিকারী মুসলমানদের জন্য, আখিরাতে জাহান্নামে নিপতিত হওয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করা সম্ভব হবে না। ঈমান সহীহ হওয়ার পর ব্যক্তির ইবাদতের ক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতি হলে, এর জন্য তওবা না করেও ক্ষমা প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ক্ষমা প্রাপ্ত না হলেও, আজাব ভোগের পরে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।

এ কারণেই ইতিক্বাদ সংশোধন করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। হযরত খাজা উবাইদুল্লাহি আহরার কাদ্দাসাল্লাহু তা'আলা সিররুহুল আজিজ[26] বলেছেন যে, "সমস্ত কাশফ্ ও কারামত আমাকে প্রদান করে যদি আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইতিক্বাদ না দেয়া হয় তবে নিজেকে এক ধ্বংসস্তূপ মনে করব। পক্ষান্তরে আমার কোন কাশফ্ ও কারামত না হলে, তদুপরি বহু গুনাহ থাকলেও মনঃক্ষুণ্ন হব না, যদি আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইতিক্বাদ আমাকে ইহসান করা হয়"।

বর্তমানে ভারতবর্ষের মুসলমানরা অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করছে। দ্বীনের দুশমানরা

চারিদিক থেকে আঘাত হানছে। তাই এই সময়ে, ইসলামের খেদমতের জন্য এক মুদ্রা খরচ করা অন্য সময়ের হাজার মুদ্রা খরচ করার চেয়েও অধিক সওয়াবের। এখন ইসলামের জন্য সবচেয়ে বড় খেদমত, আহলি সুন্নাতের কিতাবসমূহ, ঈমান ও ইসলামের কিতাবসমূহ সংগ্রহ করে গ্রামে-গঞ্জে, শহরের আনাচেকানাচে যুবকদের মাঝে বিলি করার দ্বারা সম্ভব হবে। যে সকল বখতিয়ারগণের এই ধরণের খেদমত করার নসীব হয়েছে তারা আনন্দিত হোক। মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করুক। সবসময়ের জন্যই ইসলামের খেদমত করা সওয়াবের কাজ। কিন্তু যখন ইসলামের অনুসারীরা দুর্বল হয়, মিথ্যা, অপবাদ ও প্রোপাগান্ডার দ্বারা মুসলমানিত্ব ধ্বংসের পাঁয়তারায় লিপ্তদের আধিক্য প্রকাশ পায়, তখন আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইতিক্বাদের প্রচার ও প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত করা বহুগুণ বেশি সওয়াবের হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রিয় আসহাব-ই কিরামদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, "**তোমরা এমন এক সময়ে আগমন করেছ যখন আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ও নিষেধসমূহের দশটি থেকে নয়টি পালন করে বাকি একটি ত্যাগ করলে তোমাদের ধ্বংস হতে হবে, আজাব ভোগ করতে হবে। কিন্তু তোমাদের পরে এমন এক সময় আসবে, যেই সময়ে আদেশ ও নিষেধসমূহের দশভাগের**

[26] হযরত খাজা উবাইদুল্লাহি আহরার কুদ্দসিা সরিরুহু ৮৯৫ হজিরীতে (১৪৯০ খৃষ্টাব্দে) সমরখন্দে ইনতকিাল করছেনে।

একভাগ পালন করার মাধ্যমে মানুষেরা মুক্তি প্রাপ্ত হবে" [**মিশকাতুল মাসাবীহ** ও তিরমিজির কিতাবুল ফিতানের উনআশিতম হাদিস]। এই হাদিস শরীফে উল্লেখিত সময় হল এই বর্তমান জামানা। তাই কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, মুসলমানদের যারা আক্রমণ করছে তাদের চিনে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। [শক্তি প্রয়োগের দ্বারা জিহাদের বিষয়টি সরকার পরিচালনা করবে, রাষ্ট্রের সেনারা করবে। মুসলমানদের জন্য এরূপ জিহাদে অংশগ্রহণ, সৈনিক হিসেবে সরকার কর্তৃক অর্পিত দ্বায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। জিহাদে কাওলী'এর জিহাদে কাতলী থেকে অর্থাৎ কথা ও লেখার মাধ্যমে করা জিহাদ শক্তি প্রয়োগের দ্বারা কৃত জিহাদের তুলনায় যে অধিক ফায়দাজনক, তা পঁয়ষট্টিতম মাকতুবেও বর্নিত হয়েছে।] আহলি সুন্নাত আলেমদের কিতাবসমূহ ও মতবাদ প্রচারের জন্য আলেম হওয়া কিংবা কেরামতের অধিকারী হওয়ার মত কোন শর্ত নাই। প্রত্যেক মুসলমানেরই এর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্তব্য। এ ধরণের সুযোগ হেলায় হারানো উচিৎ নয়। কিয়ামতের দিনে প্রত্যেক মুসলমানকেই এই প্রশ্ন করা হবে যে, ইসলামের খেদমত করা থেকে কেন বিরত ছিলে? ইলমে হাল কিতাবসমূহ প্রচারের জন্য যারা চেষ্টা করল না, যারা দ্বীনি ইলম প্রসারের জন্য যে সমস্ত সংস্থা বা ব্যক্তি কাজ করে যাচ্ছে তাদেরকে সহায়তা করল না তাদেরকে আযাব ভোগ করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন উজর বা বাহানা কবুল করা হবে না। মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী হওয়ার সত্ত্বেও কখনো আরাম করেননি। মহান আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীনকে, চিরস্থায়ী সৌভাগ্য অর্জনের পথকে প্রচারের জন্য রাতদিন পরিশ্রম করে গেছেন। যখন কেউ তাঁর নিকট মুজিযার দাবী করত তখন তিনি বলতেন, "**মুজিযা আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেন, আমার কর্তব্য হল আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীনের তাবলীগ করা**"। এই পথে এভাবে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, একারণেই প্রয়োজন অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সাহায্য করেছেন, মুজিযা সৃষ্টি করেছেন। আমাদেরও উচিত, আহলি সুন্নাতের অনুসারী আলেমগণের 'রাহিমাহুমুল্লাহু তা'আলা' কিতাবসমূহকে, তাদের বক্তব্যকে প্রচার করা। এছাড়াও কাফির ও দুশমনদের এবং যারা মুসলমানদের অপবাদ দেয়, অত্যাচার করে তাদের মন্দ, কুৎসিত, ভণ্ড রূপ ও মিথ্যা প্রোপাগান্ডার ব্যাপারে যুবকদের, বন্ধুদের অবগত করা আবশ্যক। [এই ধরণের

বিষয়কে প্রকাশ করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না, বরং 'আমরু বিল মারুফ' হবে।] এই পথে যারা মাল দ্বারা, শক্তি দ্বারা, পেশার দ্বারা অংশগ্রহণ করল না, তারা আযাব ভোগ করা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারবে না। এই পথে চলার পথে দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হলে তাকে বড় ধরণের সফলতা ও সৌভাগ্য হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। পয়গম্বরগণ আলাইহিমুস্ সালাওয়াত যখন মহান আল্লাহ্ তা'আলার আদেশকে প্রচার করেছিলেন তখন জাহিলদের, পথভ্রষ্টদের, বেজন্মাদের আক্রমণের স্বীকার হয়েছিলেন। নির্মম নির্যাতন ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। ঐ সকল মহান ব্যক্তিত্বের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠজন ও মহান আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাধিক প্রিয় হাবীব হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি বলেছেন, **"আমি যেরূপ নির্যাতন, নিষ্পেষণ ও অত্যাচারের স্বীকার হয়েছি, অন্য কোন পয়গম্বর সেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করেননি"**। **মাকতুবাত** থেকে কৃত অনুবাদের এখানেই সমাপ্তি।

[প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিত, আহলে সুন্নাতের ইতিক্বাদকে শিখা। আহলে সুন্নাত আলেমদের বক্তব্য ধারণকারী কিতাব, পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদি খোঁজা, পড়া এবং পরিচিত মাঝে বিশেষ করে যুবকদের মাঝে বিতরণ করা। সকলকে পড়ানোর চেষ্টা করা। ইসলামের শত্রুদের অন্তর্নিহিত রূপ সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য আহলে সুন্নাতের কিতাবসমূহকে বিতরণের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা জরুরী।]

ভূপৃষ্ঠে অবস্থানরত সমস্ত মুসলমানদেনকে যারা সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথকে কোন ধরণের পরিবর্তন, পরিবর্ধন না করে আমাদের শিখানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তাদেরকে **আহলে সুন্নাত আলেম** বলা হয়। তাঁদের মাঝে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা অর্জনকারী চার মাজহাবের অনুসারী বহু আলেম রয়েছেন। তাঁদের মাঝে এমন চারজন আলেম রয়েছেন যাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বস্বীকৃত। তাঁদের প্রথমজন হলেন **ইমাম আযম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত** রহমতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ইসলামী আলেমদের মাঝে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। আহলি সুন্নাতের প্রধান ছিলেন। ইলমে হালের অনুবাদ **(সা'আদাত-ই আবাদিয়্যা)** ও **(উলুমুন্ নাফিয়া)** কিতাবসমূহে বিস্তারিত বর্ননা রয়েছে। [৮০] আশি হিজরী সনে কুফায়

জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরীতে [৭৬৭ খৃস্টাব্দে] বাগদাদে শহীদ হয়েছেন।

দ্বিতীয়জন হলেন **ইমাম মালিক বিন আনাস** রাহিমাহুল্লাহু তা’আলা, অতি বড় মাপের আলেম ছিলেন। [৯০] নব্বই হিজরীতে মদিনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯ হিজরীতে [৭৯৫ খৃস্টাব্দে] ওখানেই ইনতিকাল করেন। তিনি উননব্বই বছর বেঁচে ছিলেন, ইবনে আবিদীনে এরূপ উল্লেখ রয়েছে। তাঁর দাদা ছিলেন মালিক বিন আবি আমীর।

তৃতীয়জন হলেন **ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরিস্ শাফিঈ** রাহিমাহুল্লাহু তা’আলা। তিনি মুসলমান আলেমদের চোখের মনি ছিলেন। [১৫০] একশত পঞ্চাশ হিজরীতে ফিলিস্তিনের গাজ্জায় জন্মগ্রহণ করেন এবং (২০৪) দুইশত চার হিজরীতে [৮২০ খৃস্টাব্দে] মিশরে মৃত্যু বরণ করেন।

চতুর্থজন হলেন **ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বল** রাহিমাতুল্লাহি তা’আলা। [১৬৪] একশত চৌষট্টি হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪১ হিজরীতে [৮৫৫ খৃস্টাব্দে] ওখানেই ইনতিকাল করেন। উনারা চারজন হলেন ইসলাম নামক ঘরের চারটি প্রধান খুঁটি, রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন।

বর্তমান সময়ে, এই চার ইমামের কোন একজনকে যে অনুসরণ করল না সে ভয়ানক শঙ্কার মাঝে রয়েছে। সঠিক পথ হারিয়ে ফেলেছে। উনারা ছাড়াও আহলে সুন্নাতের অনুসারী প্রচুর আলেম রয়েছেন। তাঁদেরও নিজনিজ সহীহ মাজহাব ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাঁদের মাজহাবসমূহ হারিয়ে গেছে। যার অধিকাংশরই কিতাবসমূহ রচিত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, ‘**ফুকাহা-ই সাব্আ**’ নামে বিখ্যাত মদিনা-ই মুনাওয়ারার সাতজন মশহুর আলেম সহ হযরত **উমর বিন আবদুল আজিজ**, **সুফিয়ান বিন উয়াইনা**[27], **ইসহাক বিন রাহাবাইহ, দাউদ-ই তাইঈ, আমীর বিন সারাহিল-ই শাবী, লাইস্ বিন সা’দ, আ’মাস্, মুহাম্মদ বিন জারির তাবেরী, সুফিয়ান-ই সাওরী**[28] **ও আবদুর রহমান আওজায়ী** রাহিমাহুমুল্লাহু তা’আলা অন্যতম।

[27] হযরত সুফয়িান বনি উয়াইনা, ১৯৮ হজিরীতে (৮১৩ খৃস্টাব্দে) মক্কা নগরীতে ইনতকিাল করনে।

[28] হযরত সুফয়িান-ই সাওরী, ১৬১ হজিরীতে (১৩৬৭ খৃস্টাব্দে) বসরায় ইনতকিাল করনে।

আসহাবে কিরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম আজমাইনদের প্রত্যেকেই হক্কের উপর ছিলেন, হিদায়েতের একেকটি নক্ষত্র ছিলেন। তাঁদের যে কোন জনই, সমস্ত দুনিয়াকে সঠিক পথের দিশা দিতে সক্ষম ছিলেন। সকলেই মুজতাহিদ ছিলেন বিঁধায় আপন মাজহাব অনুযায়ী চলতেন। তবে তাঁদের মাজহাবসমূহ পরস্পরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁদের **মাজহাব**সমূহ সংরক্ষিত হয়নি, কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। একারণে তাঁদের মাজহাবের অনুসরণ করা সম্ভব নয়। চার ইমামের মাজহাবসমূহ অর্থাৎ বিশ্বাসের ও পালনের বিষয়সমূহকে ইমাম ও তাঁদের তালাবাগণ, কুরআন ও সুন্নাত থেকে একত্রিত করেছেন ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। বর্তমানে প্রত্যেক মুসলমানের, এই চার ইমামের যেকোন জনের মাজহাবের অনুসরণ করা, সে অনুযায়ী জীবন যাপন করা ও ইবাদতসমূহ পালন করা আবশ্যক। [এই চার মাজহাবের যে কোন একটিকে যে অনুসরণ করল না, সে **আহলে সুন্নাতের** অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রারম্ভিকা দ্রষ্টব্য]

এই চার ইমামের তালাবা'দের মধ্য থেকে দুইজন, ঈমানী ইলমের ক্ষেত্রে অধিক অগ্রগামী ছিলেন। এভাবেই ইতিক্বাদের ক্ষেত্রে দুইটি মাজহাব হল। কুরআন করীম ও হাদিস শরীফে বর্নিত যথোপযুক্ত ঈমান, কেবলমাত্র এই দুই ইমামের দ্বারা অবহিত করা ঈমানের সাথেই মিলে। 'ফিরকা-ই নাজিয়া' বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল তথা আহলি সুন্নাতের ঈমানী মতবাদকে সারা বিশ্বে এই দুজনের মাধ্যমেই ছড়িয়েছে। তাঁদের একজন হলেন, **হযরত আবুল হাসান আল-আশ্‌আরী** রহমতুল্লাহি আলাইহি, যিনি ২৬৬ হিজরীতে বসরায় জন্মগ্রহণ করেছেন ও তিনশত ত্রিশ হিজরীতে [৯৪১ খৃস্টাব্দে] বাগদাদে ইন্তিকাল করেছেন। আর দ্বিতীয়জন হলেন **হযরত আবু মানসুর আল-মাতুরিদী**, যিনি ৩৩৩ হিজরীতে [৯৪৪ খৃস্টাব্দে] সমরকন্দে ইন্তিকাল করেছেন। এই দুইজন ইমাম, ঈমানের একইরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মাঝে কতিপয় মতপার্থক্য রয়েছে। তবে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। হাক্বীকতের বিবেচনায় তা একই। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য, ইতিক্বাদের বিষয়ে এই দুই ইমামের মাঝ থেকে কোন একজনের অনুসরণ করা আবশ্যক।

আওলিয়াদের তরিকসমূহ হক্ক। ইসলামিয়্যাতের সাথে কোনভাবেই সাংঘর্ষিক নয়। [সবসময়ই দ্বীনকে ব্যবহার করে দুনিয়া অর্জনের চেষ্টায় লিপ্ত

ভণ্ড ও প্রতারকরা ছিল। এটা সব পেশাতেই আছে। কিছু খারাপ লোকের জন্য সম্পূর্ণ তাসাওউফ'কে মন্দ বলা অনুচিত। এর দ্বারা মূলত ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদেরই সহায়তা করা হবে। একারণে ভণ্ড আলেম, জাহিল ও প্রতারক তরিকতপন্থীদের দেখে, ইসলামের প্রকৃত আলেমদের এবং যাদের খেদমত ইতিহাসের পাতায় স্বর্নাক্ষরে লিখা সে সকল বুজুর্গ আওলিয়ার প্রতি কটাক্ষ করা অনুচিত। এরূপ করা যে কত বড় অন্যায় তা বুঝা উচিত।] আওলিয়াদের দ্বারা কারামত প্রকাশিত হয়। সেগুলিও হক্ব। ইমাম আবদুল্লাহ ইয়াফি[29] বলেছেন যে, "গাওসুস্ সাকালাইন হযরত মাওলানা আব্দুল কাদির জিলানী কাদ্দাসাল্লাহু তাআ'লা

সির্‌রুহুল আজিজের[30] কারামতসমূহ মুখেমুখে এতটাই প্রচারিত হয়েছে যে, এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা, অবিশ্বাস করা অসম্ভব। কেননা বিভিন্ন জনের দ্বারা সর্বত্র ছড়ানোর কারণে অর্থাৎ [**তাওয়াতুর**] হওয়ায়, সনদ হিসেবে বিবেচিত হয়"।

নামাজ আদায়কারী কোন ব্যক্তিকে, কুফরের কারণ হিসেবে বিবেচিত কোন কিছু জরুরত না থাকা সত্ত্বেও বলতে বা করতে দেখে, তার কাফির হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে অন্যকে অনুসরণ করে তাঁকে কাফির বলা জায়েজ নয়। কাফির হিসেবে মৃত্যু হয়েছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে কাউকে অভিশাপ দেয়া উচিত নয়। এমনকি কাফিরকেও অভিশাপ না দেয়া উত্তম। [একারণে ইয়াজিদের প্রতি অভিশাপ না দেয়াই শ্রেয়।]

৫- ঈমান গ্রহণ আবশ্যক এমন ছয়টি বিষয়ের পঞ্চমটি হল, **আখেরাতের উপর ঈমান**। এই সময়ের সূচনা, মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে শুরু হয়। কিয়ামতের শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে। একে শেষ দিবস বলার কারণ হল, এরপরে আর রাতের আগমন হবে না এজন্য অথবা দুনিয়ার সময়ের পরে আসার কারণে। কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে এব্যাপারে আমাদেরকে অবহিত করা হয়নি। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কিয়ামতের

---

[29] হযরত আবদুল্লাহ ইয়াফি, ৭৬৮ হিজরীতে (১৩৬৭ খৃস্টাব্দে) মক্কা নগরীতে ইনতিকাল করেন।

[30] হযরত আব্দুল কাদির জিলানী, ৫৬১ হিজরীতে (১১৬১ খৃস্টাব্দে) বাগদাদে ইনতিকাল করেন।

আলামত সম্পর্কে আমাদের সংবাদ দিয়েছেন। হযরত মেহেদীর আগমন হবে, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম আসমান থেকে শাম নগরীতে অবতীর্ন হবেন। দাজ্জাল বের হবে। ইয়াজুজ ও মাজুজ সব জায়গা তছনছ করে দিবে। সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। প্রচণ্ড ভূমিকম্প হবে। দ্বীনী ইলম্ বিলুপ্ত হবে। পাপাচার বৃদ্ধি পাবে। সর্বত্র হারাম সম্পাদিত হবে। ইয়েমেন থেকে আগুন বের হবে। আসমান ও পর্বতসমূহ চূর্নবিচূর্ন হবে। সূর্য ও চন্দ্র নিভে যাবে। সাগর মহাসাগর পরস্পর মিশে যাবে, ফুটে বাষ্প হয়ে শুকিয়ে যাবে।

গুনাহ সম্পাদনকারী মুসলমানকে **ফাসিক** বলা হয়। ফাসিক ও সকল কাফির কবরে আযাবের সম্মুখীন হবে। এ ব্যাপারে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। মূর্দাকে কবরে রাখার পরে, অজানা এক হায়াতের দ্বারা জীবিত করা হবে। পরে সেখানে শান্তিতে বিশ্রাম নিবে অথবা শাস্তি ভোগ করবে। **মুনকার** ও **নাকির** নামক ফেরেশতাদ্বয়ের, অজানা ও ভয়ংকর মানুষের রূপে কবরে এসে প্রশ্ন করার বিষয়ে, হাদিস শরীফসমূহে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। কবরের সওয়াল, কিছু আলেমের মতে আকাঈদের কিছু অংশের উপর হবে, আর কিছু আলেমের মতে সম্পূর্ণ আকাঈদের উপর হবে। [এজন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিজেদের মুখস্ত করা এবং শিশুদেরকেও মুখস্ত কোরানো উচিত। 'আল্লাহ্ তা'আলা আমার রব, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পয়গম্বর, ইসলাম আমার দ্বীন, কুরআন করীম আমার কিতাব, কা'বা শরীফ আমার কিবলা, ইতিক্বাদের ক্ষেত্রে আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত আমার মাজহাব আর আমলের ক্ষেত্রে ইমামে আযম আবু হানিফার মাজহাব আমার মাজহাব'। যারা আহলি সুন্নাতের অনুসারী নয় তারা সঠিক উত্তর দিতে পারবে না। '**তাযকিরা-ই কুরতুবী**'[31]তে এরূপ বর্নিত হয়েছে।] যারা সুন্দর উত্তর দিতে পারবে তাদের কবর প্রশস্ত হবে এবং সেখান থেকে জান্নাতের দিকে একটি জানালা খুলে দেয়া হবে। সকাল-সন্ধ্যা, জান্নাতের যে স্থান তাদেরকে দেয়া হবে তা আগে থেকেই দেখতে পারবে, ফেরেশতাদের মারফৎ সুসংবাদ প্রাপ্ত হবে ও বিশেষ খেদমত পেতে থাকবে। সঠিক জবাব দিতে না পারলে লোহার হাতুড়ী দিয়ে এমনভাবে প্রহার করা হবে যে মানুষ ও জ্বিন বাদে সকল মাখলুক তাদের আর্তচিৎকার

[31] 'তাযকরিা'র মুয়াল্লফি মুহাম্মদ কুরতুবী মালকিী, ৬৭১ হজিরীতে (১২৭২ খৃস্টাব্দে) ইনতকিাল করছেনে।

শুনতে পাবে। তাদের জন্য কবর এতটাই সংকীর্ণ হবে যে, এর চাপে, পাঁজরের একপাশের হাড্ডি অন্য পাশের হাড্ডির মাঝে প্রবেশ করবে। সেখান থেকে জাহান্নামের দিকে একটি জানালা খুলে দেয়া হবে। সকাল-সন্ধ্যা, জাহান্নামের যে স্থান তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তা দেখতে পারবে, আর কবরে কিয়ামত পর্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

মৃত্যুর পরে, পুনরায় জীবিত হওয়ার বিষয়টি বিশ্বাস করা আবশ্যক। গোশত ও হাড্ডি পচে মাটি ও গ্যাসে পরিণত হওয়ার পরে, পুনরায় দেহ সৃষ্টি করা হবে। রূহসমূহ ঐ দেহে প্রবেশ করবে, এরপর কবর থেকে প্রত্যেকেরই পুনরুত্থান হবে। একারণেই এই সময়কে, **কিয়ামতের দিবস** বলা হয়।

[উদ্ভিদ, বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস আর মাটি থেকে পানি ও লবণ তথা মাটির বিভিন্ন উপাদানকে গ্রহণ করে মিশ্রিত করে। এভাবেই, জীব দেহের ও আমাদের অঙ্গের মূল উপাদানের উৎপত্তি হয়। কয়েক বছর সময়ের প্রয়োজন এমন কোন এক রাসয়নিক বিক্রিয়ায়, 'কাটালিযার' ব্যবহার করে এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে সম্পাদন করা সম্ভব, বর্তমানে আমরা তা জানি। এরই মত, আল্লাহ্ তা'আলা, কবরে পানি, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও মাটির উপাদানসমূহকে একত্রিত করে, এক মুহূর্তে দেহ সৃষ্টি করবেন। এভাবে পুনরুত্থান হওয়ার ব্যাপারে, মুখবির-ই সাদিক খবর দিচ্ছে। বিজ্ঞান ও এর সমর্থন করে।]

সকলকে **হাশরে**র ময়দানে একত্রিত করা হবে। প্রত্যেক ইনসানের আমল দফতর উড়ে উড়ে হাতে আসবে। এগুলি, আসমান ও জমিন, অণু-পরমাণু, গ্রহ-নক্ষত্রের স্রষ্টা, সীমাহীন কুদরতের অধিকারী আল্লাহ্ তা'আলা করবেন। এসবের সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর প্রদান করেছেন।

সালিহ তথা পুণ্যবানদের আমল দফতর ডান হাতে আর মন্দদের আমলনামা পিছন থেকে কিংবা বাম দিক থেকে প্রদান করা হবে। ভাল, মন্দ, ছোট, বড়, গোপন, প্রকাশ্য সবকিছুই আমল দফতরে লিপিবদ্ধ থাকবে। **কিরামান কাতিবীনের** না জানা কর্মও অঙ্গের নিজেদের খবর দেয়ার মাধ্যমে অথবা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে জানানো হবে। সবকিছুর জন্যই সওয়াল করা

হবে, হিসাব নেয়া হবে। হাশরের ময়দানে, আল্লাহ্ তা'আলা যতটুকু ইরাদা করবেন তদনুযায়ী সকল গোপন জিনিস প্রকাশ পাবে। ফেরেশতাদেরকে, আকাশে ও জমিনে কি করেছেন? পয়গম্বরদেরকে আলাইহিমুস্ সালাওয়াত, আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমসমূহকে তাঁর বান্দাদেরকে কিভাবে জানিয়েছেন? অন্য সকলকে, পয়গম্বরদেরকে কিভাবে আনুগত্য করেছ? তোমাদেরকে অবহিত করা দ্বায়িত্বসমূহ কিভাবে পালন করেছ? পরস্পরের মাঝের হক্কসমূহ কিভাবে আদায় করেছ? বলে সওয়াল করা হবে। যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে ও উত্তম আখলাকের অধিকারী হয়েছে তারা উত্তম পুরস্কার ও অশেষ ইহসান প্রাপ্ত হবে। পাপকার্য সম্পাদনকারী ও ঈমানহীনদের কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা, আপন ইরাদা অনুযায়ী মুমিনদের ছোট-বড় সকল গুনাহ নিজের দয়া, অনুগ্রহ ও ইহসানের দ্বারা ক্ষমা করে দিবেন। শিরক ও কুফর ব্যতীত অন্য যে কোন গুনাহ, আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে ক্ষমা করে দিবেন। আবার চাইলে আদালতের দ্বারা ছোট গুনাহের জন্যও অনেককে শাস্তি ভোগ করাবেন। তবে যারা মুশরিক ও কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমা করবেন না, এ ব্যাপারে কুরআন করীম ও হাদিস শরীফে স্পষ্টভাবে অবহিত করা হয়েছে। আহলে কিতাব বা কিতাবহীন কাফির, অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমগ্র মানব জাতির পয়গম্বর হিসেবে মেনে নেয়নি, তাঁর আনীত আহকামের কোন একটিকেও যারা অপছন্দ করেছে এবং ঐ অবস্থায় মৃতয় বরণ করেছে তারা অবশ্যই কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

কিয়ামতের দিনে, আমল পরিমাপের জন্য **মিজান** (পরিমাপক) রয়েছে। এর এক একপাশে আসমান ও জমিনকে রাখা সম্ভব। সওয়াবের দিক সর্বদা উজ্জ্বল হবে। এবং তা আরশের ডান পাশে, জান্নাতের দিকে থাকবে। গুনাহ মাপার দিকটি অন্ধকারময় হবে ও জাহান্নামের দিকে থাকবে। দুনিয়ার যাবতীয় কর্ম, কথা, চিন্তা, কল্পনা, দৃষ্টি সবকিছুই আকার ধারণ করবে ও পাল্লায় মাপা হবে। এই মিজান দুনিয়ার পাল্লার মত নয়। এর ভারী পাশ উপরে উঠবে ও হালকা হওয়া পাশ নিচে থাকবে। কিছু আলেমের মতে অনেক ধরণের পাল্লা বিদ্যমান থাকবে। অধিকাংশ আলেমের মতে যেহেতু এব্যাপারে দ্বীনে স্পষ্ট করে বলা নাই, তাই এর ধরণ নিয়ে না ভাবাই উত্তম।

মহান আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে জাহান্নামের উপরে **পুলসিরাত** স্থাপন করা হবে। সকলকেই এই পুলের উপর দিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ করা হবে। যারা জান্নাতবাসী হবেন তারা সহজেই পার হয়ে যাবেন। তাদের কেউ বিজলীর গতিতে, কেউ বাতাসের, কেউ ছুটন্ত ঘোড়ার বেগে পুল অতিক্রম করবে। পুলসিরাত চুলের চেয়েও চিকণ এবং তলোয়ারের চেয়েও অধিক ধারালো হবে। যারা দুনিয়াতে নাফসের নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে তারা সহজে পার হবে। ইসলামিয়্যাতকে যারা অনুসরণ করেনি ও নাফসের কামনার কাছে পরাস্থ হয়েছে তারা সিরাত পার হওয়ার সময় অনেক সমস্যার মুখোমুখি হবে। অনেকে জাহান্নামে পতিত হবে। এজন্যই ইসলামিয়্যাতকে '**সীরাত-ই মুসতাকিম**' বলা হয়েছে। দুনিয়াতে নাফসের অনুসরণকারী মুসলমানরা বহু কষ্টে পার হবে। জাহান্নামীরা তা পার হতে পারবে না। ওখান থেকে পিছলে জাহান্নামে পতিত হবে।

সেখানে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বিশেষ '**হাওজে কাওসার**'ও বিদ্যমান থাকবে। যা এক মাসের পথের সমান প্রশস্ত হবে। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা হবে। ঘ্রাণ মিসক্-আম্বরের চেয়েও মধুর হবে। যে এখান থেকে একবার পান করবে সে আর কখনোই পিপাসা অনুভব করবে না।

শাফায়াত হক্ব। তওবাহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী মুমিনদের সগীরা ও কবীরা গুনাহ মাফের জন্য পয়গম্বরগণ, অলীগন, সালিহ তথা পুণ্যবানরা, আলেমগণ, ফেরেশতাগণ, শহীদগণ এবং মহান আল্লাহ্ তা'আলা যাদের অনুমতি দিবেন তারা শাফায়াত করতে পারবেন, এবং ইনশাল্লাহ তা কবুল করাও হবে। [হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, "**আমার উম্মতের মধ্য থেকে কবীরা গুনাহ সাম্পাদনকারীদের জন্য আমি শাফায়াত করব**"।] হাশরের ময়দানে পাঁচ ধরণের শাফায়াত হবে।

প্রথমটি, কিয়ামতের দিবসে হাশরের ময়দানে পাপ নিয়ে দীর্ঘ সারিতে অপেক্ষমাণ গুনাহগাররা ফরিয়াদ করবে। তাদের দ্রুত হিসাবের জন্য শাফায়াত করা হবে।

দ্বিতীয়ত, সওয়াল ও হিসাবের সহজ হওয়ার জন্য শাফায়াত করা হবে।

তৃতীয়ত, গুনাহগার মুমিনরা যাতে সিরাত থেকে জাহান্নামে পতিত না হয় সেজন্য শাফায়াত করা হবে।

চতুর্থত, বহু গুনাহ সম্পাদনকারী মুমিনদের জাহান্নাম থেকে মুক্ত করানোর জন্য শাফায়াত করা হবে।

পঞ্চমত, জান্নাতে সীমাহীন নিয়ামত দেয়া হবে। তবে এর আটটি স্তর রয়েছে। সকলে নিজ যোগ্যতা, মর্যাদা, ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরের জান্নাত লাভ করবে। জান্নাতবাসীদের পর্যায়ের উন্নতির জন্যও শাফায়াত করা হবে।

জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান। জান্নাত সাত আসমানের উপর অবস্থিত। জাহান্নাম সর্বনিম্নে অবস্থিত। জান্নাতের আটটি দরোজা রয়েছে। প্রত্যেক দরোজা দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জান্নাতে প্রবেশ করা যায়। জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর থেকে সপ্তম স্তর পর্যন্ত যত নিচে যাওয়া হয়, আজাবের তীব্রতা ততই বৃদ্ধি পায়।

৬- ঈমান গ্রহণ আবশ্যক এমন ছয়টি বিষয়ের ষষ্ঠটি হল, **কদরে অর্থাৎ ভাল, মন্দ সবকিছুই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই হয় তা বিশ্বাস করা**। কদরে বিশ্বাস বলতে, ভাল ও মন্দ যা কিছুই হয় তার সবই আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয় এই বলে সাক্ষ্য দেয়াকে বুঝায়। মানুষের জীবনে ভাল ও মন্দ, লাভ ও ক্ষতি, অর্জন ও হরণ এর সবই আল্লাহ্‌ তা'আলার তাকদীর অনুযায়ীই হয়।'**কদর**' শব্দের আভিধানিক অর্থ: পরিমাপ নির্ধারণ, হুকুম তথা শাসন করা, আধিপত্য করা, আদেশ দেয়া ইত্যাদি। আধিক্য বা বড়ত্ব অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন কিছুকে অস্তিত্ব প্রদানের ইরাদা করাকে কদর বলা হয়। এই কদরের অর্থাৎ যার জন্য অস্তিত্বপ্রাপ্তির ইচ্ছা করা হয়েছে তার অস্তিত্ব লাভ করাকে '**ক্বাযা**' বলা হয়। কদর ও ক্বাযা শব্দ দুইটি একে অপরের স্থানেও ব্যবহৃত হয়। সেক্ষেত্রে 'ক্বাযা'র অর্থ, অনাদি থেকে অনন্ত পর্যন্ত যা কিছু সৃষ্টি হয় তার সবকিছুর জন্য অনাদিতে আল্লাহ্‌ তা'আলার ইরাদা করা। আর সবকিছুর সেই 'ক্বাযা' অনুযায়ী যথাযথভাবে অর্থাৎ কোন ধরণের কমতি বা বাড়তি না হয়ে সৃষ্ট হওয়াকে 'কদর' বলা হয়। আর এই জ্ঞানকে '**ক্বাযা**' ও '**কদর**' বলা হয়। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকরা একে অনাদি সত্ত্বার অনুগ্রহ (ইনায়াত-ই

আযালিয়্যা) হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। অস্তিত্বশীল সবকিছু ঐ 'ক্বাযা' থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলার অনাদি (আযেলী) ইলম অনুযায়ী সৃষ্টি জগতের অস্তিত্ব অর্জন করাকে ক্বাযা ও কদর বলা হয়। কদরে ঈমান আনার জন্য এই বিষয়ে উত্তমরূপে জানা ও বিশ্বাস করা জরুরী যে, মহান আল্লাহ্ তা'আলা কোন কিছু সৃষ্টি করার জন্য অনাদিতে ইরাদা বা ইচ্ছা পোষণ করে থাকলে, কোন ধরণের কমতি বা বাড়তি না হয়ে ঐ ইরাদা অনুযায়ী যথাযথভাবে তার অস্তিত্ব অর্জন করা আবশ্যক হয়। তাঁর কোন কিছুর জন্য অস্তিত্বের ইরাদা করার পর তা সৃষ্ট না হওয়া কিংবা কোন কিছুর অনস্তিত্ব ইরাদার পর তার অস্তিত্ব লাভ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

সমস্ত পশু,পাখি, উদ্ভিদ, জীব ও জড় সবকিছুর হওয়া বা না হওয়া, বান্দার উত্তম ও মন্দ আমলসমূহ, দুনিয়া ও আখেরাতে কৃত কর্মের শাস্তি ভোগ করা বা না করা ইত্যাদির সবই অনাদি ও অনন্তভাবে আল্লাহ্ তা'য়ালার ইলমে রয়েছে। সময়ের সূচনার পূর্ব থেকে সময়ের সমাপ্তির পর পর্যন্ত সবকিছু তাঁর ইলমে রয়েছে। তাঁর ইলমে যেভাবে রয়েছে সেভাবেই তা সৃষ্টি হতে থাকে। সকল বস্তু, অণু, পরমাণু, তাদের ক্রিয়া, বিক্রিয়া, জীব ও প্রাণীর বাঁচা, মরা, মানুষের ভাল, মন্দ সকল কর্মকাণ্ড, মুসলমান অথবা কাফির হওয়া, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত আমলসমূহ সহ জগতের যাবতীয় সবকিছু তিনি সৃষ্টি করছেন। স্রষ্টা একমাত্র তিনিই। কোন কিছু হওয়ার জন্য যে সবব বা কারণ আমরা দেখতে পাই সেগুলিকেও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। **(দুনিয়াতে সবকিছু তিনি সববের মাধ্যমে সৃষ্টি করেন।)**

উদাহরণস্বরূপ, আগুন জ্বালায়। কিন্তু জ্বলন সৃষ্টিকারী হলেন আল্লাহ্ তা'য়ালা। আগুনের নিজের জ্বালানোর মত কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু আদাত (রীতি) বা কানুন এরূপ যে, আগুন কোন কিছুকে স্পর্শ করলে জ্বালায়। [প্রকৃতপক্ষে আগুন জ্বালায় না, আগুন বস্তুর কাঠামোতে অবস্থিত কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মাঝে আকর্ষনের উদ্রেককারী, ইলেকট্রনের আদান-প্রদানের ব্যবস্থাকারীও নয়। যারা প্রকৃত সত্য দেখতে পায় না, তারা মনে করে আগুনই জ্বালায়। বাস্তবে জ্বলন ক্রিয়া সম্পাদনকারী আগুন নয়, অক্সিজেনও নয়, তাপও নয়, ইলেকট্রনের আদান-প্রদানও নয়। বরং প্রকৃত কর্তা শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলা। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলিকে জ্বলনের সবব্ বা

কারণ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। অজ্ঞ ব্যক্তি ভাবে আগুন জ্বালায়, প্রাথমিক বিদ্যালয় সমাপনকারী ব্যক্তি ঐ কথা মানবে না, তার মতে বাতাস জ্বালায়। নিম্ন মাধ্যমিক সমাপনকারী বলবে, বাতাস না বরং বাতাসের মাঝের অক্সিজেন জ্বালায়। উচ্চ মাধ্যমিক সমাপনকারী তার এই কথা মানবে না, সে বলবে জ্বলন শুধুমাত্র অক্সিজেনের সাথে সম্পর্কিত নয়। ইলেকট্রন আকর্ষনকারী সকল উপাদানই জ্বালায়। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ব্যক্তি, জ্বলনের ক্ষেত্রে পদার্থের সাথে সাথে শক্তিরও হিসাব করবে। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, ব্যক্তির জ্ঞানের গভীরতা যতই বাড়ে, প্রকৃত বাস্তবতার ততই নিকটবর্তী হয়। একইসাথে তারা এটাও উপলব্ধি করে যে, প্রত্যেকটি ক্রিয়ার জন্য যা কিছুকে সবব্ বা কারণ ভাবা হয় আসলে সেগুলির পিছনে আরো বহু কারণ বিদ্যমান। ইলম্ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণকারী ও সবকিছুর প্রকৃত হাক্বীকতকে পরিপূর্ণরূপে অবলোকনকারী পয়গম্বরগণ আলাইহিমুস্ সালাম এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী ও ইলম্ দরিয়া থেকে ফোঁটা ফোঁটা জ্ঞান অর্জনকারী ইসলামের আলেমগণ রাহিমাহুমুল্লাহু তা'আলা এ ব্যাপারে আমাদেরকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। তাঁরা আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা কিছুকে কর্তা বা দহনকারী মনে হয় সেগুলি আসলে ক্ষমতাহীন, শক্তিহীন অসহায় একেকটি মাধ্যম ও মাখলুক মাত্র। প্রকৃত কর্তা বা স্রষ্টা কোনোভাবেই ঐ সকল সবব্ হতে পারে না। একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলাই হলেন প্রকৃত কর্তা ও স্রষ্টা।] প্রকৃত দহনকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। আগুন ছাড়াও তিনি জ্বালাতে পারেন। কিন্তু আগুনের দ্বারা জ্বালানোকে তিনি 'আদত' বা রীতি করেছেন। তিনি জ্বালাতে না চাইলে আগুনের পক্ষে জ্বালানো সম্ভব নয়। একারণেই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে আগুন জ্বালাতে পারেনি। মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ভালোবেসে আদতকে তাঁর জন্য স্থগিত করেছিলেন। [এছাড়া তিনি আগুনের জ্বলন ক্রিয়াকে নিস্ক্রিয় করতে পারে এমন পদার্থও সৃষ্টি করেছেন। রসায়নবিদগণ এমন অনেক পদার্থ আবিষ্কার করছেন।]

আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে সবকিছু সবব্হীনভাবেও সৃষ্টি করতে পারতেন। আগুন ছাড়াও জ্বালাতে পারতেন। খাবার ছাড়াই ক্ষুধা নিবারণ করাতে পারতেন। বিমান ছাড়াই উড়াতে পারতেন। বেতারযন্ত্র ব্যতীতই দূরের আওয়াজ শুনাতে পারতেন। কিন্তু অনুগ্রহ করে সবকিছুর সৃষ্টিকে কোন না কোন সববের সাথে

সম্পর্কিত করেছেন। সবকিছুকেই নির্দিষ্ট বিভিন্ন সববের দ্বারা সৃষ্টির ইরাদা করেছেন। নিজের কুদরতকে সবব নামক পর্দার আড়াল করেছেন। কেউ তাঁর দ্বারা কোন কিছুর সৃষ্টির ব্যাপারে প্রার্থনা করলে, তার উচিত ঐ জিনিসের সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্ তা’আলা যে সকল সবব্‌কে আদত করেছেন সেগুলিকে আঁকড়ে ধরা। যথাযথভাবে সবব্‌কে আঁকড়ে ধরা বা পালন করা হলে আল্লাহ্ তা’আলা তা সৃষ্টি করেন। [কেউ মোম জ্বালাতে চাইলে দিয়াশলাই ব্যবহার করে। মাথা ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে ঔষধ সেবন করে। জান্নাতে প্রবেশ করে সীমাহীন নিয়ামত উপভোগের সুযোগ পেতে আগ্রহী ব্যক্তি ইসলামিয়্যাতের অনুসরণ করে। একইভাবে বিষ খেলে মৃত্যু হয়। ঈমান গ্রহণ না করলে জাহান্নামে যেতে হয়। গুনাহ করলে আযাব ভোগ করতে হয়। যে যেই জিনিসের সবব্‌কে পালন করবে সে তার সুপরিণতি বা কুপরিণতি ভোগ করবে। সকলের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। মুসলমানদের কিতাব পড়লে ইসলামকে জানতে পারবে, ইসলামকে সঠিকভাবে জানলে ইসলামকে ভালবাসবে ও তদনুযায়ী জীবন যাপন করলে খাঁটি মুসলমান হবে। অবিশ্বাসী ও মাজহাব বিরোধীদের সাথে বসবাস করলে, তাদের কথাবার্তা শুনলে দ্বীনের বিষয়ে জাহিল হবে। আর দ্বীন-জাহিলদের অধিকাংশই কাফির হয়। মানুষ যেই গন্তব্যের পথের বাহনে আরোহণ করে সেই গন্তব্যেই পৌঁছায়।]

মহান আল্লাহ্ তা’আলা যখন তাজাল্লী করেন
সব কিছু সহজেই ভাস্তবায়ন করেন।
তার জন্য প্রয়োজনীয় সববসমূহ সৃষ্টি করেন,
এক পলকেই তা ইহসান করেন।

আল্লাহ্ তা’আলা যদি সবব সৃষ্টি না করতেন, কেউ কারো মুখাপেক্ষী হত না। সকলেই সবকিছু সরাসরি আল্লাহ্ তা’আলার নিকট চাইত। অন্য কারো বা কিছুর দ্বারস্থ হত না। এরূপ হলে মানুষের মাঝে শাসক, প্রজা, শ্রমিক, শিল্পী, ছাত্র, শিক্ষক ইত্যাদির মত বহু মানবিক সম্পর্ক স্থাপিত হত না। দুনিয়া ও আখেরাতের শৃঙ্খলা নষ্ট হত। সুন্দর ও কুৎসিত, ভাল ও মন্দ, অনুগত ও অবাধ্যের মাঝে কোন পার্থক্য থাকত না।

আল্লাহ্ তা’আলা চাইলে আদত বা রীতিকে অন্যভাবেও নির্ধারন করতে পারতেন। তখন সবকিছুই ঐ আদত অনুযায়ীই সৃষ্টি করতেন। যেমন, তিনি

চাইলে কাফিরদেরকে, দুনিয়াবী ভোগ-বিলাসে লিপ্তদেরকে, অত্যাচারীদেরকে, ধোকাবাজদেরকে জান্নাতে স্থান দিতে পারতেন। একইভাবে ঈমানদারদেরকে, ইবাদতকারীদেরকে, সৎকর্মশীলদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারতেন। কিন্তু বহু আয়াতে করীমা ও হাদিস শরীফের দ্বারা আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, তাঁর ইরাদা এইরূপ নয়।

মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড, চলন আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেন, তা মানুষের ইচ্ছার অনুরূপ বা বিপরীত যাই হোক না কেন। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে **ইখতিয়ার** (পছন্দ শক্তি) বা **ইরাদা**র (ইচ্ছা শক্তি) ক্ষমতা দিয়েছেন। মানুষের এই ইখতিয়ার ও ইরাদাকে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের কর্মের জন্য সবব্ হিসেবে নির্ধারন করেছেন। মানুষ কোন কিছু করতে চাইলে অর্থাৎ ইখতিয়ার করলে আর আল্লাহ্ তা'আলাও তা ইরাদা করলে তা সৃষ্টি করেন। বান্দা কোন কিছু না চাইলে, আল্লাহ্ তা'আলাও তা ইরাদা না করলে, সৃষ্টি করেন না। কোন কিছু শুধুমাত্র বান্দার ইচ্ছার কারণে সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ্ তা'আলাও যদি তা ইরাদা করেন কেবল তখনই তা সৃষ্টি করেন। কোন কিছুতে আগুন লাগলে তিনি যেমন সেখানে দহন সৃষ্টি করেন কিংবা আগুন না লাগলে দহনের সৃষ্টি করেন না, একইভাবে বান্দার ইরাদাকৃত বিষয়ের সৃষ্টি করাও অনুরূপ। ধারালো ছুরি কোন কিছুর সাথে লাগলে তিনি সেখানে কর্তনের সৃষ্টি করেন। এখানে ছুরি কর্তনকারী নয়। প্রকৃত কর্তনকারী হলেন মহান আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি কর্তনের জন্য ছুরিকে সবব্ হিসেবে নির্ধারন করেছেন। অর্থাৎ বান্দার ইখতিয়ারকৃত বিষয় বা ইরাদাকৃত কর্মের সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা, বান্দার ইচ্ছা বা পছন্দকেই সবব্ হিসেবে নির্ধারন করেছেন। কিন্তু প্রাকৃতিক কর্মকাণ্ড বান্দার ইখতিয়ারের সাথে সম্পর্কিত নয়। এগুলি কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলার ইরাদা অনুযায়ী ভিন্ন সবব্সমূহের দ্বারা সৃষ্টি হয়। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, অণু-পরমাণু, ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া তথা সবকিছুর উপাদান, বৈশিষ্ট্য ও যাবতীয় ক্রিয়াসমূহের স্রষ্টা একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি ব্যতীত আর কোন স্রষ্টা নাই। তবে জড় পদার্থের ক্রিয়া আর মানুষ ও পশুপাখির ইখতিয়ারী তথা ইচ্ছাকৃত ক্রিয়ার মাঝের পার্থক্য হল, বান্দা কোন কিছু করতে ইরাদা করলে, সে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলারও ইরাদা থাকলে তিনি বান্দাকে তা করার কুদরত প্রদান করেন ও সেই ক্রিয়া সৃষ্টি করেন। বান্দার নিজের নড়াচড়ার

করারও কোন ক্ষমতা নাই। এমনকি কিভাবে নড়াচড়া করা হয় সে ব্যাপারেও তার সম্যক ধারণা নাই। [মানুষের প্রতিটি ক্রিয়া, অসংখ্য ভৌতিক ও রাসায়নিক ঘটনার দ্বারা অর্জিত হয়।] জড় পদার্থের ক্রিয়াবিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাদের কোন **ইখতিয়ার** বিদ্যমান নাই। যেমন, আগুন কোন কিছুর সংস্পর্শে আসলে সেখানে জ্বলনের সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে আগুনের ইচ্ছার কোন অস্তিত্ব নাই।

[প্রিয় বান্দাদের উত্তম ও উপকারী ইচ্ছাগুলিকে আল্লাহ্ তা'আলাও ইরাদা করেন ও সৃষ্টি করেন। তাঁদের মন্দ ও ক্ষতিকর ইচ্ছাগুলিকে তিনি ইরাদা করেন না এবং সৃষ্টিও করেন না। একারণে তাঁর এই ধরণের প্রিয় বান্দাদের থেকে শুধুমাত্র উত্তম ও উপকারী কর্মই প্রকাশ পায়। তাঁর প্রিয় বান্দারা কখনো কখনো নিজেদের ইচ্ছার বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে মনঃক্ষুন্ন হয়। কিন্তু যদি এভাবে ভাবত যে, ঐ অপূর্ণ ইচ্ছাগুলি ক্ষতিকর হওয়ার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেননি তাহলে একটুও মনঃক্ষুন্ন হত না, বরং এই উপলব্ধির কারণে আনন্দিত হত, আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করত। মানুষের নিজের ইচ্ছাকৃত ও নির্বাচিত কর্মগুলিকে তাদের ক্বালবের দ্বারা ইখতিয়ার (নির্বাচন) ও ইরাদা (ইচ্ছা) করার পর তদনুযায়ী সৃষ্টি করাকে, মহান আল্লাহ্ তা'আলা অনাদিতেই ইরাদা করেছেন। মানুষের ইখতিয়ার ও ইরাদাকে এইভাবে মূল্যায়নের ব্যাপারে তাঁর ইরাদা আযেলী (অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান)। যদি তা আযেলী না হত, তবে আমাদের সমস্ত ক্রিয়া বাধ্যতামূলক হত। বান্দার ইরাদা অস্তিত্বহীন হত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা অনাদিতে এব্যাপারে এইরূপ ইরাদা করাতে, বান্দার ক্বালবের দ্বারা ইখতিয়ার বা ইরাদার পরে ক্রিয়াসমূহ সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ সর্ববস্থায় মহান আল্লাহ্ তা'আলার ইরাদাই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে।]

মানুষের ইচ্ছাকৃত কাজগুলি দুইটি জিনিসের উপর নির্ভর করে। প্রথমটি হল বান্দার ক্বালবের ইখতিয়ার বা ইরাদার (পছন্দ ও ইচ্ছা করার) ক্ষমতা। একারণেই বান্দার কাজকে '**কাস্ব**' (অর্জন) বলা হয়। কাস্ব মানুষের সিফাত। দ্বিতীয়টি হল আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি করা বা অস্তিত্ব প্রদান করা। মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ বা নিষেধ করা কিংবা সওয়াব বা আযাব দেয়ার কারণ হল মানুষের মাঝে এই কাস্বের অস্তিত্ব থাকা। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা **সাফফাত**'এর ছিয়ানব্বইতম আয়াতে করীমায় (তাফসীর আলেমদের প্রদত্ত অর্থ অনুযায়ী) বলেছেন, "**আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এবং তোমাদের**

কাজসমূহকে সৃষ্টি করেছেন"। এই আয়াতে করীমা, মানুষের কাস্‌ব অর্থাৎ তার ক্রিয়ার মাঝে ক্বালবের ইখতিয়ারের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। একে **'জুজ-ই ইখতিয়ার'** (আংশিক ইচ্ছাশক্তি) বলা হয়। ইহা 'জাবর্'এর (জবরদস্তীর) অনস্তিত্বকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। কেননা আয়াতে করীমায় '**মানুষের কাজ**' বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়: আলী মারছে। একইসাথে এই আয়াতে করীমা আমাদেরকে এ বিষয়েও অবহিত করে যে, সবকিছুই ক্বাযা ও কদরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

বান্দার কাজ বা ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার জন্য কিংবা সৃষ্টি হওয়ার জন্য, প্রথমে ঐ ক্রিয়ার ব্যাপারে বান্দার ক্বালবের ইরাদা বা ইখতিয়ার করা আবশ্যক। বান্দা নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কোন কিছু ইরাদা করে। তার এই ইচ্ছার প্রকাশকে বা নির্বাচনকে '**কাসব্**' (অর্জন) বলা হয়। ইমাম আমিদী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে, ক্রিয়ার সৃষ্টির ক্ষেত্রে বান্দার এই কাসব্‌কে সবব্ করা হয়েছে, ক্রিয়ার সৃষ্টিতে এর প্রভাব (তা'ছির) রয়েছে। কেননা সৃষ্ট ক্রিয়া আর বান্দার ইখতিয়ারকৃত কৃয়া ভিন্ন নয়। তবে যদি বলা হয়, বান্দার ইখতিয়ারকৃত ক্রিয়ার সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই 'কাসব্'এর কোন প্রভাব নাই, তাতেও কোন ক্ষতি নাই। কেননা বান্দা যা ইচ্ছা করে তার সবই সৃষ্ট হয় না, আবার তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কিছু সৃষ্ট হয়। বান্দার সব ইচ্ছার সৃষ্ট হওয়া এবং সব অনিচ্ছার সৃষ্ট না হওয়া অসম্ভব। কেননা তা 'উলুহিয়্যাত'এর (স্রষ্টার) বৈশিষ্ট্য।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা অসীম করুণা, সীমাহীন দয়া ও অশেষ অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাদেরকে প্রয়োজন মোতাবেক সীমিত ক্ষমতা দিয়েছেন, যার দ্বারা বান্দা মহান আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ও নিষেধসমূহ পালন করতে পারে। যেমন, সুস্থ ও বিত্তশালী ব্যক্তি, জীবনে একবার হজ্বে যেতে পারে। আকাশে রমজানের হিলাল [চাঁদ] দেখে, প্রতি বছর এক মাস রোজা রাখতে পারে। চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় করতে পারে। নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি, হিজরী এক বছর পরে, মালের চল্লিশ ভাগের একভাগ পরিমাণ স্বর্ন ও রৌপ্য পৃথক করে মুসলমানদেরকে যাকাত হিসেবে প্রদান করতে পারে। দেখা যাচ্ছে যে, এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে জবরদস্তী করেন না। একধরণের স্বাধীনতা দান করেছেন। এর দ্বারাও মহান আল্লাহ্ তা'আলার বড়ত্ব প্রকাশ পায়। জাহিল ও নির্বোধরা, ক্বাযা ও কদরের

বিষয়টি বুঝতে না পারার কারণে, আহলে সুন্নাত আলেমদের বক্তব্যকে অবিশ্বাস করে। বান্দাকে দেয়া কুদরত ও ইখতিয়ারের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। তাদের মতে মানুষের ইখতিয়ারের স্বাধীনতা নাই। কৃতকর্মের ক্ষেত্রের নিজ ইরাদার কোন প্রভাব নাই। কিছু ক্ষেত্রে, বান্দার ইখতিয়ারের প্রকাশ দেখতে না পেয়ে সার্বিক অর্থেই বান্দাকে স্বীয় কর্মের ক্ষেত্রে বাধ্য মনে করে। এজন্য তারা আহলি সুন্নাত আলেমদের ব্যাপারে কটূক্তি করে। তাদের এই ভ্রান্ত বক্তব্যও আসলে তাদের মাঝে ইরাদা ও ইখতিয়ারের অস্তিত্বকে প্রকাশ করে।

কোন কাজ করার বা না করার ক্ষমতাকে ‘**কুদরত**’ বলে। করা বা না করার মাঝে কোন একটি বেঁছে নেয়াকে ‘**ইখতিয়ার**’ (নির্বাচন বা পছন্দ করা) বলে। বেঁছে নেয়ার পর তা করার ইচ্ছাকে ‘**ইরাদা**’ বলে। কোন কাজে সম্মতি দেয়া বা বাঁধা না দেয়াকে ‘**রিজা**’ (সম্মতি প্রকাশ) বলা হয়। ইচ্ছার বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করে এই শর্তে ইরাদা ও কুদরতের একত্রে প্রকাশকে ‘**খালক**’ (সৃষ্টি করা) বলে। খালকের মাঝে ইরাদার সরাসরি প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান। আর সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রভাবহীন এমন ইরাদা বা ইখতিয়ারের বাস্তবায়নকে ‘**কাস্‌ব**’ বলে। অর্থাৎ এমন ইরাদা যা বাস্তবায়নের জন্য অন্যের তথা মহান আল্লাহ্‌ তা’আলার ইরাদার উপর নির্ভরশীল। একারণে সকল ইখতিয়ারকারীর (ইচ্ছা পোষণকারীর) খালিক (স্রষ্টা) হওয়া আবশ্যক নয়। একইভাবে ইরাদাকৃত সবকিছুর ব্যাপারে রাজী (সন্তুষ্ট) হওয়াও আবশ্যক নয়। এককথায় মহান আল্লাহ্‌ তা’আলা হলেন ‘খালিক’ (স্রষ্টা) ও ‘মুখতার’ (ইচ্ছা পোষণকারী) আর বান্দা হল ‘কাসিব্‌’ (আল্লাহ্‌ তা’আলার ক্রিয়াকে নিজ নিয়্যাতের দ্বারা নিজের হিসাবে অর্জনকারী) ও ‘মুখতার’।

আল্লাহ তা’আলা, বান্দার আনুগত্য ও অবাধ্যতা দুটিই ইরাদা করেন ও সৃষ্টি করেন। কিন্তু আনুগত্যের ক্ষেত্রে রাজী বা সন্তুষ্ট হন আর অবাধ্যতা বা গুনাহের ক্ষেত্রে রাজী হন না, অপছন্দ করেন। সবকিছুই তাঁর ইরাদা ও ‘খালক’এর (সৃষ্টি করার) দ্বারা অস্তিত্ব অর্জন করে। সূরা আনআম’এর ১০২তম আয়াতে করীমায় এরশাদ করা হয়েছে যে (তাফসীর আলেমদের প্রদত্ত অর্থানুযায়ী), “**তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। সমস্ত কিছুর স্রষ্টা একমাত্র তিনিই**”।

‘**মু’তাজিলা**’ মতবাদের অনুসারীরা, ‘ইরাদা’ (ইচ্ছা করা বা সাঁয় দেয়া) ও ‘রিজা’এর (সন্তুষ্ট হওয়ার) মাঝের পার্থক্য অনুধাবনে ব্যর্থ হওয়ায় হতবুদ্ধি হয়েছে। তাদের মতে, মানুষ নিজের ইচ্ছাকৃত কর্ম নিজেই সৃষ্টি করে। আর এভাবেই ক্বাযা ও কদরকে অস্বীকার করে। অপরদিকে ‘**জাব্‌রিয়্যা**’ মতবাদের অনুসারীরাও সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। সৃষ্টি ব্যতীত ইখতিয়ারের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহ্ তা’আলার পক্ষ থেকে দেয়া আংশিক ইচ্ছা শক্তিকে (ইখতিয়ারকে) অস্বীকার করে মানুষকে কাঠ, পাথর ইত্যাদির মত মনে করেছে। এই মতানুযায়ী ‘নাউজুবিল্লাহ’ মানুষ কৃত গুনাহের জন্য দায়ী নয়। তারা সমস্ত মন্দ কাজের দায়ভারও আল্লাহ্ তা’আলার উপর ন্যাস্ত করে। ‘জাব্‌রিয়্যা’দের বক্তব্য অনুযায়ী, মানুষের মাঝে যদি ইরাদা ও ইখতিয়ার না থাকত, মানুষের দ্বারা কৃত সমস্ত মন্দ ও গুনাহের কর্ম আল্লাহ্ তা’আলা কর্তৃক জবরদস্তী করে করানো হয়েছে বলে মানা হত, তবে হাত-পা বাঁধা একজন লোকের পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া আর চারিদিক দেখেশুনে স্বাচ্ছন্দে ঐ পাহাড় থেকে নিচের দিকে হেঁটে আসা ব্যক্তির মধ্যে কোন ধরণের পার্থক্য না থাকাটা আবশ্যক হত। অথচ প্রথম ব্যক্তির গড়িয়ে পড়াটা বাধ্যতামূলক আর অপর ব্যক্তির হেঁটে নেমে আসাটা নিজ ইচ্ছার অধীন। এই দুইয়ের মাঝে পার্থক্য করতে অপারগরা মূলত ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন। একইসাথে তারা এর দ্বারা বহু আয়াতে করীমাকে অস্বীকারকারী হয়। মহান আল্লাহ্ তা’আলার আদেশ ও নিষেধসমূহকে অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন সাব্যস্থ করে। ‘মু’তাজিলা’ তথা ‘কাদিরিয়্যা’ নামক ফিরকার বক্তব্য অনুযায়ী, মানুষ নিজ ইচ্ছানুযায়ী নিজ কর্মকে নিজেই সৃষ্টি করে বলে মনে করা হলে, “**সমস্ত কিছুর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলা**” আয়াতে করীমাকে অবিশ্বাস করা হবে, একইসাথে সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষকে মহান আল্লাহ্ তা’আলার শরীক বা অংশীদার সাব্যস্থ করা হবে (নাউজুবিল্লাহ)।

‘শিয়া’রাও ‘মু’তাজিলা’দের মত, মানুষ নিজ ইচ্ছানুযায়ী নিজের কর্মকে সৃষ্টি করে, বলে দাবী করে। তারা এটা ভাবে না যে, মানুষ কোন কিছু করার ইচ্ছা করার পর মহান আল্লাহ্ তা’আলা যদি তা ইরাদা না করেন তবে আল্লাহ্ তা’আলার ইরাদাই বাস্তবায়িত হয়। মু’তাজিলা’র বক্তব্য যে ভুল তা সহজেই বুঝা যায়। অর্থাৎ, মানুষ যা ইচ্ছা করে তার সবই করতে পারে না। তারা যেমনটা বলে

সে অনুযায়ী, মানুষ তার সব ইচ্ছা বাস্তবায়নে সক্ষম হলে, আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতাকে সীমিত হিসেবে মানা হবে (নাউজুবিল্লাহ)। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা সকল ধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি, ঘাটতি ও সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে। সমস্ত কিছু কেবলমাত্র তাঁর ইরাদা অনুযায়ীই হয়। একমাত্র তিনিই সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন, সবকিছুকে অস্তিত্ব প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এমন সিফাত (গুণ) থাকাটাই আবশ্যক। মানুষের জন্য 'সৃষ্টি করেছে' ক্রিয়াটি ব্যবহার করা অতি কুৎসিত আচরণ। এতে মহান আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বেআদবি হয়। কুফরের কারণ হয়।

[যেমনটা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, মানুষের ঐচ্ছিক কাজ সমূহ বাহ্যিক, রাসায়নিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সংঘঠিত হয়, যা তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। একজন দায়িত্ববান বিজ্ঞানী এটি বলতে অস্বস্তি বোধ করবেন, "আমি করেছি," না বলে, "আমি সৃষ্টি করেছি," তার কাজের জন্য।

আল্লাহ তালার কাছে তার বিনয়ী হওয়া উচিত। যাই হউক কম জ্ঞানী, কম বোঝা এবং কম বিনয়ী মানুষ যেকোনো জায়গায় যা ইচ্ছা বলতে লজ্জা বোধ করে না। পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি আল্লাহ তালা ক্ষমাশীল। তাদের যা কিছু প্রয়োজন তিনি তা সৃষ্টি করেন এবং তাদের কাছে পাঠান। তিনি তাদেরকে সতর্ক করেন যাতে করে তারা পৃথিবীতে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে এবং আখিরাতে অশেষ রহমত লাভ করতে পারে। তিনি তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন তার ইচ্ছে মত, যারা তার পথ পরিহার করে তাদের নাফস অনুসরণ করে, খারাপ সঙ্গের কারনে, হারাম বই পরে কিংবা মিডিয়ার মাধ্যমে তারা কুফর করে। তিনি তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। যারা নিষ্ঠুর এবং পরিসীমা অতিক্রম করে তাদের তিনি রহমত করেন না। তিনি তাদেরকে তাদের ইচ্ছে মত অবিশ্বাসের অন্ধকারে ডুবে থাকতে দেন।

ইতিকাদ নামা কিতাবের অনুবাদ এখানেই শেষ করলাম। হাজি ফায়জুল্লাহ এফেন্দি, যিনি এই অনুবাদটি সম্পন্ন করেছেন, এরিচানের কামাহ শহর থেকে এসেছেন। তিনি তুরস্কের সকে শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রোফেসর ছিলেন, তিনি ১৩২৩ হিজরি[১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে] সনে মারা যান। মাওলানা খালিদি বাঘদাদি উসমানি কুদ্দিসা সিররুহ, এই কিতাবের লেখক ইরাকের দক্ষিনের শহর শাহরাজুরে হিজরি ১১৯২ সনে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং

১২৪২ সনে দামেস্কে মারা যান [১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দ]। তাকে উসমানী বলা হয় কেননা তিনি তিনি হযরত উস্মান জিন্নুরায়িন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তার ছোট ভাই মাওলানা মাহমুদ সাহিবকে ইমাম ই নাওয়ায়ির **হাদিসই আরবিয়ান** কিতাবের দ্বিতীয় হাদিস শিক্ষা দিচ্ছিলেন, সবার জানা **হাদিস ই জিব্রিল**, এই হাদিসের ব্যাখ্যা লিখার জন্য মাওলানা মাহমুদই সাহিব তার বড় ভাই কে অনুরোধ করেন। মাওলানা খালিদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার ছোট ভাইয়ের অনুরধ রাখেন এবং হাদিস শারিফটির ব্যাখ্যা লিখেন ফার্সিতে।

শরিফুদ্দিন মুনিরিরাহিমাল্লাহু তালার দুটি চিঠি

ভারতের বিখ্যাত আলেম শারিফ উদ্দিন আহমেদ ইবন ইয়াহিয়া মুনিরি [মৃত্যু ৭৮২ হিজরী, ১৩৮০ খ্রিষ্টাব্দ] ১৮ সংস্করণের ফারসি কিতাব **মাকতুবাতে**র মধ্যে উল্লেখ করেছেন,[১]

"অধিকাংশ মানুষ সন্দেহ এবং বিভ্রমের কারনে ভুল পথে চলে। কিছু পথভ্রষ্ট মানুষ ভেবে থাকে: 'আল্লাহ তালার আমাদের ইবাদাতের কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের ইবাদাত তার কোন কাজে আসে না। এটি ভিন্ন বিষয় যে মানুষ তার ইবাদাত করে অথবা তাকে মেনে চলে না। যারা ইবাদাত করে তারা সমস্যার মধ্যে থাকে এবং নিরর্থক কাজে ব্যস্ত থাকে /' এটি এই কারনে হয়; যারা ইসলাম সম্পর্কে জানে না তারা বলে থাকে কারণ তারা মনে করে থাকে আল্লাহ তালার এই সকল ইবাদতের প্রয়োজন রয়েছে। এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা এবং এটি অসম্ভব গুলোকে সম্ভব করে তোলে। কারো ইবাদাত শুধু মাত্র তারই কাজে আসবে। আল্লাহ তালা সূরা **ফাতিরের** ১৮ নম্বর আয়াতে ঠিক এমনটি বলেছেন। যারা ভ্রান্ত ধারণা গুলো করে থাকে তারা এমন যেন কোন ডাক্তার তাকে নিয়ন্ত্রনের কথা বলছেন কিন্তু তারা করে না এবং বলে,' আমি যদি নিয়ন্ত্রন না করি তাহলে ডাক্তারের কোন ক্ষতি হবে সে সঠিক বলেছে দচতরের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু এটি তার ক্ষতি করবে না। ডাক্তার তাকে নিয়ন্ত্রন করতে বলেছেন এই কারনে নয় যে এটি তার কোন কাজে আসবে, কিন্তু এটি তার রোগ ভালো করবে। যদি তিনি ডাক্তারের কথা অনুসরণ করেন তবে তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন। যদি তিনি না করেন তবে তা ডাক্তারের কোন ক্ষতি করবে না।

[১] একশতের ও বেশি চিঠির সংগ্রহ রয়েছে **(মাকতুবাত)** এটি ৭৪১ সনে সংগ্রহ করা হয় [১৩৩৯ খ্রিষ্টাব্দ] এবং ১৩২৯ সনে মুদ্রন করা হয় [১৯১১খ্রিষ্টাব্দ] । ইস্তানবুলের সুলায়মানিয়া লাইব্রেরীতে একটি কপি সংগৃহীত আছে। **ইরশাদ আস সালাকিন এবং মাদিন আল মানি** তার দুটি প্রধান কর্ম। আহলে সুন্নার গুলাম আল আব্দুল্লাহি আদ্ধাওানি রাহামাতুল্লাহ যিনি ১২৪০[১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দ] মারা গেছেন, তিনি উল্লেখ করে গেছেন আহমেদ ইবন ইয়াহিয়া মুনিরের **মাকতুবাতের** তার নিরানব্বই তম চিঠিতে এবং লিখে গেছেন নাফসের জন্য এটি খুবই উপকারী। শারিফ উদ্দিন আহমেদ ইবন ইয়াহিয়া

মুনিরি ভারতের বিহারে জন্ম গ্রহণ করেন, সেখানেই তার কবর। তার গ্রাম বিহারে। গুলাম আল আব্দুল্লাহি আদ্ধাওানি রাহামাতুল্লাহের **আখবার আল খায়ের** কিতাবের মধ্যে তার জীবন ব্রিত্তান্ত লেখা রয়েছে যা দেওবন্দ থেকে মুদ্রিত হয়, ১৩৩২ সনে [১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ], পরবর্তীতে লাহোর পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়।

"কিছু ভুল চিন্তার মানুষ কখনো ইবাদাত করে না; এবং তারা হারাম থেকে বিরত হয় না। তারা ইসলাম মানে না। তারা বলে, ' আল্লাহ কারিম এবং ক্ষমাশীল। তিনি তার বান্দাদের অনেক ভালবাসেন। তিনি অসীম ক্ষমাশীল। তিনি কাওকে শাস্তি দেবেন না।' হাঁ, তাদের প্রথম কথা সঠিক, কিন্তু তাদের পরবর্তী কথা সঠিক নয়। শয়তান তাদের প্ররোচিত করে এবং তাদের ভুল পথে পরিছালিত করে। একজন দায়িত্ববান মানুষ কখনই শয়তান দ্বারা পরিচালিত হবে না। আল্লাহ তালা শুধু কারিম নন, দয়ালুও এবং তিনি কখনো তার বান্দাদের কঠিন বা তীব্র শাস্তি দেবেন না। আমারা মনে করে থাকি তিনি পৃথিবীতে মানুষকে দারিদ্রতা এবং কষ্ট দিয়ে থাকেন। তিনি তার বান্দাদের জন্ত্রনার উদ্রেক করে থাকেন। যদিও তিনি দয়ালু এবং রাজ্জাক, কৃষি কাজ না করলে তিনি খাবারের যোগান দেন না। যদিও তিনি সবাইকে জীবিত রাখেন, খাবার এবং পানীয় থেকে অভুক্ত রাখেন না। তিনি কন অসুস্থ বাক্তিকে ঔষধ ছাড়া সুস্থ করেন না। তিনি মানুষের মদ্ধে আকাঙক্ষা তৈরি করেছেন বেচে থাকার, সুস্থ থাকার এবং সম্পদের মালিক হওয়ার এবং যারা দুনিয়াবি সুখের জন্য রোজা রাখে না তাদের জন্য তিনি মটেও ক্ষমাশীল হউন না।

দুই ধরনের ঔষধ আছে :পদার্থের এবং আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক ঔষধ হচ্ছে ইবাদাত এবং আমলের মাধ্যমে সুস্থ হওয়া। সবার জানা একটি হাদিস এরকম: " **তোমার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করো আমলের মাধ্যমে!**" এবং **" আসাগফিরুল্লাহ হচ্ছে এমন একটি ঔষধ যা সকল রোগ থেকে মুক্তি দিবে।**"[১] কিছু সংখ্যক পদার্থের ঔষধ রয়েছে। সেগুল জানার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রয়েছে। আধ্যাত্মিক ঔষধের ব্যাবহার পদার্থের ঔষধ খুজতে সাহায্য করে। তাই এটীই আখেরাতে মুক্তি পাওয়ার উপায়। তিনি আত্মার মদ্ধে অবিশ্বাস অহংকার সৃষ্টি করেন। এবং অলসতা আত্মাকে দুর্বল করে দেয়। যদি ঔষধ ব্যাবহার করা না হয় তবে, আত্মা অসুস্থ হয়ে যায় এবং

মারা যায়। অবিশ্বাস এবং অবহেলার একমাত্র ঔষধ জ্ঞান এবং মারিফা। এবং এই ঔষধ নামাজের এবং ইবাদাতের অবহেলার জন্য।

এই পৃথিবীতে যদি কোন ব্যক্তি বিষ খায় এবং বলে, ' আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং তিনি বিষের বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা করবেন,' তিনি অসুস্থ হবেন এবং মারা যাবেন। যদি কোন ব্যক্তি রেডির তেল খেয়ে ফেলে, তবে তার ক্ষতি হবে।

কেননা মানুষের শরীর অনেক দুর্বল, একে সুস্থ রাখার জন্য অনেক উপাদানের প্রয়োজন রয়েছে [যেমন খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান]। এগুল খুজে পাওয়া এবং ব্যাবহারের জন্য প্রস্তুতু করা অনেক কষ্টসাধ্য। মানুষের মধ্যে **নাফস** এর উৎপত্তি হয়েছে একারনে যে, পরিশ্রমের মাধ্যমে যাতে করে এই সমস্যা গুলোর সমাধান বের করা যায়। পশুপাখিদের এই প্রভাবের কোন প্রয়োজন নেই। নাফস মানুষের এসকল সমস্যা সমাধানের জন্য কাদতে থেকে। এধরনের কাজে সে আনন্দ লাভ করে থাকে। নাফসের এধরনের চাওয়া কে বলা হয় সাহয়া। সাহয়ার পরিতৃপ্তি মানুষের হৃদয় শরীর এবং আশেপাশের মানুষের ক্ষতি করে থাকে, যা পাপ।

অশেষ রহমত কিতাবের প্রথম অংশের তের অধ্যায়ে বিশেষ বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

"ভুল চিন্তা ভাবনার অন্যান্য মানুষেরা ক্ষুধা, সাহয়া এবং যৌনতার কারনে **রিদিয়ার** মধ্যে অবস্থান করে, যা ইসলামে হারাম। তারা মনে করে ইসলাম তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করে।দীর্ঘদিন অভুক্ত থাকার পর, তারা দেখে তাদের ইচ্ছে গুলো অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে, এবং ইসলাম এমন কিছু আদেশ করছে যা পালন করা সম্ভব নয় তাদের পক্ষে। তারা বলে : 'এসকল ইসলামের বিধান মানা সম্ভব নয়। মানুষ প্রকৃতির নিয়ম লঙঘন করতে পারে না। এসবের অর্থ একজন রঙ্গিন মানুষকে সাদায় পরিণত করা। কিছু করতে চেষ্টার মানে একজনের জীবন নষ্ট করা।' তারা ভুল চিন্তা করে এবং ভুল পথে চলে। যাই হউক তারা মনেকরে ইসলাম তাদের ভুল এবং মূর্খতার পথে পরিচালিত করে,ইসলাম মানুষের আকাঙ্খার পরিপূর্ণতার পথে পরিচালিত করে না। এধরনের অভিযোগ ইসলামের জন্য অপবাদ স্বরূপ।যদি ইসলাম সেরকম আদেশ নিষেধ করতো তবে, ইসলামের নবী মুহাম্মাদ কখনোই এরকম পথ দেখাতেন না। তিনি

বলেছেন, **আমিও একজন মানুষ, অন্যান্য মানুষের মত আমিও রাগান্বিত হই।** সময়ে সময়ে তাকে রাগান্বিত হতে দেখা গেছে। তারা রাগ শুধুমাত্র আল্লাহর নিমিত্তে ছিল।কুরআনে কারিমে উল্লেখ রয়েছে আল্লাহ তালা তাদের উপর রহমত করবেন 'যারা তাদের ক্রোধ নিবারণ করতে পারে'। তিনি তাদের উপর রহমত করেন না যারা রাগে না।

[১] আস্তাগফিরুল্লাহ দোয়া পড়া হয়। এটি মাঝে মাঝেই পড়তে হবে। তর্কের মাঝেও আস্তাগফিরুল্লাহ পড়তে হয়।

ভুল চিন্তাকারী যারা মনে করে তাদের সমস্ত আকাঙ্খা বাদ দিতে হবে তাদের চিন্তা ভিত্তিহীন। রাসুলের নয় জন নারী বিবাহই আমাদের বলে দেয় এই যুক্তি ভিত্তিহীন।

যদি কোন বাক্তি তার সমস্ত গুন হারিয়ে ফেলে, তাকে ঔষধ গ্রহন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে, একজন বাক্তি তার গুনের মাধ্যমে তার স্ত্রী সন্তানকে রক্ষা করতে পারবে। তার এসব গুনের কারনেই সে ইসলামের শত্রুদের সাথে লড়াই করে। এটি সম্মানের যে, তার সন্তানেরা তার মৃত্যুর পরে তাকে সম্মানের এবং গর্বের সাথে স্মরণ করে।

ইসলামে এভাবে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে,"ইসলাম ক্রোধ এবং আকাঙ্খাকে দমন করতে বলে নি, বলেছে নিয়ন্ত্রন করতে এবং ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী ব্যাবহার করতে। এটি ঠিক এমন যেমনটা শিকারিরা তাদের ঘোড়া এবং কুকুরের সাথে করে থাকে, সঠিক সময়ে সঠিক ব্যাবহার। অন্য কথায় ক্রোধ এবং আকাঙ্খা শিকারীর ঘোড়া এবং কুকুরের মত। এই দুটি ছাড়া আখেরাতে রহমত লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এগুলোর সঠিক ব্যাবহার এবং প্রয়োগের মাধ্যমে রহমত লাভ করা সম্ভব। যদি এগুলো নিয়ন্ত্রন না করা হয় তবে তা ইসলামের বাধা অতিক্রম করে ফেলবে। এবং এত সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। [১] পারমানবিক শক্তির প্রয়োগ কিংবা জেট বিমানের মত যন্ত্রের ব্যাবহার সভ্য হতে পারে না। মানবতার জন্য এসবের ব্যাবহার করাই সভ্যতা। এবং এতি ইসলামের পথেই সম্ভব।"ভুল চিন্তাকারীদের চতুর্থাংশ মনে করে; তারা নিজেদেরকে এভাবে বুঝিয়ে থাকে, 'সব কিছুই পূর্ব নির্ধারিত । শিশুর জন্মের পূর্বে সে **সাইদ(**জান্নাতে যাবে) অথবা **সাকি**(জাহান্নামে যাবে) নির্ধারিত হয়ে

যায়। এটি পরবর্তীতে পরিবর্তন সম্ভব নয়। সেজন্য ইবাদতের কোনই প্রয়োজন নেই।' সাহাবীদের যখন রাসুল সাল্লাহি আলায়হিস সালাম বল্লেন কাদা এবং কাদার কখনো পরিবর্তন হবে না, এটি পূর্বনির্ধারিত, তখন তারা প্রশ্ন করলো, আমরা এই শাশ্বত ভবিষ্যৎ বানী বিশ্বাস করবো, আমাদের ইবাদতের কোনই প্রয়োজন নেই। কিন্তু রাসুলুল্লাহ এভাবে উত্তর দিলেন: **'ইবাদত করো, যা পূর্ব নির্ধারিত তা করা সকলের জন্যই সহজ।!'** তিনি আসলে যা বলতে চেয়েছেন তা হল সাইদ তখনি হওয়া যাবে যখন সাইদের মত কাজ করবে। এটাও বোঝা যায় জারা সাইদ হতে চায় তারা ইবাদত করে, আর যারা সাকি হতে চায় তারা অমান্য করে। কিছুটা এরকম যারা মনে করে তারা সুখি সমৃদ্ধ জীবনযাপন করবে, খাবার খাবে ঔষধ গ্রহন করবে, অপর দিকে যারা মনে করে তারা অসুস্থ থাকবে, খাবার এবং ঔষধ গ্রহন করবে না। যারা এমনটা মনে করে মানুষের ভাগ্যে এভাবে লেখা রয়েছে, তারা ঔষধ খাবার গ্রহন না করে অসুস্থ হয়ে মারা যাবে। যারা অর্থ উপার্জন করতে চায় তাদের জন্য পথ খলা রয়েছে। যাদের ইচ্ছে কোন একদিকে যেয়ে মৃত্যু বরণ করা তাদের জন্য বিপরীতদিকের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, যখন আজরায়িল আলায়হিসসালাম সুলায়মান আলায়হিস সালামের কাছে এসেছিলেন, তিনি খেয়াল করলেন একজন বাক্তিকে যিনি বসে ছিলেন। লোকটি ফেরসতার সঙ্কুচিত দৃষ্টির কারনে ভীত ছিল। যখন আজরায়িল আলায়হিস সালাম চলে যাচ্ছিলেন তখন বলে গেলেন সুলায়মান আঃ কে তিনি জেন বাতাস কে নির্দেশ করেন উক্ত বাক্তিকে পশ্চিমের কোন এক দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাতে করে সে, আজরায়িল আলায়হিস সালাম থেকে দূরে যেতে পারেন।

[১] **অশেষ রহমত** কিতাবের চতুর্থ অংশের ছাব্বিশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।।

যখন তিনি পুনরায় ফিরে আসলেন তার কাছে, তখন সুলায়মান আঃ তাকে প্রশ্ন করলেন কেন তিনি ওইভাবে উক্ত বাক্তির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি জবাবে বললেন , তাকে নির্দেশ করা হয়েছে এক ঘন্তা পরে পশ্চিমের কোন শহরে তার জান কবজের জন্য। কিন্তু যখন তাকে আপানার পাশে দেখলাম, আমি বিস্মিত না হয়ে থাকতে পারি নাই। পরবর্তীতে আমি পশ্চিমের ওই দেশে যাই, তাকে দেখি এবং তার জান কবজ করি। [১] যেমনটা বোঝা যায়, লোকটি আজরায়িল আলায়হিস সালাম কে ভয় পেয়েছিল যা ঘটতে যাচ্ছে

ভেবে, সুলায়মান আলায়হিস সালাম তা পরিপূর্ণ করে দিলেন, পুরো ঘটনাটি পরস্পরের সাথে জড়িত। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি পুরোপুরিভাবে সাইদ হতে চায় সে পুরোপুরি ইমানদার হবে, এবং রিয়াদার অন্তর্ভুক্ত হয়ে সকল বদ অভ্যাস থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। সুরা আল আনামের ১২৫ তম আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, ' **আল্লাহ তালা তার যে বান্দা কে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে ইচ্ছে করেন তার হৃদয়ের মধ্যে, ইসলাম প্রতিস্থাপন করে দেন।**' যে ব্যক্তিটি সাকি পুরোপুরি ভাবে, তার জন্য এটি নির্ধারিত যে, সে জাহান্নামে যাবে এটি এমন একটি বার্তা দেয় যে,তার ইবাদাতের কোনই প্রয়োজন নেই। এটি নির্ধারিত যে সে সাইদ অথবা সাকি। সে শুধুমাত্র তার ভাবনার কারনে, ইবাদাত করে না। তার এই ভাবনার কারনে ইবাদাত না করা এটি বোঝায় সে সম্পূর্ণরূপে, সাকি হতে চায়। অনুরূপভাবে, পূর্ব নির্ধারিত বিসয়ে অনীহা দেখানো মানুষেরা ভেবে থাকে, সবকিছু পূর্ব নির্ধারিত, পড়াশুনা এবং জ্ঞান অর্জনের কোনই উপকার নেই যদি সে পূর্ব নির্ধারিতভাবে মূর্খ হয়ে থাকে। এভাবে সে কিছুই শেখে না এবং জ্ঞান অর্জন করে না। সে মূর্খই থেকে যায়। যদি কোন ব্যক্তির জন্য পূর্ব নির্ধারিত থাকে যে সে অনেক ফসল ফলাবে এবং চাষাবাদ করবে, তবে তাকে প্রচুর জমিজমা এবং বীজ দেয়া হয়। তাই বিষয়টি এরকম যে, যারা সাইদ হবে তাদের প্রচুর ইমান থাকবে এবং ইবাদাত করবে, যারা সাকি হবে তারা অমান্য করবে এবং অনুসরন করবে না। নির্বোধেরা এটি বুঝতে পারে না, তারা বলে, পুরোপুরি ইমান আনা এবং ইবাদাত করার মধ্যে কি আছে অথবা অবিশ্বাস বা অনুসরন না করলে সাকি হলে কি হবে? তাদের সল্প বুদ্ধিতে তারা এই দুটির মধ্যে তুলনা করে থাকে এবং সমসসা সমাধানের চেষ্টা করে।

কিন্তু মানুষের এই কারন গুলো সংকীর্ণ এবং প্রশ্নাতীত বা অমীমাংসিত বিষয়টি আলোচনা করা বা বুঝতে চেষ্টা করা নির্বোধের কাজ। যারা এধরনের চিন্তা করে তারা নির্বোধের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম বলেছেন: 'কোন জন্মান্ধকে ঠিক করে অথবা মৃত কে জীবিত করা আমার জন্য কোন কঠিন কাজ ছিল না। আল্লাহ তালা তার অসীম জ্ঞান এবং হিকমার মাধ্যমে কিছু কিছু বান্দাদের ফেরেশতার পর্যায়ে অথবা তাদেরও উপরে নিয়ে যান। আর কিছু বান্দাকে কুকুর অথবা শুকরের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে নিয়ে যান।" আলেম শারিফ উদ্দিন আহমেদ ইবন ইয়াহিয়া মুনিরি তার ৭৬ তম চিঠিতে উল্লেখ

করেছেন:"**'সায়দা'** অর্থ জান্নাত অর্জন করা এবং **'শাক্কা'** অর্থ জাহান্নাম অর্জন। সায়দা এবং শাক্কা আল্লাহ তালার দুটি খাজানার মত। প্রথমটির চাবি মেনে চলা এবং ইবাদাত করা। দ্বিতীয়টির চাবি পাপ কর্ম করা। আল্লাহ তালা চিরায়িত ভাবে নির্ধারিত করেছেন বাক্তি বিশেষে সাইদ অথবা শাক্কি। এটিকে বলা হয় ভাগ্য। যে বাক্তিকে সাইদ বলা হয় তাকে পৃথিবীতে সায়দার চাবি দেয়া হয়েছে, আর সে আল্লাহ তালাকে মান্য করে। আর যে বাক্তি শাক্কি তাকে শাক্কার চাবি দেয়া হয় পৃথিবীতে এবং সে সবসময় পাপ করতে থাকে। পৃথিবীতে, প্রত্তেকে বুঝতে পারে যে সে সাইদ নাকি শাক্কি তার চাবিটির দিকে খেয়াল করে।

[১] জালাল উদ্দিন রুমির মিথওইয়ানি কিতাবের মধ্যে এই ঘটনা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি কনিয়া শহরে ৬৭২ হিজরি [১২৭৩ খ্রিস্টাব্দে]. মৃত্যু বরণ করেন।

ধর্মীয় আলেমরা বুঝতে পারেন বাক্তিটি আখিরাতে সাইদ নাকি শাক্কি। কিন্তু যে সকল বাক্তি দুনিয়াবি কাজে ব্যস্ত তারা এটি বুঝতে পারে না। সমস্ত সম্মান এবং রহমত আল্লাহ তালাকে মেনে চলা এবং ইবাদাতের মধ্যে। সকল সমস্যা এবং শয়তানের উৎপত্তি পাপ কর্মের মধ্যে। দুর্ভাগ্য এবং সমস্যা আসে মানুষের কাছে পাপের মাধ্যমে। আর আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে প্রশান্তি এবং সুখ। [১] জেরুজালেমের একজন বাক্তি ছিলেন যে তার পুরো জীবন আকসা মসজিদে ইবাদাতের মধ্যে কাটিয়েছে, যখন সে একটি সিজদা থেকে বিরত থাকতো কেননা সে ইবাদাতের শর্ত আর ইখলাস শেখে নাই, সে এমন কিছু হারালো যেন সে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। যাইহউক, কেননা আসহাবে আল কাহফের কুকুর সিদ্দিকদের পেছন দিয়ে কিছুদুর হেটে গেছে, এটিকে বাড়িয়ে বলার চেষ্টা করা হয়েছে যদিও এটি নোংরা ছিল। বিষয়টি আশ্চর্যের, মানুষের বুদ্ধি মত্তা এতির সমাধান খুজে পায়নাই শত বর্ষের মানুষের সৃষ্ট কারন কখনোই স্বর্গীয় ইচ্ছার সাথে তুলনীয় হতে পারে না। আল্লাহতালা আদাম আলায়হিস সালামকে গম খেতে নিষেধ করেছিলেন,কিন্তু তিনি তাকে তা খাওয়ান, কেননা তিনি ভবিষ্যৎ জানতেন যে তিনি খাবেন। তিনি সয়তানকে নির্দেশ দিলেন তাকে প্ররোচিত করার জন্য। কিন্তু তিনি নিজে তা প্ররোচিত করতে চান নাই। তিনি বলেছিলেন, তিনি পথ নির্দেশনা দেখাবেন কিন্তু তিনি ইহলাখ ছাড়া কোন মানুষকে নয়।তাহলে আমরা কিভাবে তা বলতে পারি কোন কিছু? মানুষের

ইবাদাত অথবা বিশ্বাস কোন কিছুরই তার প্রয়োজন নেই, অবিশ্বাস অথবা তাদের পাপের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ হলেও তার কিছু যায় আসে না। তার কোন সৃষ্টির প্রয়োজন নেই। তিনি জ্ঞান সৃষ্টি করেছেন অবিশ্বাস এবং পাপে অবজ্ঞা বোঝার জন্য। বিশ্বাস এবং আনুগত্য জ্ঞান থেকে আসে, অপরদিকে অবিশ্বাস এবং অবজ্ঞার উৎপত্তি অজ্ঞতা থেকে। আনুগত্য পরিতাগ করা উচিত নয় যদিও এটি অভ্যাসে পরিনত হয়। আর পাপ কাজ থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে যদিও এটি লঘু হয় ! ইসলামী চিন্তাবিদেরা উল্লেখ করেছেন, তিনটি কাজ অপর তিনটি কাজের কারন হয়: আনুগত্যকারী আল্লাহ তালার রিদা লাভ করে(অনুগ্রহ); পাপকারী আল্লাহ্‌র ক্রোধের সম্মুখিন হয়; ইমান মানুষকে সম্মান এবং মর্যাদা দেয়। একারনে, আমরা খুব ছোট পাপ থেকেও বিরত থাকব কেননা, আল্লাহতালার ক্রোধের সম্মুখীন হতে পারি সেই পাপের কারনে। আমরা প্রত্তেক বিশ্বাসীকে আমাদের চেয়ে আরও বেশি বিশ্বাসী মনে করবো। তিনি হয়তো এমন কেও যাকে আল্লাহতালা অনেক বেশি ভালবাসেন। প্রত্তেক বাক্তির ভাগ্য যা পূর্ব থেকে নির্ধারিত তা কখনোই পরিবর্তন হবে না। যদি আল্লাহতালা চান, একজন পাপী বাক্তিকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু তিনি তার আইন পরিবর্তন করেন না। যখন ফেরশতারা, **‘হে রাব্ব! আপনি কি এমন সৃষ্টি করবেন যারা বিদ্বেষপরায়ণ হবে, পৃথিবীতে অনাচার সৃষ্টি করবে এবং রক্ত ঝরাবে ?’** তিনি বলেননি যে তারা বিদ্বেষপরায়ণ হবে, তিনি বলেছেন: **‘আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।’** তিনি উল্লেখ করেন: ‘আমি অনুপযুক্ত থেকে উপযুক্ত তৈরি করি। আমি সেসব সৃষ্টি করি যা দূর থেকে আসে। আমি নিম্ন থেকে উচ্চ সৃষ্টি করি। তোমরা তাদের আচরণের দিকে লক্ষ করো, কিন্তু আমি দেখি তাদের হৃদয়। তোমরা তোমাদের পুন্নের হিসেব করো আর তারা আমার ক্ষমা প্রার্থনা করে। আমি যেমন তোমাদের নিরীহতা পছন্দ করি, তেমনি ভাবে মুসলিমদের পাপ ক্ষমা করতে পছন্দ করবো। তোমরা তা জানো না যা আমি জানি। আমি তাদের কে আমার রহমত অর্জনের সুযোগ দেব এবং আমার অনন্ত বরকতের মধ্যে জড়িয়ে রাখব।”

[১] এটি আল্লাহতালার স্বর্গীয় আইন। কেও এতির পরিবর্তন করতে পারবে না। আমারা সায়দায় এমন কিছু গ্রহন করতে পারিনা যা আমাদের কাছে

সহজ এবং নাফসের জন্য আনন্দদায়ক মনে হয়, এমন কিছু ভাবতেও পারি না যা আমাদের কাছে কঠিন এবং নাফসের জন্য শাক্কা অথবা খেয়াল।

এখানে আমরা ছিয়াত্তর নম্বর চিঠির অনুবাদ শেষ করলাম। ভারতের বিখ্যাত আলেম শারিফ উদ্দিন আহমেদ ইবন ইয়াহিয়া মুনিরি ৭৩২ হিজরি সনে মারা যান [১৩৮০ খ্রিস্টাব্দ]। তিনি ভারতের বিহারে বসবাস করেছেন। সেখানেই তার কবর। বিহার শহরের একটি অংশে গ্রামের নাম মুনির। গুলাম আল আব্দুল্লাহি আদ্ধাওানি রাহামাতুল্লাহের **আখবার আল খায়ের** কিতাবের মধ্যে তার জীবন ব্রিত্তান্ত লেখা রয়েছে যা দেওবন্দ থেকে মুদ্রিত হয়, ১৩৩২ সনে [১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ], পরবর্তীতে লাহোর পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়। **ইরসাদ্দ উসসালেকিন** এবং **মাকতুবাত** বই দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ গুলাম আল আব্দুল্লাহি আদ্ধাওানি রাহামাতুল্লাহ [১] নিরানব্বই তম চিঠির মধ্যে মাকতুবাত কিতাবের গুরুত্তের কথা উল্লেখ করেছেন যে, কিতাবটি হৃদয়ের পরিশুদ্ধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

[ইমাম রাব্বানি রাহ্মাতুল্লাহি তার কিছু চিঠির মধ্যে উল্লেখ করেছেন: “আল্লাহ তালার নির্দেশসমূহ **ফরয**, তার নিষেধসমুহ **হারাম**। ইসলামে যে কাজগুলো হারাম অথবা ফরজের অন্তর্ভুক্ত নয় সেগুলো **মুবাহ**। ফরয আদায় করা এবং হারাম এড়িয়ে যাওয়া, মুবাহ আদায় করা আল্লাহ তালার নিমিত্তে ইবাদাত। সাহিহ এবং মাকবুল ইবাদাত সঠিক এবং আল্লাহ তালার কবুলের জন্য এর **জ্ঞান** থাকা প্রয়োজন, **আমলের** ওয়াদা পরিপুরনভাবে পালন করতে হবে, সুসঙ্গতভাবে ওয়াদা পালনের ক্ষেত্রে **ইখলাসের** সাথে করতে হবে। এবং কোনকিছু ইখলাসের সাথে করার অর্থ শুধুমাত্র আল্লাহতালার নির্দেশ মেনে তাকে কে রাজী খুশি করার জন্য, কোন দুনিয়াবি কারনে বা অর্থের, পদের কিংবা গর্বের লোভে নয়। কোন একজন উপযুক্ত ধর্মীয় শিক্ষকের অধীনে ফিকাহ শাস্ত্রের উপর পড়াশুনার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন সম্ভব, **তাসাওফের** কিতাব সমূহ পড়া, চিরায়িত কথা মেনে চলা এবং ওলিদের ব্যাবহার আয়ত্তের মাধ্যমে ইখলাস অর্জন সম্ভব। ইসলামী জ্ঞান দুটি উপাদানে গঠিত, ধর্মীয় জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু জ্ঞান আহরন করা ফরয। এভাবে, ঔষধ প্রয়োগের পূর্বে তার তার ব্যাবহার এবং কার্যক্ষমতা জানা ফরয, অথবা যদি কোন বাক্তি কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যাবহার করতে চায় তবে তাকে বিদ্যুতের

ব্যাবহার সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে, তানাহলে একটি অনাকাংখিত মৃত্যু হতে পারে। “ যদি কোন ব্যক্তি যে কিনা তার ইবাদাত আদায় করতে চায় না, এবং শয়তানের প্ররোচনায় তওবা না করেই মৃত্যু বরণ করে, যদিও সে ফরয এবং হারামে বিশ্বাস করতো, তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে তার কর্মফলস্বরূপ।

[কোন ব্যক্তি যে কিনা ফরয সমূহ জানে না বা জেনেও গুরুত্ব দেয় না, এবং যারা ঘৃণা করে এবং আল্লাহকে ভয় করে না, তওবা করে না, তারা ইসলামের বাইরে অবিশ্বাসীতে পরিনত হয়। সে অনন্তকালের জন্য জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। এটি হারামকারী দের খত্রেও প্রযোজ্য।]

“যদি কোন ব্যক্তি না জেনে থাকে ইবাদাতের শর্ত সমূহ, তবে তার ইবাদাত সহিহ হবে না, এটি তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে। যাইহউক সে এসব ইখলাসের সাথে করলেও তা গ্রহনযোগ্য হবে না , এবং তার কোন ভাল কর্মও, সে কোন সওয়াব পাবে না এসবের জন্য। আল্লাহ তালা বলেছেন , তিনি বান্দার এসব ভাল এবং সেবামূলক কাজে খুশি হবেন না। জ্ঞান এবং ইখলাস ছাড়া কোন ইবাদাত কাজে আসবে না। এটি ইবাদাতকারিকে পাপ অবিশ্বাস এবং যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে না। কিছু সংখ্যক আধ্যাত্মিক ইবাদাতকারি অবিশ্বাসী হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছে। জ্ঞান এবং ইখলাসের সাথে করা ইবাদাত ইবাদাতকারিকে পাপ অবিশ্বাস এবং যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে এবং তাকে আজিজে রুপান্তরিত করবে পৃথিবীতে।

[১] আব্দুল্লাহ দাহ্লাহি ১২৪০ হিজরি সনে দিল্লিতে মারা যান।

পরবর্তী জীবনের জন্য, আল্লাহ তালা সূরা মায়িদার নবম আয়াতে এবং সূরা আসরের মধ্যে ওয়াদা করছেন যে, সে ব্যক্তিকে তিনি জাহান্নামের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ তালা তার ওয়াদার বাপারে সত্যবাদী। তিনি ওয়াদা পালন করেন।”]

আল্লাহ বর্তমান এবং এক সমস্ত সৃষ্টি একসময় ছিল না এবং একসময় থাকবে না

আমারা আমদের চারপাশে সব কিছুর উপস্থিতি বুঝতে পারি আমাদের অনুভব ইন্দিয়ের মাধ্যমে। যে জিনিসগুলো আমাদের ইন্দ্রিয়কে নাড়া দেয় সেগুলোই **সত্তা** বা **সৃষ্টি**। যে সকল সত্তা আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ে অনুভবের সৃষ্টি করতে পারে এগুলোর মাধ্যমেই **সম্পদ** বা **গুন** একে অপর থেকে আলাদা করা যায়। আলো, বাতাস, পানি, শব্দ, কাঁচ সবকিছুই সত্তার অন্তর্ভুক্ত, এগুলো সব বর্তমান। যেসকল সত্তার ভর, শব্দ, আয়তন আছে অন্য কথাই কোন স্থান দখল করে তাদের বলা হয় **পদার্থ**। পদার্থকে আলাদা করা হয় তাদের পরিমান এবং পরিমাপের উপর ভিত্তি করে। বায়ু পানি পাথর কাঁচ এগুলো সবই পদার্থ। আল এবং শব্দ পদার্থ নয় কেননা তারা স্থান এবং ভর নিরপেক্ষ। প্রত্যেকটি সত্তা শক্তি এবং ক্ষমতা পরিবহন করে, জার মাধ্যমে এরা কর্ম সম্পাদন করে। প্রত্যেকটি সত্তা তিন অবস্থায় থাকতে পারে, তরল কঠিন এবং বায়বীয়। কঠিন সত্তারর আকার রয়েছে। তরল এবং বায়বীয় সত্তা পাত্রের আকার ধারন করে, তাদের নিজের কোন আকার নেই। যেসকল সত্তার আকার রয়েছে তাদের বলা হয় **পদার্থ**। বেশিরভাগ সত্তাই পদার্থ। যেমন চাবি, পিন,চিমটা এদের প্রত্যেকের আলাদা আকার রয়েছে। কিন্তু তারা একই পদার্থ লোহা থেকে তৈরি হতে পারে। দুই ধরনের পদার্থ রয়েছে, মৌলিক এবং যৌগিক।

প্রত্যেকটি পদার্থেরই পরিবর্তন আছে। যেমন এগুলো স্থান পরিবর্তন করা বা ছোট বড় হতে পারে। এটি অসুস্থ হতে পারে এবং মারা যেতে পারে যদি তা জীবিত হয়ে থাকে। এই পরিবর্তনগুলোকে বলা হয় **ঘটনা**। কোন প্রভাব ছাড়া পদার্থের কোন পরিবর্তন ঘটে না। কোন ঘটনা যদি পদার্থের আকারের পরিবর্তন ঘটায় তবে তা **কায়িক পরিবর্তন** । একটি কাগজ কে দুই টুকরো করা কায়িক পরিবর্তন। কিছু পরিমান শক্তি ব্যাবহার করতে হয় যাতে করে কায়িক পরিবর্তন ঘটতে পারে। যে পরিবর্তন পদার্থের গঠন পরিবর্তন করে দেয়

তাদেরকে বলা হয় **রাসায়নিক পরিবর্তন**। যখন একটি কাগজ পুড়িয়ে ফেলা হয় কিংবা এটি ছাইয়ে পরিনত হয় তখন তা রাসায়নিক পরিবর্তন। একটি পদার্থের অন্য একটি পদার্থ দ্বারা প্রবাহিত হলে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। দুই বা ততোধিক পদার্থ পরস্পরের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করলে রাসায়নিক পরিবর্তন হয়।

রাসায়নিক পরিবরতনে পদার্থের **পরমানু** সমুহের বিন্যাস পরিবর্তিত হয়। প্রত্যেকটি পদার্থ অসংখ্য অনুর সমন্বয়ে গঠিত। যদিও অনু সমুহের গঠন একই রকমের, তাদের ভর আকার ভিন্ন ভিন্ন। এই কারনে আমরা একশত পাঁচটির বেশী ভিন্ন ভিন্ন পরমানুর নাম জানি। একটি সর্বাধিক বড় অনু কেউ আমরা সবচেয়ে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখতে পারি না। অনেকগুলো একই অনু একত্রে একটি পদার্থের সৃষ্টি করে। জেহেত একশত পাঁচের বেশী অনু রয়েছে তাই একই পরিমান ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ রয়েছে। আয়রন, সালফার, মার্কারি, অক্সিজেন এবং কার্বন এগুলো পদার্থ। যখন ভিন্ন ভিন্ন অনু একত্রিত হয় তখন তাকে বলা হয় যৌগ। পানি, মদ, লবন এগুলো যৌগ। দুই বা ততোধিক অনু অথবা পদার্থ একসাথে একটি যৌগ তৈরি করে। পাহাড় সাগর এবং জীব জন্তু সবকিছুই এই অণুগুলোর সমন্বয়ে তৈরি। জীবন্ত অথবা জীবন ছাড়া সকল পদার্থ এইসব অনু থেকে তৈরি।

বাতাস মাটি পানি তাপ আলো বিদ্যুৎ অনু , মৌল বা যৌগ সমূহ কে বন্ধনে আবদ্ধ হতে প্রবাহিত করে। " **কোন পরিবর্তনই কারন ছাড়া ঘটে না।"** এই পরিবর্তন গুলোতে, অনুগুচ্ছ গুলো এক যৌগ থেকে অন্য যৌগে যায়, অথবা মুক্ত হয়। আমরা পদার্থকে মিলিয়ে যেতে দেখি, কেননা আমরা শুধু দৃশ্যমান বিষয়টি খেয়াল করি যা ভুল, কোন কিছু হারিয়ে যাওয়া বা উৎপত্তি হওয়া মানে শুধুই একটি পদার্থের অন্য একটিতে পরিবর্তিত হওয়া, কোন একটি হারিয়ে যাওয়া পদার্থ পানি গ্যাস অথবা পার্থিব কোন পদারথে পরিনত হয়। ছে। নতুন পদার্থটি আমাদের ইন্দ্রিয়ে কোনঅনুভুতির তইতি করে না, আমরা এটি অনুভব করতে পারি না যে এটি সত্তা হিসেবে এসেছে। এই কারনে আমরা বলে থাকি, পদার্থটি হারিয়ে গেছে, যা কিনা শুধু অন্য একটি পদার্থে পরিনিত হয়েছে।

আমরা এতিও দেখতে পাই যে, এসকল অনুর প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটতে পারে , পদার্থের কায়িক এবং রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। যখন কোন পদার্থ অন্য একটির সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন এটি আয়নিত হয় এবং নতুন একটি পদার্থের বা যৌগের উৎপত্তি হয়, এভাব পদার্থের কায়িক এবং রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে থাকে। প্রত্যেকটি পদার্থের অনু সমূহ নিউক্লিয়াসের মাধ্যমে তৈরি হয়, এবং অপর অতি ক্ষুদ্র অংশের নাম **ইলেকট্রন**। নিউক্লিউস পরমানুর মধ্যাংশে অবস্থান করে। হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য সব পদার্থে ধনাত্মক চার্জ প্রোটন এবং **নিউট্রন** রয়েছে, যারা ইলেকট্রিক চার্জ বহন করে। ইলেকট্রন ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট যা নিউক্লিয়াস কে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। ইলেকট্রন সমূহ তাদের কক্ষপথ সহজে পরিবর্তন করে না, তবে শর্তসাপেক্ষে পরিবর্তন করে।

তেসজস্ক্রিয় পদার্থের পরিবর্তনকে বলা হয় ফিউসান। নিউক্লিয়ার ফিউসানে একটি পদারথ সম্পূর্ণ অন্য একটি পদার্থে পরিনত হয়, এক্ষেত্রে বাদ পড়া ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই ফর্মুলাটি উদ্ভাবন করেন ইহুদি পদার্থবিদ আলবার্ট এইনিসটাইন (১৩৭৫ হিজরি [১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ]) উপাদানের মত পদার্থও পরিবর্তিত হতে পারে। জিবিত অথবা মৃত প্রত্যেকটি পদার্থ পরিবর্তিত হয়, পুরোপুরি হারিয়ে যায় এবং নতুন একটির আবির্ভাব দেখা দেয়। প্রত্যেকটা পদার্থ যা এখন বর্তমান তা এক সময় ছিল না, তাদের জায়গায় অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব ছিল। ভবিষ্যতে, বর্তমান কোন পদার্থই থাকবে না এবং নতুন পদার্থের আগমন ঘটবে। প্রাণহীন সকল পদার্থের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে। প্রত্যেক জীবন্ত এবং জড় বস্তু, লোহার উপাদান এবং পাথরের বস্তু, হাড় এবং সমস্ত উপাদান পরিবর্তিত হয়, নতুনত্তের আগমন ঘটে। কোন সত্তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়, এবং যে সত্তা হারিয়ে গেছে তার অনুপস্থিতি অনুভূত হতে শুরু করে, মানুষ যা বুঝতে পারে না,এর মাধ্যমে বোঝা যায় পদার্থ সবসময় বর্তমান। একটি চলচিত্রে এরকম একটি উদাহরন দেখা যায়, যেখানে ভিন্ন একটি ছবি চোখের সামনে আসে থাকে একটির পর একটি কিন্ত দর্শক এটি ভাবতে থাকে যেন একই চিত্র তারা দেখছে। যখন একটি কাগজ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তখন আমরা

বলি কাগজ হারিয়ে গেছে এবং ছাইয়ের আবির্ভাব ঘটেছে, কেননা আমরা পরিবর্তনটি লক্ষ করেছি। যখন বরফ গলে যায়, তখন আমরা বলে থাকি, বরফ হারিয়ে গেছে এবং পানির আবির্ভাব ঘটেছে। **সারাহ আল আকিদা** কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে,"কেননা সব সৃষ্টি আল্লাহ তালার ইশারায়, প্রত্যেক সৃষ্টি কে বলা হয় **আলাম**। একই প্রজাতির অন্য সব সত্তা কেউ বলা হয় আলাম। যেমন মানুষের আলাম, জীব জন্তুর আলাম, বস্তুর আলাম। অতবা প্রত্যেকটি পদার্থ আলাম।" **সারাহ আল মাওাকিফ** কিতাবের ৪৪১ নম্বর পৃষ্ঠায় এটি লেখা রয়েছে।[১]

"আলাম হচ্ছে হাদিস, প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি। অন্যকথায়, তারা সত্তায় আসে শুন্যতা থেকে।

[পূর্বে আমারা আলোচনা করেছি প্রত্যেকটি বস্তু অন্য আরেকটি বস্তু থেকে রূপান্তরিত হয়।] পদার্থ এবং এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হাদিস। এই বিষয়ের উপর তিনটি ভিন্ন মতবাদ রয়েছে:

১) মুসলিম,ইহুদি, খ্রিস্টান এবং আগুন পূজারীদের মতে পদার্থ এবং এর বৈশিষ্ট্যসমূহ হাদিস।

২) এরিস্টটল এবং তার অনুসারী দার্শনিকদের মতে, প্রত্যেকটি পদার্থ এবং এর বৈশিষ্ট্য চিরস্থায়ী।তাদেরমতে এগুলো শূন্যতা থেকে আসেনি, এরা পূর্ব থেকেই ছিল। আধুনিক রসায়ন শাস্ত্র প্রমান করে এই ধারনা ভুল। যে ব্যক্তি এরকম মনে করে এবং বিশ্বাস করে সে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইবনে সিনা[২] এবং মুহাম্মাদ ফারাবি একই কথা বলেছন।

(দামেস্ক,৩৩৯ হিজরি [৯৫০])।

৩) এরিস্টটলের অনুসারী দার্শনিকরা মনে করতেন পদার্থ চিরস্থায়ী এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলো হাদিস। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এটিকে ভুল প্রমান করেছেন।

৪) বস্তুসমূহ হাদিস এবং এর বৈশিষ্ট্য চিরস্থায়ী এটি কেও উল্লেখ করেন নাই। কালনিয়াস সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নাই এই চারটির কোনটি তিনি অনুসরন করবেন।"

মুসলিমরা অনেকবার বিভিন্নভাবে প্রমান করেছেন, পদার্থ এবং এর বৈশিষ্ট্য সমূহ হাদিস। এটি এই ভিত্তির উপর যে, পদার্থ এবং এর সকল অংশ সবসময় পরিবর্তনশীল। মাঝে মাঝে এই পরিবর্তন গুলো চিরস্থায়ী নয়, এতিকে হাদিস হতে হবে, প্রত্যেকটি পদারত পুরবের অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে না , যেখান থেকে এটির উৎপত্তি। এই পরিবর্তনগুলোর একটি শুরু থাকতে হবে, কিছু মৌলিক জিনিসের উৎপত্তি শূন্যতা থেকে। যদি শূন্যতা থেকে কিছুই সৃষ্টি করা না হতো, যদি পদার্থও থেকে পদার্থের পরিবর্তনের এই ধারাবাহিকতা অসীম অতীতের দিকে নিয়ে যেত, এই ধারাবাহিকতার কোন শুরুই থাকতো না এবং আজকের এই অবস্থাও আসতো না। পদার্থের এই পরিবর্তনশীলতা প্রমান করে কোন মৌলিক এবং শূন্যতা থেকে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে । অধিকিন্তু, আকাশ থেকে কোন পাথরের পতনে আমরা বলতে পারি না এটি শূন্যতা থেকে এসেছে, অসীম মহাকাশ অথবা সময়, এই সব্দ গুলোর অর্থ কোন শুরু এবং শেষ নেই।

[১] সায়্যিদ শেরিফ আলি জুরজানি **সারাহ আল মাওাকিফ** কিতাবের লেখক শিরাজাহে মারা যান। ৮১৬ হিজরি [১৪১৩ খ্রিস্টাব্দ]। বইটি একটি তাফসীর যার লেখক আব্দুর রাহমান বিন আহমেদ আলাউদ্দিন ইজি রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি (৭০০ খ্রিস্টাব্দ শিহরাজ – ৭৫৬ হিজরি [১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দ])। তিনি তার কিতাবের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করন লেখেন **জেওাহির** নামে, এবং পরবর্তীতে শামস আদ্দিন ফেনারি রাহামাতুল্লাহ আলাইহি এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ব্যাখ্যা লিখেন।

(৭৫১ – ৮৩৪ [১৪৩১ খ্রিস্টাব্দ])

[২] ইবনে সিনা ৪২৮ হিজরি সনে মারা যান, [১০৩৭ খ্রিস্টাব্দ]

অসীমতা থেকে আসা, যার অর্থ শুন্যতা থেকে আসা এবং কোন কিছু যা অসীমতা থেকে এসেছে তা কোন ভাবেই আসত না। এটি জ্ঞানহীন এবং ভ্রান্ত ধারণা, সবকিছু অসীমতা বা শুন্যতা থেকে এসেছে। অনুরূপভাবে, মানুষ অনন্তকাল থেকে রূপান্তরিত হয়ে আসে নাই। তারা নিশ্চয় রূপান্তরিত হতে

শুরু করেছে একজন থেকে, যাকে শুন্যতা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কোন আকজন মানুশকে যদি শুন্যতা থেকে সৃষ্টি না করা হতো এবং তার রুপান্তর অব্যাহত না থাকতো তবে আজ মানুষের অস্তিত্ব থাকতো না। এটি প্রত্যেকটি সত্তার জন্য প্রযোজ্য। তাই এটি অজ্ঞতা হবে পদার্থ এবং সত্তার রুপান্তরের উপর ভিত্তি করে যদি বলা হয়, এটি সৃষ্টি হয়েছে এবং ধংস হবে, শূন্যতা থেকে কোন মৌলিক সত্তার সৃষ্টি হয় নাই। রুপান্তর কখনোই চিরায়ত বোঝায় না, কিন্তু শুন্যতা থেকে সৃষ্টি নির্দেশ করে, এটি সত্তার **মুমকিন আলা ওয়াজুদের** বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, **ওয়াজিব আল ওয়াজুদ** নয়।

প্রশ্ন: "আলমের সৃষ্টিকর্তা নিজে এবং তার গুন সমূহ চিরায়িত। যেহেতু তার সৃজনসমূহ চিরায়িত, তার আলাম সমূহও চিরায়িত নয়কি?"

উত্তর: আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখছি চিরায়িত সৃষ্টিকর্তা, পদার্থও এবঙ্গুপাদান গুলো পরিবর্তন করেন বিভিন্ন উপায়ে এবং কারনে, তিনি সেগুলো ধংস করেন এবং পুনরায় একই স্থানে সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিকর্তা যখন ইচ্ছে সৃষ্টি করেন, তেমনি ভাবে এক সত্তা থেকে আরেক সত্তার সৃষ্টি করেন। যেমন তিনি আলমের সৃষ্টি করেন কোন উপায়ে বা কারনে এক সত্তা থেকে অপর সত্তা, তেমনিভাবে কোন কারন ছাড়াই বা শূন্যতা থেকে সৃষ্টি করতে পারেন তার ইচ্ছে অনুযায়ী। যারা বিশ্বাস করে সত্তা সমূহও হাদিস তারা এটিও বিশ্বাস করবে সেগুলো ধংস হবে। যে সত্তাগুলো শূন্যতা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলো পুনরায় শূন্যতায় ধংস হবে। আমারা দেখতে পাই কিছু সত্তা টিকে থাকার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে, অথবা এমন কিছুতে পরিনত হচ্ছে যা আমাদের ইন্দ্রিয় অনুভূত হয় না। মুসলিম হিসেবে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে সবকিছু শুন্যতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং পুনরায় সেগুলো শূন্যতায় হারিয়ে যাবে। আমরা দেখছি শূন্যতা থেকে সবকিছুর সৃষ্টি হচ্ছে এবং পুনরায় শূন্যতায় হারিয়ে যাচ্ছে, তাদের আকার এবং উপাদানের পরিবর্তন হচ্ছে। যখন পদার্থও বিলুপ্ত হয়ে যায় তখনও তার উপাদান গুলো বিলুপ্ত হয় না। যেমনটা আমরা উপরে আলোচনা করেছি, পদার্থ চিরায়ত নয়, এগুলো অনেক আগে আল্লহ তালা সৃষ্টি করেছেন এবং

এগুলো পুনরায় তিনি কিয়ামাতের সময় ধংস করবেন। আজকের বৈজ্ঞানিক তত্ত আমাদের এই বিশ্বাস থেকে দূরে সরাতে পারবে না।

এটি অবিশ্বাস করার অর্থ ইসলাম এবং বিজ্ঞানকে হেয় করা। ইসলাম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে হেয় করে না। এট ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন এবং ইবাদাত সম্পর্কে অনীহাতে বাধা দেয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ইসলাম কে প্রত্যাখ্যান করে না। একভাবে এটি প্রমান করে এবং নিশ্চিত করে। কেননা আলাম হাদিস এবং এর একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছে যিনি শুন্যতা থেকে সৃষ্টি করেছেন সবকিছু, যেমনটা আমরা উপরে আলোচনা করেছি কোন ঘটনাই নিজে থেকে সম্পাদিত হয় না। আজকের দিনে অনেক ঔষধ আসবাবপত্র পণ্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ অস্ত কারখানায় তৈরি হচ্ছে। এদের বেসির ভাগই সুক্ষ হিসেবের মাধ্যমে এবং হাজার পরীক্ষার পরে প্রস্তুত করা হয়। তারা কখনো কি বলে এগুলো নিজে নিজে তৈরি হয়ে গেছে। না তারা বলে, এগুলো খুব সূক্ষ্ম ভাবে পরিচর্যার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে, এদের প্রত্যেকটি র জন্য একজন কারিগর প্রয়োজন। এরপরেও তারা বলে থাকে লাখো পদার্থ যেগুলো জিবনের সাথে জড়িত অথবা জিবিত নয়, যাদের শ্রেণিবিন্যাস আজও অজানা সেগুলো কোন একটি দুর্ঘটনায় সৃষ্টি হয়েছে। এটি একটি মানুষিক বিকারগ্রস্থতা না হয়ে থাকলে , জেদ অথব মূর্খতা? এটি সুস্পষ্ট যে, একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন যিনি শুন্যতা থেকে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং গতি প্রদান করেছেন। সৃষ্টিকর্তা ওয়াজিব আল ওয়াজুদ, যিনি শূন্যতা থেকে আসেননি। তিনি অবশ্যই চিরায়িত ভাবে বিদ্যমান। তার অস্তিত্তের জন্য তার কিছুরই প্রয়োজন নেই। যদি তিনি চিরায়িত না হতেন, তবে তিনি অবশ্যই মুমকুন আল ওয়াজুদ একজন সৃষ্টি আলমের মত হতেন, এবং একটি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতেন যার জন্য একজন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন, এই ধারাবাহিকতায় অসীম সংখ্যক সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন, আমরা যেভাবে বর্ণনা করেছি সেভাবে বর্ণনা করলে সৃষ্টি অসীম হতে পারে না, কেননা সৃষ্টিকর্তার সংখ্যা অসীম হতে পারে না, একজন প্রথম এবং একমাত্র সৃষ্টিকর্তা প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেন। যদি একজন সৃষ্টিকর্তা আরেকজন সৃষ্টিকর্তা কে সৃষ্টি করতেন তবে তবে তা অসীমতায় যেত এবং কোন সৃষ্টিকর্তাই থাকতো না সৃষ্টির শুরুর

জন্য, সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্ব থাকতো না। সৃষ্টি কর্তা কে সৃষ্টি করা হয় নি। তিনি চিরায়িতভাবে আছেন। যদি তিনি কখনো ধ্বংস হয়ে যেতেন তবে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যেত। ওয়াজুদ আল ও্বাজুদের কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই কোন ভাবেই। যিনি পৃথিবী স্বর্গ অনুসমুহ এবং জীবনের সৃষ্টি করেছেন, তিনি অবশ্যই সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী এবং ইচ্ছে অনুযায়ী যা ইচ্ছে সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি এক এবং তার কোন পরিবর্তন নেই।

যদি তার ক্ষমতা অসীম না হতো, যদি তিনি সর্বশক্তিমান না হতেন, তবে তিনি এত সূক্ষ্ম এবং নিয়মিতভাবে সৃষ্টি করতে পারতেন না। যদি একজনের চেয়ে বেশী সৃষ্টিকর্তা থাকতেন, তাদের সৃষ্টির ইচ্ছে হতো না, যার সৃষ্টির ইচ্ছা অপূর্ণ থাকতো এবং তিনি সৃষ্টিকর্তা হতে পারতেন না, সব সৃষ্টি এলোমেলো হয়ে যেত। আরও জানার জন্য দয়া করে আলি উশিসরের আরবি এবং তুরকিশ কিতাব **কাসিদাত আল আমালি** পড়ুন (৫৭৫ হিজরি [১১৮০])।

সৃষ্টিকর্তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে না। মহাজগৎ সৃষ্টির পূর্বে যেমন ছিলেন আজও ঠিক তেমনি আছেন। যেমন তিনি শূন্যতা থেকে সবকিছুর সৃষ্টি করছেন, তেমনি ভাবে এখনও সৃষ্টি করেন, অন্যভাবে যেকোন পরিবর্তনই সৃষ্টি নির্দেশ করে এবং শূন্যতা থেকে সৃষ্টি বোঝায়। আমারা উপরে আলোচনা করেছি তিই সবসময় ছিলেন এবং কখনো ধ্বংস হবেন না। কোন পরিবর্তনই তার মধ্যে আসবে না। যেহেতু প্রত্যেকটি সৃষ্টির ধারাবাহিকতার জন্য প্রয়োজন রয়েছে তাকে, সেহেতু তকে সবসময় প্রয়োজন। তিনি একাকী সবকিছু সৃষ্টি এবং পরিবর্তন করেন। তিনি সবকিছু একটি কারন বা ঘটনার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেন যাতে করে মানুষ বুঝতে পারে এবং সভ্য হয় এবং যাতে করে সবকিছু নিয়মের মধ্যে ঘটে । যেমন তিনি ঘটনা সৃষ্টি করেন, তেমনি শক্তির সৃষ্টি করেন,ঘটনাকে প্রবাহিত করেন। মানুষ কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষ শুধুমাত্র একটি মাধ্যম সম্পাদনে। ক্ষুধার সময় খাওয়ার জন্য, অসুস্থতায় ঔষধ গ্রহনের জন্য, মোমবাতি জ্বালানোর জন্য দেয়শলায় ধরাতে, জিংকের মধ্যে এসিড দিয়ে হাইড্রোজেন পেতে, গরুকে খাওয়াতে দুধের জন্য, বিদ্যুতের জন্য পাওয়ার স্টেশন তৈরি তে মানুষ শুধু মাত্র মাধ্যম, এই ঘটনার মাধ্যমে আল্লহ তালা

নতুনের উদ্ভব ঘটান। মানুষের ইচ্ছা এবং শক্তিও আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। এবং মানুষের জন্যই আল্লাহতালার সমস্ত সৃষ্টি। আল্লাহ এই পদ্ধতি তৈরি করেছেন। এটি মূর্খতা বা হাস্যকর হবে যদি অযৌক্তিক যুক্তি এবং বিজ্ঞান থেকে বলা হয়, এমনিতেই সৃষ্টি,আমরা সৃষ্টি করেছি। মানুষের অবশ্যই সৃষ্টিকর্তা কে ভালবাসতে হবে, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য করেছেন। তারা অবশ্যই তার বান্দা হবেন। প্রত্যেকটি সৃষ্টিকেই তাকে মানতে হবে এবং তার ইবাদাত করতে হবে। এই কিতাবের শুরুর কথায় এই বিষয়টি বিস্তারিত বলা হয়েছে। তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন, আজিব আল ওয়াজুদ , তিনি সৃষ্টিকর্তা যিনি এক এবং তিনি **আল্লাহ**। মানুষের অধিকার রয়েছে তাকে তার গুনের নাম অনুযায়ী ডাকার। অনুমুতি ছাড়া কোন কিছু করা ভুল এবং ঘৃণিত।

খ্রিস্টান এবং তাদের যাজকেরা মনে করে তিনজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। উপরের এই আলোচনাগুলো এই বিষয় প্রমান করে, একজন মাত্র সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং খ্রিস্টান ও তাদের যাজকদের দেয়া যুক্তিগুলো কৃত্রিম এবং মতবিরোধী।

“সালাফিয়্যা”

আমরা প্রথমেই বলবো আহলে সুন্নাহর চিন্তাবিদ রাহিমাল্লাহু তালা আলাইহিম আজমাইন কিতাব সমুহে সালাফিয়্যা বা সালাফিয়্যা মাঝাহাব নামে কোন কিছুর কথা উল্লেখ করেননি। এই নামটি পরবর্তীতে লা মাধহাবি কিতাবের মাধ্যমে তুরকিশদের মধ্যে ছড়ানো হয়। তাদের মতে, সালাফিয়্যা মাজহাব আশারিয়্যা এবং মাতুরদিয়্যা মাজহাবের উৎপত্তির পূর্বের সুন্নি মাজহাব। তারা সাহাবী এবং তাবেঈন দের অনুসারী ছিলেন। এই মাজহাবটি সাহাবা, তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈনদের। গুরুত্বপূর্ণ চার ইমাম এই মাঝহাবের অন্তর্ভুক্ত।

সালাফিয়্যা মাঝহাবের প্রথম কিতাব **ফিকাহ আল আকবর** লিখেছিলেন, ইমাম আল আযাম। আল ইমাম আল গাজ্জালি, **ইমাম আল আওয়াম আনিল কালাম** কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন সালাফিয়্যা মাঝহাবের সাতটি সারমূল রয়েছে। মুতাখিরিনের ইল্ম আল কালাম শুরু হয়েছিল আল ইমাম আল গাজ্জালির মাধ্যমে। উলামাদের মাঝহাব সম্পর্কে গবেষণা করে ইলিম আল কালামের অনেকগুলো পদ্ধতি পরিবর্তন করেন। তিনি অনেকগুলো আধ্যাত্মিক বিষয় সংযোগ করেন ইলিম আল কালামে। আর রাদ্দ এবং আল আমিদি কালাম এবং দর্শন সংযুক্ত করেন জ্ঞানের অধ্যায়ে। এবং আল বেয়দাই এসবকে অবিচ্ছেদ করেন। মুতাখিরিনের ইলম আল কালাম সালাফিয়্যা মাঝহাবের প্রসার রোধ করে। ইবন তায়িমিয়্যা এবং তার অনুসারী ইবন আল কায়্যাম আল জাওজিয়্যা পরবর্তীতে এটি বর্ধিত করতে চাইলে তা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়ে যায়, প্রথম দিকের সালাফিরা আল্লাহ্‌র বিধি নিষেধ বিস্তারিত আলোচনা করতো না বা নাসের মুস্তাহাব বুঝত না। পরবর্তীতে তারা এই বিষয়গুলো আলোচনায় নিয়ে আসে। এটি বেশ প্রসিদ্ধ হয় পরবর্তী সালাফিদের কাছে। পূর্ব এবং পরবর্তী সকল সালাফিদের একসাথে **আহলে আস সুন্নাত আল খাসসা** বলা হয়। আহলে সুন্নার কালাম বাক্তিরা নাসের কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল কিন্ত সালাফিরা তা, মানতে চায়নি, তারা এটির বিরোধিতা করে।

এটি বলা সঠিক হবে না যে, **আল আশারি** এবং **আল মাতুরিদি** মাঝহাব পরে এসেছে। এই দুই মহান ইমাম ইতিকাদ এবং ইমানের সংযোগ

করেছেন সালাফি আস সালামের মাধ্যমে এবং তরুনদের জন্য গ্রহণযোগ্য করে প্রকাশ করেছেন। আল ইমাম আল আশারি ছিলেন ইমাম আস শাফির নিয়মের প্রতীক। আল ইমাম আল মাতুরিদি ছিলেন ইমাম আল ইমাম আবু হানিফার নিয়মের প্রতীক। তারা দুজনেই তাদের শিক্ষকের মাঝহাবের বাইরে যান নি, তারা নতুন কোন মাঝহাব তৈরি করেন নি। এই দুজন এবং তাদের শিক্ষক সাথে মহান চার ইমামের মাঝহাবে একটি দিক মিল ছিল সেটি হচ্ছে, **আহলে সুন্নাহ ওয়াআল জামাহ** । এই মাঝহাব গুলোর মানুষের মূলনীতি এবং সাহাবী আল কারিম , তাবেঈন তাবে তাবেঈনদের মূলনীতি একই। ইমাম আবু হানিফার লেখা কিতাব **ফিকাহ আল আকবর** আহলে সুন্নাহ মাঝহাব সমর্থন করে। ইমাম গাজ্জালির কিতাব **ইযাম আল আওাম আনিল কালামের** মধ্যে সালাফিয়্যা নামক কোন শব্দ নেই। এই দুটি কিতাব এবং **ফিকাহ আল আকবর** কিতাবের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ কাওাল আল ফাসল আহলে সুন্নাহ সম্পর্কে ধারণা দেয় এবং ভ্রান্ত ধারনাকারি ও দার্শনিকদের জবাব দেয় । ইমাম গাজ্জালি ইযাম আলাওাম কিতাবের মধ্যে লিখেছেন, "এই কিতাবে আমি জানাব যে সালাফ মাঝহাব সঠিক এবং সত্য। আমি ব্যাখ্যা করবো যে , যারা এই মাঝহাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা বিদাত করে। সালাফ মাঝহাবের অর্থ সাহাবি আল কারিম এবং তাবেঈনদের মাঝহাব। এই মাঝহাবের গুরুত্বপূর্ণ দিক সাতটি।" যেমনটা দেখা যায়, **ইজাম** কিতাবের মধ্যে সালাফ মাঝহাবের এই সাতটি বিষয়ে গুরুত্তারোপ করা হয়েছে। পরবর্তীতে এই বিষয়গুলো বিকৃত করা হয়েছে এবং ইমাম গাজ্জালিকে অপবাদ দেয়া হয়েছে। আহলে সুন্নার প্রায় প্রতিটি কিতাবের মধ্যে এবং ফিকাহ কিতাব **দূর উল মুখতারের** সালাফ এবং খালাফ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে: "সালাফ সাহাবাদের এবং তাবেঈনদের উপাধি। তাদেরকে **সালাফ আস সালেহিন** বলা হয়। এবং যে সকল আহলে সুন্নার উলামারা সালাফ আস সালেহিনে উন্নীত হন তাদের বলা হয় **খালাফ**। তাফসিরে উলামাদের মধ্যে ইমাম গাজ্জালি, আল ইমাম আল রাদ্দ, আল ইমাম আল বেয়দা সালাফ আস সালেহিনের মাঝহাবের অন্তর্ভুক্ত।

বিদার অনুসারীরা যারা সালাফিদের সময়ে আবির্ভূত হয়েছিল তারা ইলম কালামের সাথে দরশন মিশিয়ে ফেলেছিল। এমনকি তারা তাদের ইমান দর্শনের উপর ভিত্তি করে নিয়েছিল। **আল মিলাল ওয়ান নিহাল** কিতাবতি তাদের

সময়ে করা বিকৃতিগুলোর বিষদ বর্ণনা দিয়েছেন। আহলে সুন্নার মাঝহাব রক্ষায় এই তিন ইমাম সঠিক জবাব এবং যুক্তি দিয়েছিলেন তাদের দর্শনের। এই জবাব দেয়ার মানে এই নয় যে, আহলে সুন্নার সাথে দর্শন মিস্রিত করা। একভাবে, তারা ইলমের জ্ঞান এবং দর্শনের ধারণা গুলো আলাদা করেন। দর্শনীয় কোন তত্ত্ব নেই আল বেইদাওার কর্মে বা **শাইখ জাদার** কাজের মধ্যে, এটি অত্তন্ত গুরুত্বপূর্ণ টীকা। এটা বলা সত্তিই অনুচিত যে, এই মহান ইমামরা এটিকে দর্শনের পথে নিয়ে গেছে। এটি প্রথম আলোকপাত করা হয়েছে, আহলে সুন্নাহ উলামা ইবনে তায়মিয়্যার কিতাব **আল ওয়াসিতার** মধ্যে। পরবর্তীতে ইবনে তায়মিয়্যা এবং তার অনুসারী ইবন আল কায়্যাম আল জাওজিয়্যা সালাফি মাঝহাবের এই জটিল সমস্যা এবং কে তাদের বিভক্ত করেছে ভিন্ন পথে এবং সঠিক পথ কোনটি তার সমাধানে পৌছাতে চেষ্টা করেন। এই দুই বাক্তির পূর্বে সালাফিয়্যা নামে কোন মাজহাব বা এই নামে কোন শব্দ ছিল না, তারা কিভাবে তাদেরকে বলতে পারে তারা এর সমাধানে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন ? তাদের দুই জনের আগে একটি মাত্র সঠিক মাঝহাব ছিল আলাফ আস সালেফিনের মাঝহাব। ইবনে তায়মিয়্যা অনেক বিকৃত করেন এটি এবং অনেক বিদাতের জন্ম দেন। বইগুলো মতবিরোধী, বিকৃত এবং লা মাঝহাবি মানুষদের দারা লিখিত যা ইবনে তায়মিয়্যার সৃষ্টি বিদাত। মুসলিম এবং তরুনদের সাথে প্রতারনার জন্য তারা এই ধরনের ধর্ম বিরোধী কৌশল অবলম্বন করে, তারা সালাফ আস সালিহিন থেকে সালাফিয়্যা নামটি নেয়, যাতে করে ইবনে তায়মিয়্যার বিদাত সমূহ সমর্থন পায় এবং তরুণরা তার পথ অনুসরন করে, তারা সালাফ আস সালেহিনের মহান আলেমদের নাম ব্যাবহার করে বিদাত এবং দর্শনের সাথে, তারা এইসব আলেমদের তাদের সালাফিয়্যার জন্য অপবাদ দিয়ে থাকে, তারা ইবনে তায়মিয়্যা এবং মুজতাহিদ কে মহানায়ক মনে করে সালাফিয়্যার পুনরজাগরনের জন্য।

[১]**ফিকাহ আল আকবর** এবং **কাওাল আল ফাসল** কিতাব দুটি হাকিকাত কিতাবেভি ইস্তানবুল থেকে প্রকাশিত।

আসলে আহলে সুন্নার আলেমরা আহলে সুন্নার ইতিকাদ শিক্ষা দিতে বলেছেন, যা সালাফি আস সালেহিনের মাঝহাব এবং তারা যে কিতাব গুলো

লিখেছেন আমাদের সময় এবং আজও এটি উল্লেখ করেন ইবনে তায়মিয়্যা এবং তার অনুসারীরা মুসলিমদেরকে কে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

যারা **আত তাওাসসুলি বিন নাবি ওয়া বিসসালিহিন উলামা আল মুসলিমিন ওয়া মুখালিফুন** এবং এর সূচনা **তাথির আলফুয়াদ মিন দানাসইল ইতিকাদ** কিতাব পড়েছেন তারা বুঝতে পারবেন, বিকৃত বিশ্বাস যা নতুন সালাফিয়্যা নামে মুসলিমদেরকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত করছে এবং ইসলামের ক্ষতি করছে। ইদানিং কিছু বাক্তি নিয়মিত সালাফিয়্যা মাঝহাবের নামটি ব্যাবহার করছে, কিন্তু শুধুমাত্র **সালাফি আস সালাহিন** নামে মাঝহাব রয়েছে, যা ইসলামের প্রথম দুই শতকে প্রসংশিত হয়েছিল। ইসলামের তৃতীয় এবং চতুর্থ সেঞ্চুরির আলেমদের বলা হয় **খালাফ আস সালেকিন**। এই সকল মানুষের ইতিকাদকে বলা হয় **আহলে সুন্নাত ওয়া জামিয়ার মাঝহাব**।

এটিই ইমানের এবং বিশ্বাসের মাঝহাব। সাহাবা কারিম এবং তাবেঈনদের মাঝহাব ছিল এটি। তাদের বিশ্বাসের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। আজকের দুনিয়ার অধিকাংস মানুষ আহলে সুন্নাতের অনুসারী। ৭২ টি ভুল পথের উৎপত্তি হয়েছে ইসলামের দ্বিতীয় শতকে। উদ্ভাবকদের কয়েকজন সে সময় বেছে ছিলেন, কিন্তু তাবেঈনদের লিখিত আকারে আসার পরে আহলে সুন্না বিভক্ত হতে শুরু করে।

রাসুল সাল্লাহি সালাম এই বিশ্বাস আহলে সুন্নাহ নিয়ে আসেন, সাহাবা কারিমরা ঈমানের এই শিক্ষা দীক্ষিত ছিলেন। তাবেঈন কারিমরা সাহাবাদের থেকে এই শিক্ষা নিয়েছেন। এর ধারাবাহিকতায় শিখেছেন তাদের অনুসারীরা, এরপর আহলে সুন্নাহ ছড়িয়ে পড়ে এবং আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এই শিক্ষা গ্রহন করা যুক্তির মাধ্যমে সম্ভব নয়। বুদ্ধির সাহায্যে তা পরিবর্তন সম্ভব নয়, কিন্তু বঝা সম্ভব। তবে, বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন রয়েছে এটি সত্য এবং এর গুরুত্ব তা বোঝার জন্য। হাদিসের আলেমরা সবাই আহলে সুন্নায় বিশ্বাসী। চার মাঝহাবের ইমামরাও এই মাঝহাবে বিশ্বাসী ছিলেন। আল মাতুরিদি এবং আল আল আশারি আমাদের বিশ্বাসের এই দুই ইমাম এই মাঝহাবের ছিলেন। তারা দুই জনই এই মাঝহাবের প্রচার করেছেন।

তারা সবসময় এই মাঝহাবকে ধর্মদ্রোহিতা এবং বস্তুবাদিতার বিপক্ষে ব্যাবহার করেছে, যা প্রাচীন গ্রীক দর্শনতত্ত্বে আটকে থেকেছে। যদিও তারা সমবয়সী ছিল, তবুও তারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসবাস করতো, তাদের চিন্তা ভাবনা এবং পাপাচারীদের সাথে তাদের সংযোগের পথ ভিন্ন ভিন্ন ছিল, যে কারনে তাদের প্রতিরক্ষার উপায় আহলে সুন্নার এই দুই মহান আলেমের উত্তর এবং যুক্তি গুলো ভিন্ন ভিন্ন ছিল। কিন্তু এর মানে এই নয় যে তারা ভিন্ন ভিন্ন মাঝহাবের ছিলেন। হাজারো ইমাম এবং আওলিয়া এই দুই মহান ইমামের কিতাব পড়েছেন এবং এই মত দিয়েছেন যে এঁরা আহলে সুন্নাহ মাঝহাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আহলে সুন্নার আলেমরা তাদের বাহ্যিক দৃষ্টি থেকে নাস গ্রহন করেছেন। তারা বাহ্যিকভাবে যে আয়াত এবং হাদিস গুলো দেখিয়েছে, তারা নাস অনুযায়ী এসবের কোন ব্যাখ্যা দেন নাই অথবা এসবের মানে পরিবর্তন করেন নি এবং তারা কখনোই কোন পরিবর্তন নিজের জ্ঞান অথবা মতবাদ থেকে করার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু প্রচলিত মতবিরোধীরা এবং লা মাঝহাবিরা ইমান এবং ইবাদাতের শিক্ষাগুলো পরিবর্তনে দ্বিধা করেনি ঠিক যেমনটা গ্রীক দার্শনিক এবং শাম দেশের বিজ্ঞানীরা এবং ইসলামের প্রতিপক্ষরা।

যখন ইসলামের অবিভাবক এবং সেবক ওসমানী সাম্রাজ্য কয়েক শতক ব্যাপী ইসলামের আলো ছড়িয় ছিল, তখন মুক্তমনা এবং মিশনারিরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্জের ঘৃণিত পন্থায় সংহত হয় এবং লা মাঝাহাবিরা এই সুযোগটি নেয়। অতিমন্দ কৌশল অবলম্বন করে তারা আহলে সুন্নাহকে ধ্বংস করতে শুরু করে, বিশেষ করে সৌদি আরবের মত দেশে আহলে সুন্নার আলেমরা মুক্তভাবে কথা বলতে পারেন না। অগাধ পরিমান স্বর্ণ ব্যাবহার করে অহাবিয়রা এই আগ্রাশন পৃথিবী ব্যাপী ছড়াতে সাহায্য করে। পাকিস্তান ভারত এবং আফ্রিকার দেশ গুলতে তারা কম ধর্মীয় জ্ঞান সম্পন্ন মানুষদের কে বিভিন্ন ধরনের পদ এবং সম্পদের প্রলোভন দেখিয়ে এই আগ্রাশন চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষ করে তরুণদের আহলে সুন্নার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে এই ধরনের জঘন্য প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। মাদ্রাসার ছাত্রদের এবং মুসলিম শিশুদের পথভ্রষ্ট করার জন্য একজন লেখক তার একটি কিতাবের মধ্যে লিখেছে: "আমি এই কিতাবটি এই নিমিত্তে লিখেছি, মাঝহাবের মধ্যে থেকে ধর্মান্ধতা দূর করতে এবং যাতে করে সকলে মাঝহাবের মধ্যে শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

" এই লেখক বোঝাতে চেয়েছেন ধর্মান্ধতা দূর করার উপায় আহলে সুন্না মাঝহাব এবং এর আলেমদের হেয় করা। তিনি ইসলামে একটি ছুরিঘাত করলেন এবং বললেন তিনি এটা করছেন যাতে করে মুসলিমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারে। কিতাবের অন্য একটি জায়গায় লিখেছেন: "যদি কোন চিন্তাশীল বাক্তি তার চিন্তার সঠিক জায়গা ধরতে পারে তবে তিনি দশগুন নেকি পাবে, আর যদি সঠিকটি ধরতে না পারেন তবে কোন নেকি পাবেন না। " প্রত্যেকের কতে, খ্রিস্টান অথবা বহু ঈশ্বরবাদী জেই হউক না কেন তার ভাল ছিন্তার জন্য নেকি পাবে এবং একটি ভাল চিন্তার জন্য দশটি নেকি পাবে। দেখুন তিনি কিভাবে রাসুল সাল্লাহি আলাইহিস সালামের হাদিসের পরিবর্তন ঘটালেন, এবং কৌশল অবলম্বন করলেন। হাদিসটি এরকম: **"যদি কোন মুজতাহিদ বাক্তি কোন আয়াত বা হাদিস থেকে সঠিক প্রতিলিপি গ্রহন করে তাকে দশটি নেকি দেয়া হবে। যদি সে ভুল করে তবে তাকে একটি নেকি প্রদান করা হবে।"** এই হাদিসটিতে দেখা যায় এই নেকি শুধু মাত্র একজন ইসলামী চিন্তাবিদ যিনি ইজতিহাদের পর্যায়ের এবং তিনি তার সব চিন্তার জন্য এই নেকি পাবেন না শুধুমাত্র নাসের কাজের জন্য। তার এধরনের কাজ ইবাদাত। অন্য সব ইবাদাতের মত এই ইবাদাতের ও নেকি দেয়া হবে।

সালাফ আস সালেফিন, মুজতাহিদ এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের সময় ইসলামের চতুর্থ দশকের শেষের দিকে যখনই জীবন ধারায় নতুন কোন পরিবর্তন আসতো তখন মুজতাহিদরা দিন রাত পরিশ্রম করতেন এই নতুনত্বকে **আল আদলাত আস শারিয়া** আদলে ব্যাখ্যা কোরা যায় কিভাবে তা বের করার জন্য, এবং পরিতি মুসলিম এই শিক্ষা গ্রহন করে তাদের মাঝহাবের ইমামদের দেখানো পথ অনুযায়ী চলতেন। যেসকল মহান আলেমরা এই কাজগুল করেছেন তাদেরকে এই দশটি নেকি বা একটি নেকি প্রদান করা হয়েছে। চতুর্থ দশকের পড়ে মুসলিমরা এসব মুজতাহিদদের অনুসরণ করতে শুরু করেন। এই দীর্ঘ সময়ে একজন মুসলিমও পথ ভ্রষ্ট হয় নি। এই দীর্ঘ সময়ে একজন আলেম বা মুফতি শিক্ষিত ছিলেন না , তার পরেও তারা ইজতিহাদের পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন, আজকে আমাদের একজন শিক্ষিত মুসলিমদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে যে কিনা, এই সকল আলেমদের কিতাব থেকে আমাদের চার মাঝহাব সম্পর্কে পড়তে এবং বোঝাতে পারবে, এবং যাতে করে

আমরা সঠিক ভাবে তা প্রতিপালন করতে পারি এবং ইবাদাত করতে পারি। আল্লাহ তালা সব নিয়ম কানুন কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন। তার সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সবকিছু বর্ণনা করছেন। আর আহলে সুন্নার আলেমরা এই বিষয়গুলো সাহাবাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহন করে কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই কিতাবগুলো এখনও বর্তমান রয়েছে পৃথিবীতে। পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত যত নতুন সমস্যাই আসুক না কেন এই কিতাবগুলোর শিক্ষার মাধ্যমে তার সমাধান করা সম্ভব। এই সম্ভাবনাটি কুরআনের **মুজিযা** এবং ইসলামি আলেমদের **কারামা**। কিন্তু এসব একজন সত্য সুন্নি মুসলিমের কাছ থেকে জানার প্রয়োজন রয়েছে। যদি আপনি কোন লা মাঝহাবিদের প্রশ্ন করেন তাহলে আপনাকে ধর্মীয় ভুল ধারণা দিতে পারে এবং ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে।

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি কিভাবে তরুণদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে, এই সকল লা মাঝাহাবিরা যারা আরবের এই দেশ গুলতে গেছে, আরবি শিখেছে এবং তাদের পাপ এবং আনন্দের পথ অনুসরণ করেছে, অতঃপর ভারত উপমহাদেশে ফিরে এসেছে আহলে সুন্নার শত্রু হিসেবে। তরুণরা যখন দেখে তাদের উচ্চ ডিগ্রী আছে এবং আরবি বলতে পারে তখন ভাবে তারা ইসলামি আলেম। যাইহউক তারা ফিকাহ শাস্ত্রের কোন বিষয়ই সম্পূর্ণরূপে অবগত নয়। এমনকি তারা এই কিতাবের কোন ধর্মীয় শিক্ষায় বিশ্বাস করে না, তারা বলে থাকে এগুলো বিকৃত। পূর্বে ইসলামি চিন্তাবিদরা ফিকাহ কিতাবে তাদের প্রশ্ন গুলোর জবাব খুজেছেন এবং সেই জবাব গুলো সংযোগ করেছেন। কিন্তু একজন লা মাঝাবি মানুষ এই বিষয়গুলো বুঝতে পারবে না , সেকারনে প্রশ্ন কর্তাকে সঠিক জবাব না দিয়ে তাদের ইচ্ছে মত এবং মন গড়া জবাব দিয়ে জাহান্নামের পথে পরিচালিত করবে। এই বিষয় সম্পর্কে আমাদের নবীজি উল্লেখ করে গেছেন: “**ভালো আলেম মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। খারাপ আলেম মানব জাতির মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট।**” এই হাদিস প্রমান করে আহলে সুন্নার আলেমরা মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং লা মাঝহাবিরা মানবতার সর্ব নিকৃষ্ট। কেননা ভালো আলেম রা মানুষকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে, আর খারাপ আলেমরা আমানুশকে জাহানামের পথে পরিচালিত করে।

উস্তাদ ইবনে খালিফা আলিইয়া জামি আল আঝার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরাশুনা শেষ করে তার কিতাব **আকিদাত আস সালাফি ওয়ালখালাফের** মধ্যে লেখেন:" আল্লামা আবূ যুহরা **তারিখ আলমাধাবি ইসলামিয়্যা** কিতাবের মধ্যে লিখেছেন কিছু মানুষ চতুর্থ শতকের শেষের দিকে হানবালি মাঝহাবের যারা নিজেদেরকে ভিন্নমতের মনে করে হাজিরার পড়ে নিজেদেরকে **সালাফিয়্যা** বলে দাবি করতে শুরু করে, আবুল ফারাজ ইবনে জাউজি এবং অন্যান্য চিন্তাবিদরা হানবালি মাঝহাবের অনুসারীরা ঘোষণা করেন তারা সালাফি আস সালেহিনের অনুসারী ছিলেন না, তারা বিদাত করে এবং তারা মুজাসসিম গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। আলেমরা ফিতনা বন্ধের চেষ্টা করেছেন। সাতের দশকে পুনরায় ফিতনা রত করেন ইবনে তায়মিয়্যা।"[১]

লা মাঝহাবিরা সালাফিয়্যা নামটি ধার নেয় এবং ইবনে তায়মিয়্যা কে সালাফির মহান ইমাম বলতে শুরু করে। এই শব্দটি দৃষ্টিগোচর হতে শুরু করে, সালাফি নামক কোন শব্দ ছিল না তার আগমনের পূর্বে। সালাফ আস সালেহিন ছিল যাদের মাঝহাব ছিল আহলে সুন্নাহ। ইবনে তায়মিয়্যার মতবিরোধী ধারণাগুলো অহাবিয়াদের এবং অন্যান্য লা মাঝহাবিদের উৎস হয়ে যায়। ইবনে তায়মিয়্যা হানবিল মাঝহাব থেকে এসেছিলেন যে কারনে তিনি সুন্নি ছিলেন।

[১] এই কিতাবের ৩৪০ নম্বর পৃষ্ঠায় সালাফি এবং অহাবিদের বিদাত সম্পর্কে বলা হয়েছে। আহলে সুন্না সম্পর্কে তাদের কটূক্তির জবাব রয়েছে এই কিতাবে। এটি ১৩৯৮ হিজরি সনে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্ক শহরে মুদ্রিত হয়।

যাইহউক তিনি যখন পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরন শেষ করলেন এবং ফাতয়ার পর্যায়ে পৌঁছালেন তখন আহলে সুন্নার আলেমদের উপর টেক্কা দিতে শুরু করলেন।তার জ্ঞান তাকে ধর্ম বিরোধী করেছে। তিনি শেষ পর্যন্ত হানবিল মাঝহাবে ছিলেন না, কেননা আহলে সুন্নার চার মাঝহাবে থাকতে হলে আহলে সুন্নার বিষয়গুলোতে বিশ্বাস রাখতে হবে। যেসকল বাক্তি বলে থাকে তাদের আহলে সুন্নাহতে বিশ্বাস নেই তারা হানবিল মাঝহাবে থাকতে পারে না। লা মাঝহাবিরা সব ধরনের কৌশল অবলম্বন করে সুন্নিদের অপদস্থ করতে, তাদের নিজের দেশে। তারা আহলে সুন্নির যাইহউক তিনি যখন পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরন শেষ করলেন এবং ফাতয়ার পর্যায়ে পৌঁছালেন তখন আহলে সুন্নার আলেমদের উপর টেক্কা দিতে শুরু করলেন। বেশিরভাগ কিতাব পড়াশুনা করে বা শিক্ষা

গ্রহন করে। যেমন কোন একজন লা মাঝহাবি ব্যক্তি একজন সত্য আলেমের নাম উল্লেখ করে বলেছেন,"ধর্ম অনুযায়ী একজন ফার্মাসিস্ট অথবা রসায়নবিদের বাণিজ্যের মত কি? তিনি শুধু মাত্র তার অংসে কাজ করবেন, তিনি আমাদের কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না।"

কতটা মূর্খতার মত প্রশ্ন এটি! তিনি মনে করতেন একজন বিজ্ঞানর ধর্মীয় বিষয়ে কোন জ্ঞান থাকবে না। তিনি এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নন যে, ইসলামি বিজ্ঞানীরা ঐশ্বরিক সৃষ্টি সর্বদা পর্যবেক্ষণ করেন, তারা বুঝতে পারেন কিতাবে বর্ণীত আল্লাহ তালার গুনসমূহ এবং তার সৃষ্টির সাথে সেগুলোর তুলনা করে বুঝতে পারেন তার অসীম ক্ষমতা, তারা বুঝতে পারেন আল্লাহ তালার কোন তুলনা এবং অপূর্ণতা নেই। জার্মান নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক **বিদ্যুতে**র উপর খুব ভালো একটি থেওরি দিয়েছেন। এরপরেও লা মাঝাহবিরা এই তত্ত্বগুলো অস্বীকার করে এবং তাদের ইচ্ছেমত ভ্রান্ত ধারণা এবং মতবাদ মানুষের মাঝে প্রচার করে।

আল্লাহ তালা এসকল হতভাগ্য মানুষদের এবং আমাদেরকে হেদায়েত করুন। আল্লাহ তালা সকল তরুণদের এসকল অধর্মীয় ফাঁদ থেকে রক্ষা করুন, আমীন।

উপরুন্তু উল্লেখকৃত বিজ্ঞানী ফার্মেসী এবং রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে তার দেশের সেবা করেছেন প্রায় ত্রিশ বছর। একই সময়ে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ এবং সাত বছর কঠোর পরিশ্রমের জন্য তাকে একজন ইসলামী আলেম ইজাজ উপাধিতে ঘোষণা করেন। ধর্মীয় এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে তিনি তার পারদর্শিতা দেখিয়েছেন সমানভাবে। তিনি ইসলামের সেবক হতে চেয়েছিলেন এক অর্থে। তার সবচেয়ে বড় ভয় বা চিন্তা ছিল তার অর্জন এবং ইজাজে প্রলোভিত হয়ে ভুল না করে বসা। তার এই ভয়ের কথা তার বিভিন্ন কিতাবে সুস্পষ্ট লেখা রয়েছে। তার নিজের মতবাদ বা ধারণা গুলো তার কিতাবে লেখার কোন ইচ্ছে ছিল না তার। তিনি সব সময় তরুনদের আহলে সুন্নার আলেমদের কিতাব পড়তে উৎসাহিত করছেন যেগুলো আরবি এবং ফার্সি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। তিনি সংসয়ের কারনে অনেক বছর কিতাব লেখা অব্যাহত রাখেন নি। **সাওয়াক উল মুহরিকা** কিতাবের প্রথম পাতায় যখন তিনি এই হাদিসটি দেখলেন**,"যখন ফিতনা বর্তমান হয়, যে সত্য জানে তার অবশ্যই উচিত**

অন্যদের তা জানানো। সে কি তাদের জানাবে না যে, তারা আল্লাহ্‌র এবং সকল মানুষের অভিশাপ প্রাপ্ত হবে!" তিনি চিন্তা করতে শুরু করলেন। অন্য ভাবে, তিনি শিখেছিলেন আহলে সুন্নার আলেমদের বোঝার এবং তাদের ধর্মীয় অনুভুতির পরিধি, সে সময়ের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং ইবাদাত আর তাকওয়ার সাথে তার সংযোগ, তিনি তার নম্রতা দেখিয়েছিলেন, সেই সকল আলেমদের সাগর সম জ্ঞানের কাছে নিজেকে এক ফোটা পানির সম মনে করেছিলেন। অন্য দিকে খুব কম ধার্মিক মানুষেরাও আহলে সুন্নার কিতাব সমূহ পড়তে এবং বুঝতে পারতো, কিন্তু মূর্খ ধর্মদ্রোহীরা ধর্মীয়দের সাথে মিশে গিয়েছিলো, তাদের বিকৃত কিতাব ছড়িয়ে পরেছিল যা তাকে মনঃক্ষুণ্ণ করে, হাদিসে বর্ণীত অভিশাপের ভয় তাকে আতংকিত করে। কিন্তু তরুণদের জন্য তার সমবেদনা থেকে তিনি আহলে সুন্নাতের আলেমদের কিতাব অনুবাদ করতে শুরু করেন। একই সাথে তিনি অসংখ্য সাধুবাদ এবং অনুপ্রেরণা পান, অপরদিকে অনেক নিন্দা এবং গালিগালাজও তাকে সহ্য করতে হয় এখন পর্যন্ত লা মাঝহাবিদের কাছ্‌ থেকে।

কেননা তার কোন সন্দেহ ছিল না, তার ইখলাস এবং তার রবের প্রতি সততা, বিবেক, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, রাসুল সাল্লাহি আলাইহিস সালামের উপর বিশ্বাস থেকে এই কাজ শুরু করেছিলেন। আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে তার নির্দেশিত পথ অনুসরনের তৌফিক দান করুন! আমীন। মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর মহান হানাফি আলেম মুহাম্মাদ বাহিত আল মুইতি তার কিতাব **তাথহির আল ফুয়াদ মিন দানিসিল ইতিকাদ** এর মধ্যে লিখেছে:

সব মানুষের মধ্যে নবী রাসুলদের আত্মা শীর্ষস্থানীয় এবং পবিত্র। এগুলো এমন পদার্থ থেকে তৈরি যা ভুল, বিপথগামিতা, অসচেতনতা, বিশ্বাস ভঙ্গতা, গোঁড়ামি, নাফসের জেদ, হিংসা এবং ক্রোধ থেকে মুক্ত। তারা আল্লাহতালার নিরদেশে আল্লাহ্‌র বানী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেন এবং ব্যাখ্যা করতেন। তাদের মাধ্যমে আসা ইসলামের বিধি নিষেধ সত্য। তাদের কোন একজনও ভুল ছিলেন না। নবী রাসুলদের পড়ে সবচেয় পবিত্র মানুষ ছিলেন সাহাবারা, তারা নবী রাসুলদের কাছ থেকে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তারা সবসময় নবী রাসুলদের কাছ্‌ থেকে শিক্ষা মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন বারবার। তারা যা মানুষকে শিখিয়েছেন তা সঠিক ছিল, তারা অধার্মিকতা থেকে

অনেক দূরে ছিলেন। তারা অধার্মিকতা এবং একগুঁয়েমির মধ্যে ফারাক বুঝতেন, তারা নাফসের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কোন কিছু করতেন না। সাহাবাদের আয়াত এবং হাদিসের ব্যাখ্যা করা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মুসলিমদের জন্য রহমত এবং রাসুল সাল্লাহি আলাইহিস সালামের জন্য ভালোবাসার বহিপ্রকাশ। কুরআনে কারিমের মধ্যে বলা হয়েছে, সাহাবারা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর একইসাথে স্নেহশীল ছিলেন, তারা সযত্নে নামাজ আদায় করতো এবং তারা শুধুমাত্র আল্লাহ তালার কাছে জান্নাত চেয়েছেন। তাদের সকল ইজতিহাদ যাতে ইজমা একত্রিত হয়েছিল, তা সঠিক ছিল। তাদের সকলকে নেকি প্রদান করা হয়েছে যেহেতু সত্য এক।

সাহাবাদের পরবর্তীতে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন সে সকল মুসলিমরা যারা তাদের দেখেছিলেন এবনহ তাদের বলা হয় তাবেঈন । তারা সাহাবাদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাবেঈনদের পড়ে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন তারা যারা তাবেঈনদের দেখেছেন, সুহবাতে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাদের বলা হয় **তাবে তাবেঈন**। তাদের পরবর্তীতে কেয়ামত পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছেন তারা যারা এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয় এবং তাদের অনুসরণ করে।

এই মানুষগুলো ধর্মীয় বোধ থেকে সালাফি আস সালেহিনদের পরে এসেছেন, তারা বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী এবং তাদের কাজগুলো রাসুলুল্লাহ এবং সালাফি আস সালেহিনদের নির্দেশিত পথে পরিচালিত হয়, তারা কখনো তাদের বিশ্বাস থেকে সরে আসে না, তারা কখনো ইসলামের পরিসীমা অতিক্রম করে না এবং অন্যদের দেয়া অপবাদে ভীত হয় না। তারা কখনো ভুল পথে পরিচালিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন না। তারা মূর্খদের কথায় কান দেন না। তারা তাদের বুদ্ধি ব্যাবহার করেন এবং কখনোই মুজতাহিদ চার ইমামের মাঝহাবের বাইরে যায় না। মুসলিমদের উচিত কোন একজন ভালো আলেম খুজে বের করা যার কাছ থেকে অজানা বিষয় গুলো জেনে নেয়া যায় এবং কিছু করার আগে উপদেশ নেয়া যায়, কেননা একজন আলেম জানবেন এবং মানুষকে জানাবেন আল্লাহ তালা তার বান্দাদের পাপ এবং অনাচার থেকে রক্ষা করে সঠিক পথে পরিচালিত করতে কি আধ্যাত্মিক ঔষধ সৃষ্টি করেছেন, তিনি জানবেন মানুষের আরোগ্য লাভের উপায়। তিনি মানুষিক বিকার গ্রস্থ এবং মূর্খদের শিক্ষা দেবেন। তিনি তার সমস কথা কর্ম এবং বিশ্বাস ইসলাম অনুযায়ী করবেন। তিনি প্রত্যেকটি প্রশ্নের

সঠিক জবাব দেবেন। আল্লাহ তালা তার সকল কাজকর্ম পছন্দ করবেন। আল্লাহ তালা তার প্রিয় বান্দাদের পথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তালা তাদের রক্ষা করবেন যারা বিপদ এবং নির্যাতিত হয়েও ঈমানের উপর অটল থাকে। তিনি তাদের কে নূর দ্বারা আবৃত করবেন, রহমত এবং নাজাত দেবেন। স্বস্তি এবং আরাম দান করবেন। আখেরাতের দিন তারা নবী রাসুল, শহীদ, সিদ্দিক এবং সালিহ মুসলিমদের সাথে থাকবেন।

"যে কোন শতকে যদি কোন ধর্মীয় পদাবলীর বাক্তি রাসুল এবং তার সাহাবাদের দেখানো পথ অনুসরণ না করে, যদি তার কাজ , বিশ্বাস তাদের শিক্ষার সাথে মিলে না যায়, যদি তিনি তার ইচ্ছে মত মতবাদ প্রচার করেন এবং ইসলামের পরিসীমা অতিক্রম করেন, যদি তিনি চার ইমামের দেখানো পথ অনুসরণ না করেন তবে তিনি নীতিভ্রষ্ট হয়েছেন বলে বিবেচিত হবেন। আল্লাহতালা তার হৃদয়ে মহর লাগিয়ে দিয়েছেন। তার চোখ সঠিক বেঠিক বুঝতে পারে না। তার কান সঠিক শব্দ শুনতে পারে না। আখিরাতে তার জন্য রয়েছে কঠিনতম শাস্তি। আল্লাহ তালা তাকে পছন্দ করেন না। এই ধরনের মানুষগুলো নবীজির শত্রু। তারা মনে করে তারা সঠিক পথে রয়েছে। তারা নিজেদের ব্যাবহারে খুশি। যাইহউক তারা শয়তানের অনুসারী। খুব কমসংখ্যকি সঠিক পথ বেছে নেয় এবং পরিচালিত হয়। তারা যা কিছু বলে মনে হয় সুন্দর, ভদ্র এবং যুক্তিযুক্ত কিন্তু তা সম্পূর্ণ অন্তঃসার শূন্য। তারা মানুষকে বিধর্মী করে এবং জাহান্নামের পথে পরিচালিত করে। তাদের কথাগুলো মনে হয় তুষারের মত স্পষ্ট এবং বিশুদ্ধ, কিন্তু যখন সূর্যের মত সত্যের আবির্ভাব ঘটে তখন তা মিলিয়ে যায়। এই মানুষ গুলো যারা ধর্মীয় পদে আসীন হয়েছে আল্লাহ তালা তাদের হৃদয়ে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন তাদের বলা হয়, **আহল আল বিদা** অথবা **লা মাঝহাবি**। তাদের বিশ্বাস এবং কর্ম কুরআন হাদিস অথবা ইজামা আল উম্মার অধীনে হয় না। তারা সঠিক পথ থেকে সরে গিয়ে মুসলিমদেরকেও সেই ভুল পথে পরিচালিত করে। যারা তাদের অনুসরণ করে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সালাফি আস সালেহিনদের সময় এরকম অনেক ধর্মদ্রোহী ছিলেন যারা ধর্মীয় পদে আসীন ছিলেন। মুসলিমদের মধ্যে তাদের অবস্থান শরিরে ক্যানসারের মত। যদি তা দূর করা না হয় তবে শরিরের অন্যান্য অংশও আক্রান্ত হতে পারে। এরা সংক্রামক রোগবহন করে। যেসকল মানুষ তাদের

সংস্পর্শে আসে তারা আক্রান্ত হয়। আমরা অবশ্যই এদের থেকে দূরে থাকবো, তানাহলে আমরাও এই রোগে আক্রান্ত হতে পারি।" একজন ধর্মীয় পদে আসীন ইবনে তায়মিয়্যা অনেক ক্ষতি করছেন। তার কিতাব সমূহে বিশেষ করে **আল ওয়াসিতা** কিতাবে তিনি সরাসরি ইজমা আল মুসলিমিন অস্বীকার করেন, যা কুরআনে কারিম এবং হাদিসের পরিপন্থী এবং সালাফি আস সালেহিনের বিপরীত। তার বিকৃত মতবাদ এবং অসৎ চিন্তা অনুসরণ করে তিনি ধর্মদ্রোহিতা করেছেন। তিনি একজন বিসৃত জ্ঞানের মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তালা এই জ্ঞানকে ধর্মদ্রোহিতা এবং সর্বনাশের কারন বানিয়েছেন। তিনি শুধুমাত্র তার নাফসের দেখানো পথ অনুসরণ করেছেন। তইনি সত্তের নামে ভুল এবং ধর্মদ্রোহিতার মতবাদ ছড়িয়েছেন। বিখ্যাত আলেম ইবনে হাজার আল মাক্কি রাহ্মাতুল্লাহি তালা আলাইহি তার কিতাব **ফতোয়া আল হাদিথিয়্যার** মধ্যে উল্লেখ করেছেন:

"আল্লাহ তালা ইবনে তায়মিয়্যাকে ধর্মবিরোধীদের এবং নরকবাসিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি তাকে অন্ধ এবং বধির বানিয়েছেন। অনেক আলেম তথ্য প্রমানের সাথে অভিযোগ করেছেন তার কাজকর্ম অসৎ , মতবাদগুলো মিথ্যে। যারা বিখ্যাত আলেম আবু হাসান আস সুবকি , তার পুত্র তাজ আদ দিন আস সুবকি এবং ইমাম আল আজ বিন জামা এবং সে সময়ের জীবিত শাফি এবং মালিকী আলেম দের কিতাব পড়েছেন দেখবেন যে তারা এই বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছেন এবং আমরা সঠিক। ইবনে তায়মিয়্যা তাসাফের আলেমদের বিষয়ে অনেক মন্দ কুৎসা রটিয়েছেন। এমনকি তিনি হযরত ওমর এবং হযরত আলীকে নিয়ে কথা বলতে দ্বিধা করেন নি।

তার কথার মাত্রা অতিক্রম করেছিল এবং তার শালীনতা ছিল না, তিনি মূল ভিতে খোঁচা দিয়েছিলেন। তিনি সঠিক পথের ইমামদের বিদাতকারী, ধর্মদ্রোহী এবং মূর্খ বলে অপবাদ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন: তাসাওফের কিতাবের মধ্যে গ্রীক দার্শনিকদের অসৎ মতবাদ ইসলামের সাথে মিশিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।' এবং এটি প্রমানের জন্য তার ভুল এবং ধর্ম বিরোধী মত নিয়ে সংগ্রাম করেছেন। তরুণরা যারা ইসলাম সম্পর্কে তেমন জ্ঞান রাখে না তারা এই সকল ভুল এবং ধূর্ত কথায় পথভ্রষ্ট হতে পারে। যেমন তিনি বলেছেন:' তাসাওফের মানুষেরা বলে তারা লাউহে মাহফুজ দেখতে পায়[১],

ইবেন সিনার মত কিছু দার্শনিক এটিকে বলেন আন নাফস আল ফালাকিয়্যা। তারা বলে যে, যখন মানুষের আত্মা পরিশুদ্ধ হয়, তখন সেই আত্মা জাগ্রত অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় নাফস আল ফালাকিয়্যা অথবা আল আকাল আল ফালের সাথে সংযুক্ত হয়, আর যখন কোন আত্মা এই দুটির সাথে সংযুক্ত হয় তখন পৃথিবীতে যাই ঘটুকনা কেন তারা তা বুঝতে পারেন। এগুলো গ্রীক দার্শনিক দের মতবাদ নয়। এগুলো ইবনে সিনা এবং তার পরবর্তী দার্শনিকদের মতবাদ। এছাড়াও ইমাম আবু হানিফ আল গাজ্জালি , মুহিউদ্দিন ইবনে আল আরাবি এবং আন্দুলুসিয়ান দার্শনিক কুতুব আদ দিন মুহাম্মাদ ইবনে সাবিন এরকম উল্লেখ করে গেছেন। এই দার্শনিকরা এধরনের কথা বলে গেছেন। এধরনের কোন বিষয় ইসলামে নেই। এই ধরনের বিবাদের মধ্য দিয়ে তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছেন। তারা মুলহিদে পরিনত হয়েছে । অন্যান্য মুলহিদরা হলো শিয়া ইসমাইলিয়া এবং কারামিতিস এবং বাতিনি। তারা সঠিক পথ পরিহার করেছিল যে পথ অনুসরণ করেছিলন আহলে সুন্নার আলেমরা, হাদিসের আলেমরা এবং ফুদায় আল ইয়াদের মত তাসাওফ আলেমরা। দর্শনে ডুব দেয়ার সাথে সাথে তারা মুতাযিলা এবং কুরামিয়্যা দুটি গ্রুপের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। তাসাওফের তিনটি ভাগ রয়েছে, প্রথম ভাগ হাদিস এবং সুন্নার অনুগত, দ্বিতীয় ভাগ কুরামিয়্যাদের মত বিদাতের মধ্যে ছিল, তৃতীয় ভাগের মানুশেরা **ইখয়ান আস সাফা** কিতাব এবং আবুল হায়্যানের বানী অনুসারী। ইবন আল আরাবি, ইবন সাবিন এবং তাদের মত মতাদর্শী দার্শনিকরা তাসাওফ সম্পর্কে বিবৃতি দিয়েছেন। ইবনে সিনার কিতাব **আখির আল ইশারাত আলা মাকামিল আরেফিন** এরকম অনেক বিবৃতি রয়েছে।

এছাড়াও আল ইমাম আল গাজ্জালি একই ধরনের মতবাদ দিয়েছেন তার কিতাব **আল কিতাব আল মাদনুন** এবং **মিস্কাত আলানওয়ার**। এমনকি তার বন্ধু আবু বাকর আল আরাবি চেষ্টা করেছিলেন তাকে বোঝাতে যে তিনি যে দর্শন নিয়েছেন তা ভুল। অপরদিকে আল ইমাম আল গাজ্জালি বলেছিলেন, দার্শনিকরা অবিশ্বাসী। তার জীবনের শেষের দিকে তিনি **সহি** আল বুখারি কিতাব পড়েছিলেন। অনেকে মনে করেন এটি তাকে তার ভুল বোঝাতে সাহায্য করে। অনেকে বলে থাকেন সেই মতবাদগুলো অতিরঞ্জিত কড়ে তার নামে অপপ্রচার হয়েছে। অনেক ধরনের কথা প্রচলিত আছে তার নামে। মহাম্মাদ

মাজারি তুরতিশির সিকিলিতে পড়াশুনা করা একজন মালিকী আলেম, একজন আন্দুলুসিয়ান আলেম ইবে আল জাওয়ে, ইবনে উকাইল এবং অন্যান্যরা প্রায় ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন।

[১] **লাউহে মাহফুজ** সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অশেষ রহমত কিতাবের ৩৬ অধ্যায় দেখুন।

"উপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট ইবনে তায়মিয়্যার আহলে সুন্নার আলেমদের সম্পর্কে ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তিনি সাহাবাদের নিয়েও অপবাদ দিয়েছেন। তিনি আহলে সুন্নার বেশিরভাগ আলেমকে বিদাতকারি বলে অপবাদ দিয়েছেন। এমনকি তিনি তিরস্কার করেছেন মহান ওলী এবং **কুতুব আল আরেফিন** হযরত আবুল হাসান আশ শাদিহলির **হিযব আল বাখ্র** এবং **হিযব আল কেবিরের** জন্য। এছাড়াও তাসাওফের আলেম মুহ্যিদ্দিন ইবনে আল আরাবি, উমার ইবন আল ফারিদ , ইবনে সাবিন হাল্লাজ হুসাইন ইবনে মান্সুরের নামে অপবাদ দেন, তারা ঘোষণা করেছিলেন এই বাক্তি বিধর্মী এবং পাপী। একজন আলেম যিনি ফতোয়া দিয়েছিলেন যে ওই বাক্তি অবিশ্বা[১]সী, তিনি তায়মিয়্যাকে ৭৫০ হিজরিতে একটি চিঠি লিখেছিলেন এরকম: 'হে আমার মুসলিম ভাই, যিনি নিজেকে এই সময়ের সবচেয়ে বড় আলেম এবং ইমাম ভাবেন, আল্লাহ্‌র নিমিত্তে আমি আপনাকে ভালবাসি। আমি সেসকল আলেমদের সাথে নই যারা আপনার বিপক্ষে। কিন্তু আমাকে নিয়ে বোলা আপনার কথাগুলোশুনে কীছুটা আহত হয়েছি। কোন জ্ঞানী মানুষ কী এটি অস্বীকার করবেযে রাতের শুরু হয় সূর্য অস্ত গেলে? আপনি বলেছেন আপনি সঠিক পথে রয়েছেন এবং আপনি আল আমার উ বিল মারুফ ওয়ান্নাহ্যি আনিল মুনকার করছিলেন। আল্লাহ তালা আপনার সকল কাজের নিয়ত জানেন। কিন্তু কোন মানুষের কাজ থেকে তার ইখলাস বোঝা যায়। আপনার কর্ম আপনার কথার নিহিতভাব প্রকাশ করে।

প্রতারিত মানুষ যারা তাদের নাফস অনুসরণ করে এবং যাদের কথা অবিশ্বাস্য, আপনি শুধু আপনার সময়ের আলেমদেরই নয়, মৃত আলেমদেরকেও অপমানকর কথা বলেছেন। সালাফি আস সালেহীনদের নয় শুধু আপনি সাহবাদের কারিমদেরকে নিয়া কটূক্তি করেছেন। আপনি কি কল্পনা করতে পারেন আখেরাতের দিন এই মহান বাক্তিরা তাদের অধিকার চাইলে

আপনি কি অবস্থানে থাকবেন? সালাহিয়্যা শহরের জামি আল জাবালের মিম্বারে আপনি বলেছেন হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু তালা অনেকগুলো ভুল বা খারাপভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ভুলগুলো কোথায়? সালাফি আস সালেহিনরা ঠিক কতগুলো ভুলের অভিযোগ করেছেন আপনার কাছে? আপনি বলেছেন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তালার তিন শতের বেশি ভুল ছিল, আপনি কি সঠিক করে বলতে পারবেন সঠিক গুলো তবে? এখন আমি আপনার বিরোধিতা করতে শুরু করেছি। আমি মুসলিমদেরকে আপনার এই কুচক্র থেকে রক্ষার চেষ্টা করবো, যা আপনি ছড়িয়েছেন। আপনি সকল মৃত এবং জীবিতদের নির্যাতন শুরু করেছেন। বিশ্বাসীরা অবশ্যই আপনাকে পরিহার করবেন। “তাজ আদ্দিন আস সুবকি ইবনে তায়মিয়্যা সালাফি আস সালেহিনদের যেসকল বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন তার একটি তালিকে তৈরি করেছিলেন, এমনটি:

১ – তিনি বলেছেন: তালাক কখনো বাস্তব হয় না, একটি শপথের জন্য কাফফারা আদায় করতে হবে। তার আগের কোন আলেম বলেন নি যে কাফফারা আদায় করতে হবে। [২]

২ – তিনি বলেছেন: ঋতু কালীন অবস্থায় কোন নারীকে তালাক দিলে তা যথার্থ হবেন।

[১] বিখ্যাত ইসলামি আলেম আব্দাল ঘানি আন নাব লুসি তার আল হাদিকাত আন নাদিয়্যা কিতাবের ৩৬৩\৩৬৪ নম্বর পৃষ্ঠায় এই সকল আলেমদের কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি তাদের কে আওলিয়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তারা যেসকল বিকৃত মনা মানুষের কথা বলেছেন তারা মূর্খ এবং অসচেতন ছিল।

[২] **অশেষ রহমত** কিতাবের পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে তালাক সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

৩ – তিনি বলেছেন : ইচ্ছে করে ছেড়ে দেয়া নামাজের কাজ আদায় করতে হবে না।

৪ – তিনি বলেছেন: ঋতুরত কোন মেয়ের জন্য কাবা শারিফ তউয়াফ করা মুবাহ , তাকে কাফফারা দিতে হবে না।

৫ – তিনি বলেছেন: তিন তালাকের নামে দেয়া একটি তালাক শুধু মাত্র একটি তালাক হয়। যাইহউক এটি বলার পূর্বে তিনি অনেক বছর থেকে বলে আসছিলেন ইজমা আল মুসলিমিন এমনটি বলে করে যান নি।

৬- তিনি বলেছেন: ইসলামের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কর হালাল যদি কেউ আদায় করতে চায়।

৭ –যখন কর আদায় করা হয় কোন ব্যাবসায়ীর কাছ থেকে, তা যাকাত হয়ে যায় যদিও তাদের নিয়ত না থাকে, তিনি বলেছেন।

৮ - তিনি বলেছেন, ইঁদুর বা তার মত কোন প্রানি এর মধ্যে গেলে তা অপবিত্র হয়

৯ - তিনি বলেছেন , জুনুব অবস্থায় কোন মানুষের জন্য রাতে গোসল ছাড়া নামাজ আদায় করা অনুমোদিত।

১০ - তিনি বলেছেন, **ওয়াকিফের** দ্বারা নির্ধারিত শর্ত মানার কোন প্রয়োজন নেই।'[১]

১১ - তিনি বলেছেন, যে বাক্তি ইজমা আল উম্মার বিরোধিতা করে সে অবিশ্বাসই হয়ে যায় না।

১২ - তিনি বলেছেন, আল্লাহ তালা মাহাল্লি হাওাদিথ এবং তিনি পদার্থে গঠিত।

১৩ - তিনি বলেছেন , কুরআনে কারিম আল্লাহ তালার ধাত থেকে তৈরি করা হয়েছে।

১৪ - তিনি বলেছেন, আলমের প্রত্যেকটি সৃষ্টি নিজেদের শ্রেনিতে শাশ্বত।

১৫ - তিনি বলেছেন, আল্লাহ তালাকে ভালোর সৃষ্টি করতে হবে।

১৬ - তিনি বলেছেন, আল্লাহ তালার একটি শরীর এবং অবস্থান রয়েছে এবং তিনি তা পরিবর্তন করেন।

১৭ - তিনি বলেছেন, জাহান্নাম চিরায়ত নয়, এটির শেষ আছে।

১৮ - তিনি বলেছেন, তিনি এটি অস্বীকার করেন যে নবী রাসুলরা পাপশূন্য।

১৯ - তিনি বলেছেন, রাসুল সাল্লাহি আলাইহিস সালাম অন্যান্য মানুষের থেকে আলাদা নন, তার মধ্যস্থতায় ইবাদাতের কোন প্রয়োজন নেই।

২০ - তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহর রউজা মুবারাক জিয়ারাতের জন্য মদিনায় যাওয়া পাপ।

২১ - তিনি বলেছেন, শাফায়াতের জন্য সেখানে যাওয়া হারাম।

২২ - তিনি বলেছেন, **তাওরাত** এবং **ইঞ্জিল** কিতাব অভিধান অনুযায়ী ভিন্ন নয়, তারা অর্থে ভিন্ন।

"কিছু কিছু আলেমের মতে উপরের সবগুলো মতবাদ ইবনে তায়মিয়্যার নয়, কিন্তু সবাই এটি উল্লেখ করেছেন যে তিনি বলেছেন, আল্লাহ তালার অবস্থান রয়েছে এবং তিনি কোন পদার্থের তৈরি।

যাইহউক এটি সকলেই স্বীকার করেন তিনি অত্তন্ত উচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন জালালা এবং দিয়ানার উপর। যে ব্যাক্তির ফিখহ, জ্ঞান, সুবিচার করার ক্ষমতা রয়েছে তিনি প্রথমে বিষয়টি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং তারপর নিজের মতামত দেবেন। বিশেষ করে কোন একজন মুসলিম অবিশ্বাসী বা ধর্মত্যাগী এটি বিছার করার জন্য তাকে খুব সূক্ষমভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।"

[১] **অশেষ রহমত** কিতাবের পঞ্চম অধ্যায়ের চোয়াল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা দেখুন ওয়াকিফ ওয়াকফ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে।

আজকাল ইবনে তায়মিয়্যাকে অনুসরণ করা একটি ফ্যাশানে পরিনত হয়েছে। তারা তার ধর্মদ্রোহী কথা এবং মতবাদের কিতাবগুলো সমর্থন করে, বিশেষ করে **আল ওয়াসিতার** মত কিতাব। এই কিতাবের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআন, হাদিস শারিফ এবং ইজমা আল মুসলিমিনের বিরোধী লেখা রয়েছে। এই ফিতনা এবং ফাসাদের উৎপত্তি ঘটায় পাঠকদের মধ্যে, শত্রুতার সৃষ্টি করে মুসলিম ভাইদের মধ্যে। ভারত উপমহাদেশের অহাবিয়া এবং মূর্খ মুসলিমরা ইবনে তায়মিয়্যা কে তাদের প্রতীক হিসেবে নিয়েছেন এবং তাকে

মহান মুজতাহিদ এবং শায়েখ আল ইসলাম বলে থাকেন। তারা তার বিধর্মীয় লেখা গুলো ইমান এবং বিশ্বাসের মুল ভিত্তি হিসেবে নিয়েছে। এই বিধর্মীয় মতবাদগুলো ছড়ানো বন্ধে আমাদের উচিত আহলে সুন্নার আলেমদের লিখিত মুল্লবান কিতাবগুলো পড়া, যেখানে সহি এবং সূক্ষ্ম ভাবে সবকিছু বর্ণনা করা হয়েছে। এই কিতাবগুলর মধ্যে আরবি কিতাব **শিফা আস সাকিম ফি যিয়ারাতি খায়ের আল আনাম** যার লেখক তাকি আদ্দিন আস সুবকি রাহিমাল্লাহু তালা, তিনি তার কিতাবে ইবনে তায়মিয়্যার সমস্ত জেদ এবং গোঁড়ামি মতবাদগুলোর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এটি তার ভ্রান্ত ধারণা এবং কুচক্রান্ত মানুষের মাঝে ছড়ানো রোধ করে।

শব্দকোষ

তাসাওফ সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানা যাবে হযরত আহ্মাদ আল ফারুক আস সিরহিন্দির **মাকতুবাত আদিল্লাত আশ শেরিফ** কিতাব থেকে: ইসলামের চারটি উৎস: **আল কুরআন**, **হাদিস শারিফ, ইজমা উল উম্মা, কায়িস আল ফুখহাল, আহলে বায়াত:**

(অধিকাংশ ইসলামি **আলেমদের** মতে) আলী ' (ভাতিজা এবং জামাই), ফাতেমা (কন্যা), নাতি হাসান এবং হুসসাইন; **আহলে সুন্নাত আল জামিয়া ইম্মাত আল মাঝহাব**: **ইমাম আল মাঝহাব**।

আল্লাহ: **আল্লাহু আকবর**, আল্লাহ তালা যার অধীনে সমস্ত সৃষ্টি।

আমীন: আল্লাহ্‌কে বলা আমার ইবাদাত কবুল করুন।

আমরু বিল মারুফ (ওয়ান নাহ্যু আনিল মুণকার): আল্লাহ তালার প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য পালন করা।

আনসার: মদিনাবাসি যারা মাক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

আকিদা: বিশ্বাস।

আরাফাত: মক্কা থেকে ২৪ কিলোমিটার দুরের খোলা ময়দান।

আরিফ: একজন আলেম যিনি **মারিফা** জানেন। **মারিফা** দেখুন।

আরশ: সাত আসমানের শেষ সীমানায় অবস্থান, **কুরসি** সাত আসমানের পড়ে আরশের মধ্যে অবস্থিত।

আস হাব আল কাহফ: সাত জন বিশ্বাসী যারা তাদের বিশ্বাস না হারিয়ে ফেলার ভয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হিজরত করেছিলেন যখন অবিশ্বাসীরা তাদের আক্রমন করে।

বাসমালা: এটি আরবি শব্দ বিসমিল্লাহ হির রাহমানির রাহিম যার অর্থ পরম করুনাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

বাতিনি: একজন বিধর্মী যে বাতিনিয়্যা অনুসরণ করে।

ফাদিলা, ওয়াসিলা: জান্নাতের সর্বচ্চো স্তর।

ফাকিহ : **ফাকিহ বা ফুকাহা আস সাবার** বিখ্যাত আলেম।

ফরয: **কুরআনে কারিমে আল্লাহ তালার** নির্দেশ।

ফতোয়া: i)**ইজতিহাদ (মুজতাহিদ):** ii) একজন **মুফতির ফিকাহ** কিতাবের সংস্করণ যেখানে কোন কিছু উল্লেখ না থাকলে তা করা অনুমোদন করা যাবে কি না তার জবাব ধর্মীয়ভাবে আলোচিত হয়েছে ইসলামি আলেমদের মতামতের ভিত্তিতে।

ফিকাহ: **ইবাদাত, আমল,** মুসলিমরা কোন কাজটি করবে বা করবে না তার বিধি নিষেধ আলোচনা।

ফিতনা:ইসলামের এবং মুসলিমদের ক্ষতি করে এরকম কাজ এবং মতবাদ ছড়ানো।

গোসল: **ফিকাহ** শাস্ত্র অনুযায়ী পুর শরীর ধোয়া।

হাদিস শারিফ i)রাসুল সাল্লাহি আলাইহিস সালামের সমস্ত বানী হাদসি।

ii)হাদিসের কিতাব সমূহ;

সহি হাদিস, ইসলামি আলেমদের শর্ত সাপেক্ষে শুনে শুনে অবহিত এবং বিশুধ হাদিস সমূহ।

হযরত: নবী রাসুল এবং ইসলামী আলেমদের নামের পূর্বে সম্মানপূর্বক ব্যবহৃত শব্দ।

হালাল: ইসলামের অনুমোদিত। .

হানাফি: ইমাম আবু হানিফার প্রবর্তিত মাঝহাব।

হানবালি:ইমাম আহমেদ ইবনে হানবালি প্রবর্তিত মাঝহাব।

হারাম: ইসলামে নিষিদ্ধ কাজসমূহ। .

-**হিজাজ**:আরাবিয়ান লোহিত সাগরে উপদ্বীপের অঞ্চল যেখানে মক্কা এবং মদিনা অবস্থিত।

ইজাজা:ইসলামি জ্ঞানের সনদ।

ইজমা (উল উম্মা ,আল মুসলিমিন): সাহাবা কারিম এবং তাবেঈনদের একমতে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত।

ইজতিহাদ: **আয়াত** এবং **হাদিসের** অন্তর্নিহিত মানে বোঝার জন্য বর্ণনা। .

ইবাহাতিস: অহাবিরা অন্যায়ভাবে মুসলিমদের হত্যা কে হালাল বলে থাকে যা আসলে হারাম।

ইখলাস: সবকিছু শুধুমাত্র আল্লাহ তালার জন্য করা। .

ইলম: জ্ঞানের একটি শাখা;**ইলম আল হাল**: ইসলামের শিক্ষা যা প্রত্যেকটি মুসলিমকে শিখতে হবে,

ইলম আল কালাম;**ঈমানে**র জ্ঞান; আল্লাহ্‌র পক্ষ **আউলিয়াদের** হৃদয়ে **আল ইলম আল লাদুন্নি** শিক্ষা গ্রহণ করা।

ইমাম: i)গভীর জ্ঞান সম্পন্ন আলেম; **মাঝহাবে**র প্রবর্তক **(ইমাম আল মাঝহাব**,

মুজতাহিদ ইমাম, **আল ইমাম আল আযামা**, ii)জামাতে নামাজের নেতা।; iii) খলিফা

ইনশাল্লাহ: "যদি আল্লাহ তালা ইচ্ছা করেন।

আস্তাগ ফিরুল্লাহ:আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রারথনা করা।

জালাল: মহত্ত্ব ।

জামআ: দল, কিছু মানুষের সমাবেশ মসজিদে, কোন প্রতিষ্ঠানে, কোন সমিতিতে; **নামাজের জামাত ।**

জুনুব: যে মুসলিমের গোসলের প্রয়োজন আছে।

কাবা: মাক্কায় রহমতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ।

কালিমাত: কথা অতবা মতবাদ।

কারামা:একজন অলির মাধ্যমে সম্পাদিত আল্লাহ তালার অলৌকিক ঘটনা।

কারিম: করুনাময়।

খুতবা: শুক্রবারের এবং ঈদের নামাজে ইমাম কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্য, যা অবশ্যই আরবিতে পাঠ করতে

কুরসি:**আরশ** দেখুন।.

মাদিনা আল মুনাওআরা: রহমত প্রাপ্ত মাদিনা নগরী।

মাক্কা আল মুকাররামা:সম্মানিত নগরী মক্কা।

মাকরুহ: নবীজির না করা, অপছন্দের, বেঠিক বা অনুমোদিত কোন কাজ।

মালিকী: ইমাম আলিকের প্রবর্তিত **মাঝহাব।**.

মানবুব:কোন কাজ, যা করা হলে **সওয়াব** হয়, না করলে বা অপছন্দ করলে পাপ হয় না বা **কুফর** হয় না, **আদাব**, মুস্তাহাব।

মারিফা:**ধাত** এবং **আল্লাহ তালার সিফাত** সম্পর্কে **আউলিয়াদের** দ্বারা অনুপ্রানিত হয়ে অর্জিত জ্ঞান।

মিলাদি: খ্রিষ্টীয় যুগে, জর্জিয়ান পঞ্জিকা অনুযায়ী।

মিনবার: সিঁড়ি যুক্তবসার জায়গা মসজিদে **খুতবা**র জন্য।

মুয়ামালাত: ফিকাহের একটি অধ্যায়। .

মুবাহ: আদেশ অথবা নিষেধ কোনটিই নেই যে কাজে।

মুদারিস: মাদরাসার প্রোফেসর।

মুসাফির: **তাফসিরের আলেম**।

মুফতি: মহান **আলেম** যিনি **ফতোয়া** দেন। .

মুহাজিরুন: মক্কার মানুষ যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

মুজিযা: কোন নবী বা রাসুলের মধ্যমে ঘটানো **আল্লাহ তালার** কোন অলৌকিক ঘটনা।

মুজতাহিদ:মহান আলেমরা ইজতিহাদ, মুজতাহিদ ইমাম, মুজতাহিদ মুফতি নিয়োগ করতে পারেন।

মুনাফিক: যে মুসলিম ইসলাম কে অস্বীকার করে, কপটাচারী।

মুরশিদ: পথপ্রদর্শক, পথ দ্রষ্টা। guide, director.

মুতাশাবিহ: দুর্বোধ্য কোন **আয়াত** বা **হাদিসের** মানে, **মুতাশাবিহাত**।

মুশাব্বিহা: যে সকল মানুষ বিশ্বাস করে আল্লাহ তালা পদার্থে তৈরি।

নাজস: ধর্মীয়ভাবে অসৎ কাজ।

নাফস: একটি শক্তি যা মানুষকে নিজের ক্ষতি করতে বাধ্য করে।

নাস: কোন একটি **আয়াত** বা **হাদিস** হচ্ছে **নাস**।

ক্বাযা: নির্দিষ্ট সময়ের পরে আদায়কৃত ইবাদাত, যা নির্ধারিত সময়ে আদায় করা হয়নি।

কিবলা: যে দিকে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা হয়।

কিয়াস আল ফুকাহা:**নাস** এবং **ইজমাতে** স্পষ্ট করে না বলা কোন বিষয়ের উপমা, আর যে বিষয়ে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে তা **ইজতিহাদ**।

কুতুব আল আরেফিন: একজন উচ্চ শিক্ষিত ওলী।

রাব্ব: **আল্লাহ তালা** সৃষ্টি কর্তা এবং ত্রান কর্তা।

রামাদান: মুসলিম পঞ্জিকার পবিত্র মাস।.

রাসূল: বার্তা বাহক, ধর্ম প্রচারকারী, মুহাম্মাদ আল্লাহ তালার রাসুল।

রিয়ারা: নাফসের ইচ্ছামত কোন কাজ না করা।

সাহাবা: সেই সকল ব্যক্তি যারা রাসুলকে দেখেছেন এবং তাকে অনুসরণ করেছেন।; **সাহাবা কারিমরা** সহচর ছিলেন **রাসুলুল্লাহ**র ।: i) শুভেচ্ছা, শান্তি, ভালো ইচ্ছে; ii) নামাজের শেষে আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহামাতুল্লাহ বাক্যটি বলা।

সালিহ:যারা পবিত্র এবং সকল ধরনের পাপ থেকে বিরত থাকে।

শাফি: আল ইমাম আশ শাফি কর্তৃক প্রদত্ত মাঝহাব।

শাইখ আল ইসলাম:ইসলামের ব্যাপারে ব্যাপক জ্ঞান রাখেন এরকম ব্যাক্তি।

সিদ্দিক: রাসুলের কাছে যিনি সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ব্যাক্তি।

সুফি: মুত্তাসাওফ, যিনি প্রশিক্ষিত হয়েছেন এবং একজন পরিপূর্ণভাবে তাসাওফে পরিনত হয়েছেন।

সুহবা:নবীজির অথবা কোন ওলীর সহচর।

সুলাহা':সালিহ। .

সুন্নাহ:যা আল্লাহ তালার নির্দেশিত নয় কিন্তু রাসুল সাল্লাহি আলাইহিস সালাম নিয়মিত করতেন ইবাদাত হিসেবে, (যদি পালন করা হয় তবে সওয়াব আছে, না পালনে পাপ নেই, তবে নিয়মিত পরিহার করা হয় তবে পাপ হবে।

সুন্নাহ: i)সকল ফরজের সাথে আদায় করতে হয়।; ii) কুরআনে কারিমের সাথে হাদিস শারিফ ; iii) **ফিকাহ**, ইসলাম।

সূরা: কুরআনে কারিমের একটি অধ্যায়।

তাকওয়া:**আল্লাহ তালার** ভয়ে সকল **হারাম** থেকে দূরে থাকা।

তাসাওফ: জ্ঞান এবং রাসূলের বিনয়ের অনুশিলন যা ইমান কে মজবুত করে, ফিকাহর অনুশীলন সহজ করে এবং মারিফা হতে সাহায্য করে।

তাওয়াফ: **হজ্জের** সময় মক্কার **কাবা**য় যে পরিক্রমা **ইবাদত** সম্পন্ন করা হয়।

তাওবা:আল্লাহ তালার কাছে অনুশোচনা পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা এবং পাপ না করার প্রতিজ্ঞা করা।

সওয়াব: আল্লাহ তালার বিধি নিষেধ মেনে চলার উপহার যা তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন আখিরাতের জন্য।

উলামা: **আলেম।** .

উম্মা: বিশ্বাসীরা যারা নবীজিকে অনুসরণ করেন, তারা মুসলিম উম্মা।

ওহী: আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে নবীজির কাছে আসা পবিত্র বানী।

ওয়াজিব: নবীজি যে ইবাদাত কখনো বাদ দেন নি। এটি ফরজের মতই পালনীয়, বাদ দেয়া যাবে না, **আল ওয়াজিব ওয়াজিব আল উজুদ** : যার অস্তিত্ব অপরিহার্য, অনুপস্থিতি অসম্ভব।

ওয়ালি: **আল্লাহ তালা** যাকে ভালবাসেন এবং নিরাপদ রাখেন।

আওলিয়া: যিনি ওয়ালি।

যুহদ: যার হৃদয় দুনিয়াবি জিনিশ এমনকি **মুবাহ** থেকেও সংযত।

হুসাইন হিলিমি ইশিকি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি

হুসাইন হিলিমি ইশিকি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, হাকিকাত কিতাবের প্রকাশক ১৩২৯ হিজরি সনে; ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে এয়্যুব সুলতান, ইস্তানবুলে জন্ম গ্রহণ করেন।

তিনি একশত চুয়াল্লিশটি কিতাব প্রকাশ করেন, যার মধ্যে ষাটটি আরাবি, পঁচিশটি ফার্সি, চৌদ্দটি তুরকিশ, এবং অন্যান্য গুলো ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইংরেজি, রাশিয়ান এবং অন্যান্য ভাষা।

হুসাইন হিলিমি ইশিকি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, সায়িদ আব্দুল হাকিম আর্বাসি রাহিমাল্লাহু তালা আলাইহির (যিনি একজন ধর্মীয় বিখ্যাত ইসলামি আলেম এবং তাসাওফের গুনসমূহে গুণান্বিত, পথ প্রদর্শনে পারদর্শী, জ্ঞান এবং গৌরবের অধিকারী), আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনি একজন উপযুক্ত আলেম, যিনি সুখের পথ প্রদর্শক ছিলেন। তিনি ২৫-২৬ অক্টোবর ২০০১ রাতে(৮ সাবান ১৪২২ হিজরি সনে এবং ৯ সাবান ১৪২২ হিজরি সনে) মারা যান। তিনি এয়্যুব সুলতানে শায়িত আছেন যেখানে তার জন্ম হয়েছিল।

বসবাসের জন্য এবং আখিরাতে চিরসৌভাগ্য অর্জনের জন্য বান্দার কি করা আবশ্যক তাও স্পষ্টভাবে অবহিত করেন। নাফসের, অসৎসঙ্গের ও ভ্রান্ত কিতাব ও বক্তব্যের দ্বারা প্রতারিত বা প্ররোচিত হয়ে যারা কুফর ও দালালাতের পথে পতিত হয়েছে তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি হিদায়েত নসীব করেন, সঠিক পথের দিশা দেন। তবে সীমা লঙ্ঘনকারী ও জালিমদেরকে এই নিয়ামত ইহসান করেন না। তারা নিজ ইচ্ছায় যে অবিশ্বাসের গর্তে পতিত হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সেখানেই পরিত্যাগ করেন।]